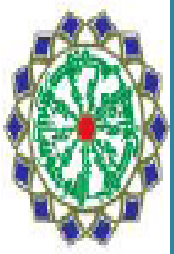

প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

- মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় কোরআন পূর্ণ সংকলিত হওয়ার প্রমাণসমূহ
  হাসান রেযায়ী
- ইমাম রিযা (আ.)-এর কিছু অমিয় বাণী
  সংকলন : মোহাম্মদ মুনীর হুসাইন খান
- গাদীরের হাদিসের ওপর একটি পর্যালোচনা
- ইমাম আলী (আ.) ও খেলাফত বিষয়ক দুটি প্রশ্ন
  মো. আশিফুর রহমান
- সাহাবীদের সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি
  আল্লামা আসাদ হায়দার
- শিশু-কিশোর ও যুবকদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর আচরণ
  মুহাম্মাদ আলী চানারানী
- ইসলামি পরিবারে পুরুষ ও নারীর ভূমিকা
  এ. কে. এম. আনোয়ারুল কবীর

বর্ষ ৮, সংখ্যা ১-২, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০১৮

بسم الله الرحمان الرحيم

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু

আল্লাহ্‌র নামে

প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ৮, সংখ্যা ১-২

এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০১৮

সম্পাদক : **এ. কে. এম. আনোয়ারুল কবীর**

সহযোগী সম্পাদক : **ড. জহির উদ্দিন মাহমুদ**

নির্বাহী সম্পাদক : **মো. আশিফুর রহমান**

উপদেষ্টামণ্ডলী : মোহাম্মদ মুনীর হুসাইন খান

আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

এস.এম. আশেক ইয়ামিন

প্রকাশক : মো. আশিকুর রহমান

প্রকাশকাল : বৈশাখ-আশ্বিন ১৪২৫

শাবান ১৪৩৯-মুহররম ১৪৪০

মূল্য : ১০০ (একশ) টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা : বাড়ি # বি-৭, ফ্ল্যাট ২০১,

মানসী লেকভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, শাইনপুকুর, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

মোবাইল : ০১৯১২১৪৫৯৬৫

Prottasha (Vol. 8, No. 1-2, April-September 2018), Editor: A.K.M. Anwarul Kabir; Associate Editor: Dr. Zahiruddin Mahmud; Executive Editor: Md. Asifur Rahman; Advisors: Mohammad Munir Hossain Khan, Mohammad Abdul Quddus Badsha, S.M. Asheque Yamin; Publisher: Md. Ashiqur Rahman;

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়**

মুসলমানদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করা ঈমানী দায়িত্ব ৭

- **ধর্ম ও দর্শন**

মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় কোরআন পূর্ণ সংকলিত হওয়ার প্রমাণসমূহ ১৩

হাসান রেযায়ী

ইমাম রিযা (আ.)-এর কিছু অমিয় বাণী ২১

সংকলন : মোহাম্মদ মুনীর হুসাইন খান

গাদীরের হাদিসের ওপর একটি পর্যালোচনা ৩৫

ইমাম আলী (আ.) ও খেলাফত বিষয়ক দুটি প্রশ্ন ৫২

মো. আশিফুর রহমান

সাহাবীদের সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ৭৯

আল্লামা আসাদ হায়দার

শিশু-কিশোর ও যুবকদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর আচরণ ১২০

মুহাম্মাদ আলী চানারানী

ইসলামি পরিবারে পুরুষ ও নারীর ভূমিকা ১৪২

এ. কে. এম. আনোয়ারুল কবীর

Prottasha

A Quarterly Journal of Human Development
Vol. 8, No.1-2, April-September 2018

Table of Contents

- **Editorial**

Muslims Should Strengthen Bonding among Themselves **7**

- **Theology and Philosophy**

Proof of Compilation of the Holy Quran in the Presence of Prophet (sm.) **13**

Hasan Rezaei

Some Beautiful Sayings of Imam Reza (A.) **21**

Compilation: Mohammad Munir Hossain Khan

A Review on Hadith-e Gadir **35**

Imam Ali (A.) and Two Questions about Khilafat **52**

Md. Asifur Rahman

Right Viewpoint of the Companions of Prophet (sm.) **79**

Allamah Asad Haider

The Prophet's Attitude towards Children and Youth **120**

Muhammad Ali Chanarani

Role of Man and Woman in Family **142**

A.K.M. Anwarul Kabir

গ্রাহক চাঁদার হার		
ডাকযোগে (পোস্টাল চার্জ সহ)	১২০ টাকা (প্রতি কপি)	২৪০ টাকা (বাৎসরিক)

ডাকযোগে পত্রিকা পেতে গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার করে নিচের ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে :

মো. আশিফুর রহমান
বাড়ি নং-বি-৭ ফ্লাট-২০১, মানসী লেকভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, শাইনপুকুর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

সম্পাদকীয়

মুসলমানদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করা ঈমানী দায়িত্ব

মুসলমানদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করা ঈমানী দায়িত্ব

পবিত্র কোরআনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হলো মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য মুসলমানদের ওপর পারস্পরিক বিভিন্ন রূপ দায়িত্বও অর্পণ করেছে। ইসলামের আগমনের পূর্বে আরবদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যে চরম দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষ ছিল নতুন এ ধর্মের মাধ্যমে তার অবসানের বিষয়টি উল্লেখ করে কোরআন বলছে :

وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا

'আর তোমাদের ওপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর যে, তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের অন্তরগুলোকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করে দিলেন, ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে।' (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

আয়াতটিতে অন্তরগুলোকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করার কথা বলা হয়েছে যার অর্থ তাদের অন্তরে প্রীতি সঞ্চার এবং তাদের মধ্যেও বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি। অন্য একটি আয়াতে মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক ভালোবাসা ও সাম্যের বিষয়টিকে সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরে বলা হয়েছে : إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 'কেবল বিশ্বাসীরাই পরস্পর ভাই ভাই।' (হুজুরাত : ১০)

সুতরাং যেহেতু মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই সেহেতু তারা পরস্পরকে খুবই ভালোবাসে। একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে যায় ও পরস্পরকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করে। তারা একের লাভ ও মঙ্গলকে অপরের লাভ ও মঙ্গল এবং একের ক্ষতি ও অমঙ্গলকে সবার ক্ষতি ও অমঙ্গল বলে গণ্য করে। যদি তাদের মধ্যে কোন কারণে মনোমালিন্য বা মতভেদ সৃষ্টি হয় তখন তাদের অন্তরে বিদ্যমান ভালোবাসা এ

মনোমালিন্য ও মতভেদ দূর করতে উদ্বুদ্ধ করে। যদি তাদের কোন দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে কোন দুর্বলতা ও ত্রুটি দেখা যায় তা সকলের জন্য নিন্দার কারণ হয়। তাই এমন কিছু ঘটলে তাদের সকলের দায়িত্ব হয়ে পড়ে তা দূর করার। কেননা, তারা সবাই ভাই। কখনই মুসলমান তার ভাইয়ের অধিকারকে নষ্ট করে না এবং তাকে শোষণ করে না।

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : 'মুসলমান একে অপরের ভাই। এক ভাইয়ের ওপর অপর ভাইয়ের অধিকার হলো তার ভাইকে অভুক্ত ও ক্ষুধার্ত রেখে সে নিজের পেট ভরাবে না; তৃষ্ণার্ত দেখে নিজের তৃষ্ণা মেটাবে না। তার ভাইকে বস্ত্রহীন ও ছিন্নবস্ত্র রেখে নিজে পোশাক পরবে না।... আর তার ভাইয়ের ওপর তার অধিকার কতই না বড়!' (আল-কাফি, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭০, হাদিস ৫)

পবিত্র কোরআন মদিনার একদল আনসার সাহাবীর প্রশংসা করে বলছে :

... وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

'তারা (আনসার) মুখাপেক্ষী হলেও নিজেদের ওপর তাদের (মুহাজির) অগ্রাধিকার দেয়।'

ভালো মুসলমান সকল মুসলমানের গর্ব। আর মন্দকারী মুসলমান সব মুসলমানের জন্য কলঙ্ক বলে বিবেচিত। যদি কোন মুসলমান আক্রমণের শিকার হয় তখন সকল মুসলমানের দায়িত্ব হলো শত্রুকে প্রতিহত করা। রাসূল (সা.) বলেছেন : 'মুসলমানরা শত্রুর বিরুদ্ধে মুষ্টিবদ্ধ হাতের ন্যায়।' (ফাইজুল কাদির, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫১২)

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন : এক মুমিনের আরেক মুমিনের ওপর সাতটি অধিকার রয়েছে : তাকে সম্মানিত জ্ঞান করবে, তাকে অন্তর থেকে ভালোবাসবে, (বিশ্বাস করবে) তার সম্পদে ঐ মুমিনের অংশ ও অধিকার রয়েছে, কেউ ঐ মুমিনের গীবত করলে ও তাকে মন্দ বললে গীবতকারীকে বাধা দিবে, সে অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে, সে মারা গেলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করবে এবং তার মৃত্যুর পর তাকে উত্তমরূপে স্মরণ করবে। (বিহারুল আনওয়ার, ৭২তম খণ্ড, পৃ. ২২২) ইসলাম ভ্রাতৃত্ব রক্ষার প্রতি খুবই গুরুত্ব দিয়েছে এবং কোন মুমিন ভাইকে ত্যাগ করাকে অন্যায় বলে গণ্য করেছে। এজন্য বলা হয়েছে, তোমার মুমিন ভাই তোমাকে ত্যাগ

করলেও তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ কর না। (বিহারুল আনওয়ার, ৬৮তম খণ্ড, পৃ.৪২৩) ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : মুমিনের ওপর মুমিন ভাইয়ের ন্যূনতম অধিকার হলো সে নিজের জন্য যা চায়, তার ভাইয়ের জন্যও তা চাইবে এবং নিজের জন্য যা মন্দ বলে গণ্য করে, তার ভাইয়ের জন্যও তা মন্দ জ্ঞান করবে। (বিহারুল আনওয়ার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬১)

কোরআনের অনুসারী মুসলমানরা কখনও শত্রুর সাথে হাত মিলায় না এবং তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে না। কখনই কাফের ও মুশরিকদেরকে নিজের ভাইয়ের ওপর প্রাধান্য দেয় না। ইসলামি সমাজ ভ্রাতৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মহানবী (সা.) সর্বপ্রথম এর ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি শুধু মুসলমানদেরকে পরস্পরের ভাই বলে ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হন নি, বরং নিজের সাহাবাদের মধ্যে বিশেষ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনও সৃষ্টি করেন। তিনি তাঁদের প্রত্যেককে স্বীয় গোত্রের বাইরে একজনকে ভাই হিসাবে নির্বাচন করার নির্দেশ দেন এবং তাঁদের কাউকে কাউকে নিজেই পরস্পরের ভাই করে দেন। তিনি আনসারদের প্রত্যেককে মুহাজিরদের একেক জনের সাথে ভ্রাতৃ সম্পর্কে আবদ্ধ করে দেন। এভাবে তিনি একই পরিবার ও গোত্রের মধ্যে থাকা ভ্রাতৃত্বের বিষয়টি সম্প্রসারিত করেন।

এখন প্রশ্ন হলো বর্তমানের মুসলমানরা কি পরস্পরকে ভাই বলে মনে করে? তাদের অন্তরগুলো কি কাছাকাছি রয়েছে? দুঃখজনকভাবে এ প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক। কারণ, মুসলমানরা আজ অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরের ভাই তো নয়ই; বরং পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে নিজের সহোদর ভাইদের মধ্যেই হৃদ্যতা ও ভালোবাসা লোপ পেয়েছে, অন্যদের ব্যাপারে তো কথাই নেই। এখন মুসলমানরা একে অপরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে, একে অপরের দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে, নিজের স্বার্থের জন্য অপরের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিচ্ছে, অন্যের অধিকারকে হরণ করছে। এ বিষয়টি শুধু ব্যক্তি পর্যায়েই সীমাবদ্ধ নেই, বৃহত্তর পর্যায়ে সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলমানদের একদল ইসলামের শত্রুদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। তারা মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, বিদ্বেষ ও বিভেদের বিষ ছড়াচ্ছে। আর যখন মুমিনদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস দেখা দিচ্ছে তখন তারা অন্ধ হয়ে তার ভাইদের ব্যাপারে ইসলামের শত্রুরা (বিশ্বগ্রাসী রাজনৈতিক নেতাবর্গ, যায়নবাদী গোষ্ঠী ও তাদের নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া) যা

বলছে তাই বিশ্বাস করছে এবং সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে। অথচ মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন : 'হে বিশ্বাসিগণ! যদি কোন অবাধ্য (পাপাচারী) ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আনে, তবে তোমরা তা উত্তমরূপে অনুসন্ধান করবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি না কর এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করতে হয়।' (হুজুরাত : ৬)

আজ সাম্রাজ্যবাদী ও বিশ্বগ্রাসী পাশ্চাত্য মুসলমানদের মধ্যে সকল স্থানে যুদ্ধ-বিগ্রহ সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে। তাদের উদ্দেশ্য মুসলমানদের পরস্পরকে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত করা এবং জালিমদেরকে তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিরীহ মানুষদের হত্যা করা। আর এভাবে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ফিতনা ও বিশৃঙ্খলার দাবানল ছড়ানো। তাই মুসলমানদের তার বহিঃশত্রুদের ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে যাতে তারা মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করতে না পারে। তেমনি আমেরিকা, ইসরাইলসহ কাফের মুশরিকদের দোসর স্বৈরাচারী ঐ সকল শাসক যারা মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে তাদের থেকে মুসলিম উম্মাহর সম্পর্কচ্ছেদ করা উচিত। বিশেষত যারা মজলুম ফিলিস্তিন জাতির অধিকারের প্রতি কখনই ভ্রুক্ষেপ করে নি ও বর্তমানে ইসরাইলের সাথে হাত মিলিয়েছে এবং যাদের হাত আজ মুসলিম উম্মাহর (ইয়েমেনীদের) রক্তে রঞ্জিত। কারণ, মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়ে বলছেন : "বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে তাদের প্রতি তোমার মমতার বাহু প্রসারিত করে দাও। আর তারা যদি তোমার অবাধ্যতা করে, তবে তুমি বল : 'তোমরা যা কর আমি তা থেকে দায়মুক্ত।'" (শুয়ারা : ২১৬)

মুসলমানরা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ওপর আপতিত পারস্পরিক দায়িত্ব যথাযথ পালন করে এবং তাদের শত্রুদের ব্যাপারে সতর্ক থাকে তবে তাদের মধ্যকার ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করতে পারবে। আর যদি তাদের দায়িত্বের প্রতি উদাসীন হয় ও তাদের শত্রুদের ফাঁদে পা দেয়, তবে তারা বর্তমানে যে শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে তা থেকে কখনই বের হতে পারবে না। তাই প্রত্যেক মুসলমানের এখনই সচেতন হওয়া আবশ্যক।

ধর্ম ও দর্শন

মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায়
কোরআন পূর্ণ সংকলিত হওয়ার প্রমাণসমূহ

ইমাম রিযা (আ.)-এর কিছু অমিয় বাণী

গাদীরের হাদিসের ওপর একটি পর্যালোচনা

ইমাম আলী (আ.) ও খেলাফত বিষয়ক দুটি প্রশ্ন

সাহাবী সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি

শিশু-কিশোর ও যুবকদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর আচরণ

ইসলামি পরিবারে পুরুষ ও নারীর ভূমিকা

মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় কোরআন পূর্ণ সংকলিত হওয়ার প্রমাণসমূহ

হাসান রেযায়ী

ভূমিকা

কোরআনশাস্ত্রের গবেষকরা কোরআন সংকলনের সময়কাল নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন। পবিত্র কোরআনের সূরা ও আয়াতসমূহ দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে পর্যায়ক্রমে স্থান, কাল, পাত্র সাপেক্ষে অর্থাৎ ব্যক্তি, পরিবেশ, পরিস্থিতি ও সময়ের প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে। একারণে এ গ্রন্থটি কখন, কীভাবে ও কার মাধ্যমে বর্তমানের বিন্যস্ত রূপে সজ্জিত হয়েছে তা নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁরা বিভিন্ন রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এ প্রবন্ধ যে প্রশ্নের উত্তর দানের জন্য রচিত হয়েছে তা হলো স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সা.) এক্ষেত্রে কী ভূমিকা পালন করেছেন। কোরআনের আদ্যোপ্রান্ত কি তাঁর প্রত্যক্ষ নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয়েছে না কি তিনি এর দায়িত্ব তাঁর পরবর্তীদের ওপর অর্পণ করে চলে গিয়েছেন?

মুসলিম মনীষীদের মত

মুসলিম মনীষীদের অনেকেই, যেমন সাইয়্যেদ মুর্তাযা (৩৫৫-৪৩৬ হিজরি), সাইয়্যেদ জাফর মুর্তাযা আমেলী, আয়াতুল্লাহ খুয়ী প্রমুখ মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় পূর্ণ কোরআন সংকলিত হওয়ার মতে বিশ্বাসী। তাঁরা তাঁদের মতের সপক্ষে যে সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন আমরা সংক্ষেপে তার ওপর আলোকপাত করছি :

১. প্রজ্ঞা ও কল্যাণচিন্তার দাবি

পবিত্র কোরআন ইসলামের চিরন্তন মুজিযা ও নবুওয়াতের সবচেয়ে বড় দলিল। তাই তাতে যেকোন প্রকার খুঁত দেখা দিলে ও বিকৃতির স্পর্শ লাগলে তা যতই ক্ষুদ্র হোক, ইসলামের ভিত্তিতে আঘাত লাগবে। এজন্যই মহান আল্লাহ ইসলামের সকল দাবির মধ্যে সবচেয়ে উচ্চকিত কণ্ঠে পুনঃপুনঃ তাকিদমূলক শব্দের মাধ্যমে কোরআনের অবিকৃতির ঘোষণা দিয়ে বলেছেন :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٩﴾

অর্থাৎ নিশ্চয় আমরাই এ যিক্‌র (কোরআন) নাযিল করেছি এবং নিশ্চয় আমরাই এর সংরক্ষণকারী। (সূরা হিজ্‌র : ৯)

আল্লাহ স্বয়ং এ গ্রন্থের সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেয়ার অর্থ হলো কখনই তার ব্যাত্যয় হওয়া সম্ভব নয়।

পবিত্র কোরআন হলো মানবজাতির হেদায়েতের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থ। তাই তিনি চাইবেন সর্বোত্তম রূপে এর সংরক্ষণ করতে। আর এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য নিঃসন্দেহে তিনি এর উত্তম পদ্ধতি তাঁর রাসূলকে বাতলে দিবেন। এ গ্রন্থ স্বয়ং রাসূলের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে সংকলিত না হয়ে কেবল হাফিজদের বক্ষসমূহে বা এলোমেলো ও বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জনের কাছে পশুর চামড়া, কাঠ ও অস্থিখণ্ড, কাগজ ইত্যাদিতে ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় লিখিত থাকলে কখনই তা সংরক্ষিত থাকবে না। সুতরাং স্রষ্টার প্রজ্ঞার আবশ্যিক দাবি হলো তিনি তাঁর নবীর মাধ্যমে এ দায়িত্বটি যথাযথভাবে সম্পাদন করাবেন যাতে কেউ না বলতে পারে– 'এটা আল্লাহর নাযিলকৃত কোরআন নয়'।

যেহেতু মহানবী (সা.)-এর দাওয়াত ও মিশনের ভিত্তিও হলো কোরআন এবং এ গ্রন্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা আবশ্যিক নির্দেশসমূহকে ধারণ করছে সেহেতু তিনি যদি নিজে তা সংকলনের দায়িত্ব পালন না করেন ও এর প্রতি সবচেয়ে মনোযোগী না হন তবে নিঃসন্দেহে তা তাঁরও প্রজ্ঞা ও কল্যাণচিন্তার পরিপন্থী হবে। মরহুম বালখী ও সাইয়্যেদ ইবনে তাউসের ভাষায় : যখন সাধারণ একজন মুসলমানের ক্ষেত্রেও এরূপ ধারণা করা যায় না, তখন কিভাবে বিশ্বজগতের প্রভুর প্রেরিত নবীর ক্ষেত্রে তা সম্ভব? (ইবনে তাউস, ১৩৬৩ হি., পৃ. ১৯২-১৯৩)

বাকিলানী এ সম্পর্কে বলেন : 'পৃথিবীর ওপর সবচেয়ে নির্বোধ হলো ঐ ব্যক্তি যে মনে করে রাসূল (সা.) কোরআনের সংকলনের ক্ষেত্রে অবহেলা করেছেন বা অলসতা দেখিয়েছেন। অথচ আমরা ইতিহাসে দেখি তিনি মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে স্বনামধন্য ও প্রসিদ্ধ লেখকদের ওহি লিখার জন্য নিয়োজিত করেছেন।' (বাকিলানী, পৃ. ৯৯)

ওহি লিপিবদ্ধ করার জন্য তাঁর নির্দেশসমূহ, আবদুল্লাহ ইবনে আমর বিন আসকে দেয়া তাঁর এ নির্দেশ যে, 'জ্ঞানকে লিখে রাখ' (খতিব বাগদাদী, ১৪২২ হি., পৃ. ৬৮-৬৯) এবং তাঁর এ বাণী যে, 'লেখার মাধ্যমে তোমরা জ্ঞানকে সংরক্ষণ কর'– প্রমাণ করে যে, তিনি কোরআন সংকলনের ব্যাপারে কোনোরূপ অবহেলা করেন নি। যখন মহানবী (সা.) আরব উপদ্বীপের বিশেষ অবস্থা, রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য দ্বারা বেষ্টিত

থাকা ও মদিনায় তাঁর আশেপাশে মুনাফিকদের উপস্থিতি– যাদের তৎপরতা তাঁর মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে আরো বৃদ্ধি পাচ্ছিল (সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা আত-তওবা'য় তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনার প্রেক্ষাপটে), বিশেষত মদিনার নিকটে অবস্থানকারী ইহুদি চক্র যারা ঐশী গ্রন্থসমূহে বিকৃত সাধনে অত্যন্ত পটু ছিল (বাকারা : ৭৯), তাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন তখন কিভাবে এরূপ ধারণা করা সম্ভব যে, তিনি কোরআনকে পূর্ণরূপে সংরক্ষণের বিষয়ে গুরুত্ব দিবেন না এবং খলিফা আবু বকরের সময় তাঁর তথাকথিত নির্দেশে (মদিনার এক আনসার যুবক) যাইদ ইবনে সাবিত হাফিজদের মুখ থেকে শুনে তা সঙ্কলন করতে বাধ্য হয়েছেন?! (রাসূল জা'ফারীয়ান, ১৪১৫ হি., পৃ. ৩৫)

আল্লামা শরাফুদ্দীন এ সম্পর্কে বলেন : 'যে কেউ রাসূল (সা.)-কে শেষ নবী বলে বিশ্বাস করে, তাঁকে আল্লাহ, কোরআন ও আল্লাহর বান্দাদের অধিকারের ব্যাপারে সর্বাধিক উপদেশদানকারী হিসাবে চেনে এবং তাঁর উম্মতের ভবিষ্যতের ব্যাপারে সবচেয়ে উদ্বিগ্ন ব্যক্তি বলে জানে নিঃসন্দেহে তার নিকট এ বিষয়টি অসম্ভব বলে মনে হবে যে, মহানবী (সা.) কোরআনকে অসংকলিত ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রেখে দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন।' (শারাফুদ্দনি আল মুসাভী, ১৪১৬ হি., পৃ. ২৯)

২. কোরআন ইসলামের মূল ভিত্তি

ঐতিহাসিকরা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, মহানবী (সা.) বিভিন্ন চুক্তিনামা, খেজুর গাছের ফলনের পরিমাণ, ঋণসমূহ এবং বায়তুল মালের হিসাব লেখার জন্য বিশেষ লেখক নিয়োজিত করেছিলেন যাঁরা তাঁর নির্দেশে তা লিখে রাখতেন। যেমন তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের নাম লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ নির্দেশ মোতাবেক মুআয ১৫০০ ব্যক্তির নাম তালিকাভুক্ত করেছিলেন। তাছাড়া মুসলমানদের সেনাদলের মধ্যে একদল লেখক থাকতেন যাঁরা যোদ্ধাদের নাম ও যুদ্ধে সংঘটিত বিষয়গুলো লিখে রাখতেন। এটা কি যুক্তিযুক্ত ও বুদ্ধিবৃত্তিক যে, রাসূল (সা.) এধরনের বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতেন, অথচ ইসলামের মূল ভিত্তি ও স্তম্ভ বলে গণ্য কোরআন লিখে রাখার প্রতি কোনোরূপ গুরুত্ব দিবেন না?! এটা কিভাবে সম্ভব যে, রাসূল (সা.) কেউ ক্ষুদ্র পরিমাণ ঋণ নিলেও তা লিখে রাখবেন, কিন্তু আল্লাহর কিতাবকে সঠিকভাবে সংকলনের পদক্ষেপ নিবেন না?! তবে কি তাঁর নিকট ঐ বিষয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

এ বিষয়গুলো কি বিক্ষিপ্তভাবে চামড়া, কাঠ, পাথর, অস্থিখণ্ড ইত্যাদির ওপর লিখে রাখা হতো না কি এক স্থানে বিন্যস্ত করে সাজিয়ে রাখা হতো যাতে সহজেই তা থেকে উপকৃত হওয়া যায়?! সাধারণ মানুষও কোনো গুরুত্বপূর্ণ কিছু অগোছালো অবস্থায় ফেলে রাখে না সেখানে মহানবীর মতো ব্যক্তি, যিনি সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও

দক্ষ পরিচালক ছিলেন তিনি কিভাবে এমন কাজ করতে পারেন?! (সাইয়্যেদ জাফর মুর্তাযা আমেলী, পৃ. ৮১-৮২)

মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবারা কোরআন লিখে রাখার বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। তাঁরা এ ঐশী গ্রন্থের আয়াতসমূহের সুনিপূণ বিন্যাস ও গাঁথুনির প্রতি পূর্ণ মনোযোগ ও দৃষ্টিদান না করলে কখনই তা এর চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতো না। কীভাবে এটা সম্ভব যে, তাঁরা এ গ্রন্থকে আল্লাহর দেয়া শ্রেষ্ঠ উপহার বলে গণ্য করবেন এবং এর বাণীর আহ্বানে নিজের জীবনকে অকাতরে সঁপে দিবেন, অথচ এর বাণীগুলোকে পূর্ণরূপে বিন্যস্ত করা ও সংরক্ষণের কোনো পদক্ষেপই নিবেননা?! এটা কীভাবে বিশ্বাস করা সম্ভব, যে নবী কোরআনকে লিপিবদ্ধ ও শিক্ষাদানে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাকে ভালোভাবে সংরক্ষিত রাখার জন্য একত্রিত ও বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে উদাসীনতার পরিচয় দিবেন?! কীভাবে এটা মেনে নেয়া যায়, যে কোরআন কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের কেন্দ্র ও উৎস এবং মানবসভ্যতার ভিত্তি বলে গণ্য তার ভবিষ্যতের ব্যাপারে রাসূল নির্লিপ্ত থাকবেন, অথচ তিনি দায়িত্বশীল ছিলেন কোরআনের বাণীকে পূর্ণভাবে সবার কাছে পৌঁছে দেয়ার?! (রামইয়ার, ১৩৮০ ফারসি সাল, ২৯৪-২৯৫)

প্রসিদ্ধ মনীষী বালখী তাঁর 'জামেউ উলুমিল কুরআন' গ্রন্থে বলেছেন : 'এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, মুসলমানদের একদল ভেবে বসে আছে রাসূল (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় কোরআনকে অবহেলায় ফেলে রেখেছেন, এর পঠন ও তিলাওয়াতের বিষয়কে সুদৃঢ় কোনো ভিত্তির ওপর স্থাপন না করেই চলে গিয়েছেন এবং কোরআনের সূরাসমূহ ও আয়াতগুলোকে বিন্যস্ত ও সাজানোর প্রতি কোন গুরুত্বই দেন নি। অথচ এটি হলো সেই কোরআন যা সকল মুসলমানের সামনে প্রামাণ্য দলিল, আল্লাহর রাসূলের দাওয়াতের মূল উৎস এবং দ্বীনের বিধিবিধান ও ফরযসমূহের বর্ণনাকারী।' (সাইয়্যেদ বাকির হুজ্জাতি, ১৩৮৪ ফারসি সাল, পৃ. ২২৩-২২৪)

৩. আল্লাহর রাসূলের তত্ত্বাবধানে কোরআনের কপি সঙ্কলন

যাইদ ইবনে সাবিত বলেছেন : 'আমরা আল্লাহর রাসূলের নিকট উপস্থিত হয়ে চামড়া, কাগজ, তক্তা ইত্যাদির ওপর লিখিত কোরআনকে তা'লিফ (একত্রিত) করতাম।' (যারকাশী, ১৩৭৬ হি., ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৭ ও ২৫৭; সুয়ূতী, ১৪২১ হি., ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৬)

এ বর্ণনায় 'তা'লিফ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যা কেবল লিখনের বিষয়টি বোঝাতে ব্যবহৃত হয় না; বরং তা লিখার সাথে সাজানো ও বিন্যাসের নির্দেশক। (সাইয়্যেদ বাকির হুজ্জাতি, ১৩৮৪ ফারসি সাল, পৃ. ২২১)

হাকিম নিশাবুরি এ বর্ণনাটির উল্লেখের পর লিখেছেন : 'এ হাদিসটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, কোরআন রাসূলের জীবদ্দশায়ই সংকলিত ও বিন্যস্ত হয়েছিল।' (হাকিম নিশাবুরি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১১)

মুহাম্মাদ ইয্যাত দুরুযাহ উক্ত হাদিস থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, কোরআনের যে অংশই নাযিল হতো ওহি লেখকরা তা পৃথকভাবে লিখে রাখতেন। অতঃপর সেগুলোকে স্বতন্ত্র এক পুস্তকে–যা তাঁরা নিজেরাই সেলাই করে বানাতেন–স্থানান্তরিত করতেন। অতঃপর তাঁরা রাসূলের তত্ত্বাবধানে কোরআনের বিভিন্ন পরস্পরের সাথে সযুক্ত করতেন। (দুরুযাহ, ১৪০১ হি., পৃ. ৩৬)

ডক্টর সুবহি সালিহ লিখেছেন : 'যাইদ ইবনে সাবিতের ঐ কথার অর্থ হলো আল্লাহর রাসূলের সরাসরি নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে তাঁরা কোরআনের আয়াতসমূহ ও সূরাগুলোকে বিন্যস্ত করতেন।' (সুবহি সালিহ, ১৯৭৯ খ্রি. পৃ. ৭০)

আয়াতুল্লাহ মীর মুহাম্মাদী, যাইদের হাদিসের ব্যাপারে বলেন : 'এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, কোরআন বিভিন্ন পত্র, কাঠ ও পাথরখণ্ডে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল এবং যাইদ রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায়ই একটি পুস্তকে (মুসহাফে) তা একত্রিত করেছিলেন। সুতরাং একত্রিত করার নির্দেশ যদি রাসূল দিয়ে থাকেন, বিন্যাসও তাঁর নির্দেশেই হয়েছে। (মীর মুহাম্মাদী, ১৪০০ হি., পৃ. ১০৫-১০৬)

৪. কোরআনের সাক্ষ্য

পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াতই এ প্রমাণ বহন করে যে, কোরআন অবতীর্ণের প্রথম থেকেই তা লিখিত ও সংকলিত হচ্ছিল। এখানে এরূপ কিছু আয়াতের উল্লেখ করা হলো :

ক. যেমন সূরা হূদের ১৩ আয়াতে বলা হয়েছে :

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِۦ مُفْتَرَيَٰتٍ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٣﴾

তারা কি বলে, সে এটা মিথ্যা রচনা করেছে? তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে এর অনুরূপ দশটা সূরা রচনা করে আন এবং আল্লাহকে ছাড়া অপর যাকে পার ডাক।'

স্পষ্ট যে, যখন রাসূল কাফেরদের প্রতি কোরআনের দশটি সূরার অনুরূপ আনার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিবেন তখন পর্যন্ত অবতীর্ণ কোরআনের সবগুলো সূরা সংকলিত

অবস্থায় বিদ্যমান থাকতে হবে যাতে চ্যালেঞ্জের বিষয়বস্তু তাদের কাছে স্পষ্ট হয় ও তাদের হাতের নাগালে থাকে যেন তারা বাহানা না দেখাতে পারে। যেহেতু সূরা হূদ নবুওয়াতের ৯ম বছরে অর্থাৎ হিজরতের ৪ বছর পূর্বে নাযিল হয়েছে সেহেতু ইতিপূর্বেই কোরআনের ৩৪০০টি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুশরিকদের নিকট সেগুলো পৌঁছে দেয়া হয়েছে। তাই বলা যায়, নবুওয়াতের নবম বছরে তখন পর্যন্ত অবতীর্ণ সূরাগুলো ও আয়াতসমূহ লিপিবদ্ধ, বিন্যস্ত ও সংকলিত হয়েছিল।

খ. সূরা ফুরকানের ৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

وَقَالُوٓاْ أَسَٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ ٱكۡتَتَبَهَا فَهِيَ تُمۡلَىٰ عَلَيۡهِ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلٗا ۝

তারা (মুশরিক) বলে, 'এসব পূর্ববর্তীদের উপকথা যা সে লিখিয়ে নিয়েছে এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাকে এটা পড়ে শোনানো হয়।'

পবিত্র কোরআন সব সময় মহানবী (সা.) ও মক্কার মুশরিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিতর্কের মূল বিষয় ছিল। তাই তারা পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহের ব্যাপারে পূর্ণ অবগত ছিল এবং নতুন যে কোন আয়াত অবতীর্ণ হলে সাথে সাথে তার তথ্য গ্রহণ করত। সুতরাং মুশরিকরা রাসূলের প্রচারের বিষয়ে অবগত হওয়ার জন্য এবং মুমিনরা শিক্ষা গ্রহণ ও চিন্তা-গবেষণার জন্য চেষ্টা করত কোরআনের আয়াতগুলোকে সংরক্ষণ করতে অথবা সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান রাখতে। যেহেতু মুশরিকদের প্রতি কোরআন বারবার এর সূরাগুলোর অনুরূপ আনার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে সেহেতু তাদের মধ্যকার বিশেষজ্ঞরা মুসলমানদের থেকে সেগুলো সংগ্রহের চেষ্টা করত যাতে তা খণ্ডন করতে পারে। উল্লিখিত আয়াতে মুশরিকরা দাবি করেছে, রাসূল (সা.) কোরআনকে পূর্বে বিদ্যমান উপকথা থেকে নকল করেছেন ও লিখিয়ে নিয়েছেন– যা প্রমাণ করে যে, কোরআন তখন বিন্যস্তরূপে সাজানো ছিল। (রমইয়ার, ১৩৮০ ফারসি সাল, পৃ. ২৮২)

উক্ত আয়াত রাসূলের সমসাময়িক আরবদের থেকে শুধু আজগুবি এক দাবির উল্লেখ করছে না; বরং এর পাশাপাশিএ বাস্তবতাকেও বর্ণনা করছে যে, পবিত্র কোরআনের সূরা ও আয়াতগুলো বিদ্যমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে নাযিল হওয়ার সাথে সাথে সংকলিতও হচ্ছিল। অতঃপর তা স্বতন্ত্র সূরা, আয়াতগুচ্ছ বা পারার রূপে পুস্তিকাকারে সাজানো অবস্থায় মানুষের হাতে ছিল এবং তারা তা পড়ত। এগুলোকেই মুশরিকরা উপকথা থেকে শ্রুতিলিখিত গ্রন্থ বলে অভিহিত করত। (দুরুযাহ, ১৪০১ হি., পৃ. ৯৭)

৫. হাদিসে সাকালাইন

শিয়া ও সুন্নি উভয় সূত্রে মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন : 'আমি তোমাদের মাঝে দুটি ভারী ও মূল্যবান বস্তু রেখে যাচ্ছি : আল্লাহর কিতাব ও আমার ইতরাত ও আহলে বাইত।' (হাকিম নিশাবুরি, আল-মুসতাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৮; মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১২২-১২৩; হাইসামী, ১৪০২ হি., ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৬৩; মুত্তাকী হিন্দী, ১৪০৯ হি., ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭২; ইবনে আসির জাযারী, ১৪১৮ হি., ১ম খণ্ড, পৃ. ২১১; শেখ সাদুক, পৃ. ৬৫)

মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত এ হাদিসটি ভালোভাবেই প্রমাণ করে যে, পবিত্র কোরআন সংকলিত রূপে মুসলমানদের হাতে বিদ্যমান ছিল। কারণ, আল্লাহর কিতাব বলতে রাসূল কখনই বিভিন্ন লোকের হাতে থাকা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো পাতা বোঝান নি; বরং সংকলিত এমন এক গ্রন্থ বুঝিয়েছেন যা চাইলেই মুসলমানদের হস্তগত হবে। তা এক স্থানে সংকলিত ও সহজপ্রাপ্য না হলে রাসূল কখনই এভাবে কথা বলতেন না। বিশেষত যখন রাসূল (সা.) মুসলমানদের বিপথগামিতা থেকে রক্ষার জন্য ঐ দুই বস্তুকে আঁকড়ে ধরাকে অপরিহার্য বলে গণ্য করেছেন তখন বাস্তবে এ দুই বস্তুর অবিকৃতভাবে মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। নতুবা তাকে পূর্ণরূপে আঁকড়ে ধরা ও তার শরণাপন্ন হওয়া সম্ভব হবে না। অতএব, আমরা যেমনভাবে নিশ্চিত যে, আহলে বাইত মানুষের মধ্যে ছিলেন তেমন কোরআনও তাদের মধ্যে পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল।

উল্লিখিত বুদ্ধিবৃত্তিক, ঐতিহাসিক, কোরআন ও হাদিসের দলিলসমূহ থেকে নিশ্চিত প্রমাণিত হয় কোরআনের সূরা ও আয়াতসমূহ রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায় তাঁরই নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও বিন্যস্ত হয়েছিল।

সূত্রসমূহ

১. ইবনে আসির জাযারী, আন নিহায়াহ ফি গারিবিল হাদিস ওয়াল আছার, বৈরুত, দারুল কুতুব আল ইলমিয়াহ, ১৪১৮ হিজরি।

২. শেখ সাদুক, মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে বাবাভেঈ কুম্মী, ছাওয়াবুল আমাল, তেহরান, মাকতাবাতুস সাদুক।

৩. সাইয়্যেদ ইবনে তাউস, সাদুস সুউদ, কোম, মানশুরাতুর রাযি, ১৩৬৩ ফারসি সাল।

৪. আবু বাকর বাকিলানী, নুকাতুল ইনতিসার লি নাকলিল কুরআন, মিশর।

৫. রাসূল জা'ফারিয়ান, আল-কুরআন ওয়া দায়াভিউত তাহরিফ, বৈরুত, দারুস সাকালাইন, ১৪১৫ হি.।

৬. হাকিম নিশাবুরি, আল-মুসতাদরাক আলাস সাহিহাইন, বৈরুত, দারুল মারিফাত।

৭. সাইয়্যেদ বাকির হুজ্জাতি, পাজুহাশি দার তারিখে কোরআন, দাফতারে নাশরে ফারহাঙ্গে ইসলামি, তেহরান, ১৩৮৪ ফারসি সাল।

৮. খাতিব বাগদাদী, তাকইদুল ইলম, বৈরুত, মাকতাবাতুল আছরিয়া, ১৪২২ হিজরি।

৯. দুরুযাহ, মুহাম্মাদ ইযযাত, তারিখুল কুরআন, ফারসি অনুবাদ মুহাম্মাদ আলী লিসানি, মারকাযে নাশরে এনকেলাব, তেহরান, ১৪০১ হিজরি।

১০. মাহমুদ রামইয়ার, তারিখে কোরআন, এনতেশারাতে আমির কাবির, তেহরান, ১৩৮০ ফারসি সাল।

১১. আবদুল আযিম যারকানি, মানাহিলুল ইরফান ফি উলুমিল কুরআন, বৈরুত, ১৪১২ হিজরি।

১২. বাদরুদ্দিন যারকাশী, আল-বুরহান ফি উলুমিল কুরআন, দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়া, ১৩৭৬ হিজরি।

১৩. আবদুর রহমান সুয়ূতী, আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২১ হি.।

১৪. আবুল কাসেম খুয়ী, আল বায়ান ফি তাফসিরিল কুরআন, আল-মাতবায়াতুল ইলমিয়া, কোম, ১৩৯৪ হিজরি।

১৫. সুবহি সালিহ, মাবাহিছু ফি উলুমিল কুরআন, দারুল ইলম লিল মালায়িন, বৈরুত, ১৯৭৯ সাল।

১৬. হাইসামি, আলী ইবনে আবি বাকর, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, দারুল কুতুব আল-আরাবি, বৈরুত, ১৪০২ হিজরি।

১৭. সাইয়্যেদ জাফার মুর্তাযা আমেলী, হাক্বাইকু হাম্মাহ হাওলাল কুরআনিল কারিম, মুয়াসাসাতুন নাশরিল ইসলামী, কোম।

১৮. মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাবুরি, আল-জামি' আসসাহিহ, বৈরুত, দারুল ফিকর।

১৯. আবুল ফাযল মীর মুহাম্মাদী, বুহুছুন ফি তারিখিল কুরআন, বৈরুত, ১৪০০ হিজরি।

২০. সাইয়্যেদ শারাফুদ্দীন আলমুসাভী, আজভিভাতু মাসায়িলি জারুল্লাহ, আল-মাজমাউল আলামী লি আহলিল বাইত, ১৪১৬ হিজরি।

২১. মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, বৈরুত, মুয়াসসাসাতুর রিসালিয়াহ, ১৪০৯ হিজরি।

অনুবাদ : আবুল কাসেম

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র আহলে বাইতের অষ্টম ইমাম রিযা (আ.)-এর কিছু অমিয় বাণী

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র আহলুল বাইতের (আ.) বারো ইমামের অষ্টম ইমাম হযরত আলী ইবনে মূসা আর রিযা (আ.)-এর ১৪৮ হিজরির ১১ যিলকদ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সপ্তম ইমাম হযরত মূসা ইবনে জাফর আল কাযিম (আ.)। তাঁর কুনিয়াহ আবুল হাসান এবং তাঁর উপাধি রিযা। তিনি পিতা ইমাম কাযিম (আ.)-এর শাহাদাতের পর ১৮৩ হিজরিতে ৩৫ বছর বয়সে ইমামতের মাকামে অধিষ্ঠিত হন। এ মহান ইমামের কিছু অমিয় বাণী এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

১. সর্বোত্তম ও সবচেয়ে সম্মানজনক গুণ হচ্ছে সৎকর্ম সম্পাদন, দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য এবং আশাকারীর (অভাবীর) আশা (অভাব) পূরণ করা। (বিহারুল আনওয়ার, খ. ৭৮, পৃ. ৩৫৫)

أَجَلُّ الخَلَائِقِ وَ أَكرَمُهَا : اصطِنَاعُ المعرُوفِ وَ إِغَاثَةُ المَلهُوفِ وَ تَحقِيقُ أَمَلِ الآمِلِ.

২. বিশ্বস্ত ব্যক্তি (আমীন) তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে নি বা করে না। কিন্তু তুমি বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বস্ত মনে করেছিলে (বা মনে কর)। (বিহারুল আনওয়ার, খ. ৭৮, পৃ. ৩৩৫)

لَم يَخُنکَ الأَمِينُ وَلكِنِ ائتَمَنتَ الخَائِنَ.

৩. তোমার দ্বীনী ভাইদের জন্য ঐ জিনিস ব্যয় করো না তোমার জন্য যার অপকারিতা ও ক্ষতি তাদের জন্য তার (ঐ জিনিসেরই) উপকারিতার চেয়ে বেশি। (মুসনাদুল ইমামির রিযা আ., খ. ২, পৃ. ৩১৪)

لَا تَبذُل لِإِخوانِکَ مِن نَفسِکَ مَا ضَرَرُهُ عَلَيکَ أَكثَرُ مِن نَفعِهِ لَهُم.

৪. ঈমান হচ্ছে কণ্ঠে স্বীকারোক্তি, অন্তরের মাধ্যমে জ্ঞান ও পরিচিতি (অর্জন) এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে সৎকর্ম সম্পাদন (করা)। (আল-খিসাল, পৃ. ১৭৭)

الإِيمَانُ إِقرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ مَعرِفَةٌ بِالقَلبِ وَ عَمَلٌ بِالأَركَانِ.

৫. সর্বোত্তম বুদ্ধিবৃত্তি (প্রজ্ঞা) হচ্ছে নিজ সত্তা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ও পরিচিতি (আত্ম-পরিচিতি)। (বিহারুল আনওয়ার, খ. ৭৮, পৃ. ৩৫২)

أَفضَلُ العَقلِ مَعرِفَةُ الإِنسَانِ نَفسَهُ.

৬. যে ব্যক্তি পারলৌকিক প্রতিদানের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস করে তার উচিত (বেশি বেশি) দান করা। (উয়ূনু আখবারির রিযা আ. , খ. ২ , পৃ. ৫৪)

مَن أَيقَنَ بِالخَلَفِ جَادَ بِالعَطِيَّةِ.

৭. যে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাউকে নিজের দ্বীনী ভাই হিসেবে গ্রহণ করবে সে বেহেশতে একটি গৃহ প্রাপ্ত হবে। (সওয়াবুল আমাল, পৃ. ১৫১)

مَنِ استَفَابدَ أَخَاً فِي اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ استَفَادَ بَيتاً فِي الجَنَّةِ

৮. মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ ও সঞ্চয় হচ্ছে দান-সাদাকাহ (করা)। (উয়ূনু আখবারির রিযা আ., খ. ৭৮, পৃ. ৫৪)

خَيرُ مَالِ المَرءِ وَ ذَخَائِرِهِ الصَّدَقَةُ.

৯. সৎ স্বভাব ও আচরণ (চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য) দুই প্রকার : ১. সহজাত (ফিতরাতগত) এবং ঐচ্ছিক (নিয়ত ও সংকল্পভিত্তিক)। আর ঐচ্ছিক গুণ ও স্বভাবের অধিকারী ব্যক্তিটি হচ্ছে উত্তম। (ফিকহুর রিযা আ., পৃ. ৩৭৯)

حُسنُ الخُلُقِ سَجِيَّةٌ وَ نِيَّةٌ وَ صَاحِبُ النِّيَّةِ أَفضَلُ.

১০. বিপদাপদে ধৈর্য ধরা একটি সুন্দর গুণ ও বৈশিষ্ট্য। আর এর চেয়েও উত্তম হচ্ছে হারাম বিষয়াদির বিপরীতে ধৈর্যধারণ (ধৈর্য সহকারে হারামগুলো থেকে দূরে থাকা এবং সেগুলো বর্জন করা। সব হারাম বর্জন করা ফরয)। (মিশকাতুল আনওয়ার, পৃ. ২২)

إِنَّ الصَّبرَ عَلَى البَلَاءِ حَسَنٌ جَمِيلٌ وَ أَفضَلُ مِنهُ عَنِ المَحَارِمِ.

১১. মহান আল্লাহ পাকের আনুগত্যের সর্বোচ্চ মাত্রা ও পর্যায় হচ্ছে ধৈর্যাবলম্বন ও সন্তুষ্টি। (ফিকহুর রিযা আ., পৃ. ৩৫৯)

رَأسُ الطَّاعَةِ لِلّهِ الصَّبرَ وَ الرِّضَا.

১৬. দান-সাদাকাহ করার চেয়েও উত্তম হচ্ছে দুর্বলকে তোমার সাহায্য করা। (তুহাফুল উকূল, পৃ. ৫২৫)

عَونُکَ لِلضَّعِيفِ أَفضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ.

১২. ইবাদত কেবল বেশি বেশি নামায পড়া ও রোযা রাখা নয়; বরং ইবাদত হচ্ছে মহান আল্লাহর ব্যাপারে (গভীর) চিন্তা করা। (উসূলুল কাফী, খ. ২ , পৃ. ৫৫)

لَيسَ العِبَادَةُ كَثرَةَ الصَّلَاةِ وَ الصَّومِ إِنَّمَا العِبَادَةُ التَّفَكُّرُ فِي أَمرِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

১৩. বন্ধুর প্রতি বিনয়ী (নম্র) হও, শত্রুর ব্যাপারে সতর্কতাবলম্বন কর এবং সবার সাথে হর্ষোৎফুল্ল থাক। (বিহারুল আনওয়ার, খ. ৭৮, পৃ. ৩৫৬)

اِصحَبِ الصَّدِيقَ بِالتَّوَاضُعِ و العَدُوَّ بِالتَّحَرُّزِ وَ العَامَّةَ بِالبِشرِ.

১৪. আমি অবাক হচ্ছি ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে যে নিজ সম্পদ ব্যয় করে দাসদের ক্রয় করে দাসত্ব থেকে তাদের মুক্তি দেয়। অথচ সে কেন তার সদাচরণ দিয়ে (দাসত্বের বন্ধন থেকে) স্বাধীন ব্যক্তিদেরকে ক্রয় করবে না...! (অর্থাৎ মানুষ সদাচরণ ও সুন্দর ব্যবহারের দাস এবং সদাচরণকারী তার সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ দিয়ে মানুষের মন জয় করে তাকে বশীভূত করে।) (ফিকহুর রিযা আ., পৃ. ৩৫৪)

عَجِبتُ لِمَن يَشتَرِي العَبِيَ بِمَالِهِ فَيُعتِقُهُم كَيفَ لَا يَشتَرِي الأَحرارَ بِحُسنِ خُلقِهِ

১৫. অন্যদের হাতে যা আছে সেটার প্রতি (অর্থাৎ মানুষের ধন-সম্পদের প্রতি) ভ্রুক্ষেপ না করা দান করা ও দানশীলতার চেয়েও উত্তম। (ফিকহুর রিযা আ., পৃ. ৩৬৭)

سَخَاءُ النَّفسِ عَمَّا فِي أَيدِي النَّاسِ أَكثَرُ مِن سَخَاءِ البَذلِ.

১৭. যা দিয়ে মান-সম্ভ্রম রক্ষা করা হয় তা হচ্ছে সর্বোত্তম সম্পদ। (বিহারুল আনওয়ার, খ. ৭৮, পৃ. ৩৫৫)

أَفضَلُ المالِ مَا وُقِيَ بِهِ العِرضُ

১৮. দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্য মাতৃস্তন্যের চেয়ে উত্তম কোন দুগ্ধ (খাদ্য) নেই। (উয়ূনু আখবারির রিযা আ., খ. ২, পৃ. ৩৪)

لَيسَ لِلصَّبِيِّ لَبَنٌ خَيرٌ مِن لَبَنِ أُمِّهِ.

১৯. যে ব্যক্তি নিজেকে নিজেই নিন্দা ও অপবাদের সম্মুখীন করে সে যেন ঐ ব্যক্তিকে তিরস্কার না করে যে তার ব্যাপারে (এ কারণে) সন্দেহ ও কুধারণা পোষণ করেছে। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের মান-সম্মান রক্ষা করে না এবং নিজ কর্মকাণ্ড ও স্বভাব-চরিত্রের মাধ্যমে নিজেকে মানুষের কাছে অপমান ও নিন্দার পাত্র করে তার চরিত্রের ব্যাপারে এ কারণে কোনো ব্যক্তি যদি সন্দেহ ও কুধারণা পোষণ করে তাহলে এজন্য সন্দেহ পোষণকারীকে সে তিরস্কার করতে পারবে না।) (সহীফাতুর রিযা আ., পৃ. ৭১)

مَن عَرَضَ نَفسَهُ لِلتُّهمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَن أَسَاءَ الظَّنَّ بِهِ.

২০. যে ব্যক্তি বিদ্রোহ ও বিরুদ্ধাচরণকে ঢাল হিসেবে নেয় সে (তার থেকে) শাস্তি বা দণ্ড প্রতিহত করতে পারে না। (অর্থাৎ জালিম অন্যায়কারী শেষ পর্যন্ত শাস্তি পাবেই।)। (চল্লিশ হাদীস, পৃ. ১২৩)

لَا يَهدَمُ العُقُوبَةَ مَنِ ادَّرَعَ بِالبَغيِ

২১. যে ব্যক্তি চায় সবচেয়ে ধনী ও সম্পদশালী হতে তার উচিত মহান আল্লাহর কাছে যা আছে তাতে আস্থা রাখা। (ফিকহুর রিযা আ., পৃ. ৩৬৪)

مَن أَرَادَ أَن يَكُونَ أَغنَى النَّاسِ فَليَكُن وَاثِقاً بِمَا عِندَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

২২. যে ব্যক্তি সত্যের জন্য (পক্ষে) ধৈর্যাবলম্বন করেছে সে যে ব্যাপারে ধৈর্যাবলম্বন করেছে মহান আল্লাহ তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান (সওয়াব ও পুরস্কার) তাকে দেবেন। (ফিকহুর রিযা আ., পৃ. ৩৬৮)

مَن صَبَرَ لِلحَقِّ عَوَّضَهُ اللهُ خَيرَاً مِمَّا صَبَرَ عَلَيهِ

২৩. যে ব্যক্তি চায় যে তার মৃত্যুকাল বিলম্বিত হোক এবং তার জীবিকা (রিয্ক) বৃদ্ধি পাক তার উচিত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা। (উয়ূনু আখবারির রিযা আ., খ. ২, পৃ. ৪৪)

مَن سَرَّهُ أَن يُنسَأَ فِي أَجَلِهِ وَ يُزَادُ فِي رِزقِهِ فَلْيَصِل رَحِمَهُ.

২৪. যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে মহান আল্লাহ কিয়ামত দিবসে তার অন্তরের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেবেন। (উসূলুল কাফী, খ. ২, পৃ. ২০০)

مَن فَرَّجَ عَن مُؤمِنٍ فَرَجَ اللهُ عَن قَلبِهِ يَومَ القِيٰمَةِ.

২৫. নেয়ামতগুলোর সুপ্রতিবেশী হয়ে যাও (অর্থাৎ মহান আল্লাহর নেয়ামতগুলোর সদ্ব্যবহার কর)। কারণ, নেয়ামত চলে যায় (অর্থাৎ তা ক্ষণস্থায়ী)। আর তা কারো কাছ থেকে চলে গেলে তার কাছে আর ফিরে আসে না। (তুহাফুল উকূল, পৃ. ৫২৬)

أَحسِنُوا جِوَارَ النِّعَمِ فَإِنَّهَا وَحشِيَّةٌ مَا نَأَت عَن قَومٍ فَعَادت إِلَيهِم.

২৬. সুগন্ধি ব্যবহার করা হচ্ছে মহান নবীদের (আ.) অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে মহান নবীদের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। (মাকারিমুল আখলাক; তুহাফুল উকূল, পৃ. ৪২ ও ৫১৯)

مِن أَخلَاقِ الأَنبِيَاءِ (عَلَيهِمُ السَّلَامُ) التَّطَيُّبُ، مِن أَخلَاقِ الأَنبِيَاءِ (عَلَيهِمُ السَّلَامُ) التَّنَظُّفُ.

২৭. যে ব্যক্তি চুক্তি (অঙ্গীকার) ভঙ্গ করে, সে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলো (বিপদাপদ) প্রতিহত করতে পারবে না। (কাশফুল গাম্মাহ, খ. ৩, পৃ. ১৪৮)

لَا يَهدَمُ المرءُ دَائِرَةَ السَّوءِ مَعَ نَكثِ الصَّفقَةِ.

২৮. যখন প্রজ্ঞাবানরা প্রজ্ঞাকে (হিকমত) যারা এর যোগ্য নয় তাদের কাছে উপস্থাপন করেছেন তখন তারা আসলেই তা (হিকমত) হারিয়ে ফেলেছেন। (বিহারুল আনওয়ার, খ. ৭৮, পৃ. ৩৪৫)

إِنّ الحُكَمَاءَ ضَيَّعُوا الحِكمَةَ لَمَّا وَضَعُوهَا عِندَ غَيرِ أَهلِهَا.

২৯. যখন সত্য তোমাদের কাছে স্পষ্ট ও উদ্ঘাটিত হবে (অর্থাৎ তোমরা সত্য সম্পর্কে অবগত হবে) তখন সত্য স্পষ্ট ও উদ্ঘাটিত হওয়ায় ক্রুদ্ধ হয়ো না। (ফিকহুর রিযা আ., পৃ. ৩৩৮)

لَا تَغضَبُوا مِنَ الحَقِّ إِذَا صُدِعتُم بِهِ.

৩০. মেহমানের অধিকার হচ্ছে, তুমি বাড়ির ভিতর থেকে (সদর) দরজা পর্যন্ত তার সাথে হেঁটে গিয়ে তাকে বিদায় জানাবে। (উয়ূনু আখবারির রিযা আ., খ. ২, পৃ. ৭০)

مِن حَقِّ الضَّيفِ أَن تَمشِيَ مَعَهُ فَتُخرِجَهُ مِن حَرِيمِكَ إِلَى البَابِ.

৩১. ঈমান হচ্ছে ফরযগুলো আদায় করা এবং হারামগুলো বর্জন করা। (তুহাফুল উকূল, পৃ. ৪৯৫)

اَلإِيمَانُ : أَدَاءُ الفَرَائِضِ وَ اجتِنَابُ المَحَارِمِ.

৩২. যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে যা ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট করে তা দিয়ে (জালিম) শাসনকর্তাকে (বাদশাহ) সন্তুষ্ট করবে সে মহান আল্লাহর দ্বীন থেকে খারিজ (বের) হয়ে যাবে। (উয়ূনু আখবারির রিযা আ., খ. ২, পৃ. ৬৯)

مَن أَرضَى سُلطَانَاً بِمَا يُسخِطُ اللهَ خَرَجَ عَن دِينِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

৩৩. সদাচরণ অপেক্ষা (কিয়ামত দিবসে স্থাপিত) মানদণ্ডে (মীযান) আর কোন জিনিস বেশি ভারী হবে না। (উয়ূনু আখবারির রিযা আ., খ. ২ , পৃ. ২৭)

مَا مِن شَيءٍ أَثقَلَ فِي المِيزَانِ مِن حُسنِ الخُلُقِ.

৩৪. তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে জনগণকে কখনোই সন্তুষ্ট করতে পারবে না। তাই তোমরা মিষ্টিমুখে এবং সদাচরণ দিয়ে তাদেরকে সন্তুষ্ট করবে। (মুসনাদুল ইমামির রিযা আ., খ. ১ , পৃ. ২৯২)

إِنَّكُم لَن تَسَعُوا النَّاسَ بِأَموَالِكُم فَسَعُوهُم بِطَلَاقَةِ الوَجهِ وَ حُسنِ اللِّقَاءِ.

৩৫. নীরবতা ও মৌনতা অবলম্বন হচ্ছে হিকমতের (প্রজ্ঞা) অন্যতম (প্রবেশ) দ্বারবিশেষ। (তুহাফুল উকূল, পৃ. ৫২৩)

اَلصَّمتُ بَابٌ مِن أَبوَابِ الحِكمَةِ.

৩৬. প্রত্যেক মানুষের বন্ধু ও সঙ্গী হচ্ছে তার বিবেক-বুদ্ধি (আক্‌ল) এবং তার শত্রু হচ্ছে তার অজ্ঞতা। (উসূলুল কাফী, খ. ১, পৃ. ১১)

صَدِيقُ كُلِّ امرِئٍ عَقلُهُ وَ عَدُوُّهُ جَهلُهُ.

৩৭. (মানুষের সাথে মানুষের) অন্তরঙ্গতা ও ঘনিষ্ঠতা মানুষের ভয়ভীতি ও বিহ্বলতা দূর করে দেয় এবং (অন্যের কাছে) সাহায্য প্রার্থনা হচ্ছে দুর্ভাগ্যের মূল চাবিকাঠি। (বিহারুল আনওয়ার, খ. ৭৮ , পৃ. ৩৫৬)

اَلأُنسُ يُذهِبُ الَمَهَابَةَ وَ المِسئَلَةُ مِفتَاحٌ فِي البُؤسِ.

৩৮. অহংকার মহান আল্লাহর ভূষণ। অতএব, যে মহান আল্লাহর সাথে তার এ ভূষণ ছিনিয়ে নেয়ার জন্য দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে তাকে তিনি ধ্বংস করে দেবেন। (ফিকহুর রিযা আ., পৃ. ৩৭২)

اَلكِبرُ رِدَاءُ اللهِ مَن نَازَعَ اللهَ رِدَاءَهُ قَصَمَهَ.

৩৯. মহান আল্লাহ ঐ মুমিনের সৎকর্ম (আমল) কবুল করবেন না যে অন্তরে অপর কোন মুমিনের ব্যাপারে কুধারণা পোষণ করে। (ফিকহুর রিযা আ., পৃ. ৩৬৯)

لَا يَقبَلُ اللهُ عَمَلَ عَبدٍ وَ هُوَ يُضمِرُ فِي قَلبِهِ عَلَى مُؤمِنٍ سُوءاً.

৪০. তোমাদের উচিত লোভ-লালসা ও হিংসা-দ্বেষ পরিত্যাগ করা। কেননা, এ দুটি বিষয় অতীতের উম্মতগুলোকে ধ্বংস করেছে। (বিহারুল আনওয়ার, খ. ৭৮, পৃ. ৩৪৬)

إِيَّاكُم وَ الحِرصَ وَ الحَسَدَ فَإِنَّهُمَا أَهلَكَا الأُمَمَ السَّابِقَةَ.

৪১. গৃহস্বামীর উচিত নিজ পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতার জন্য চেষ্টা ও ব্যয় করা যাতে তারা (পরিবারের সদস্যরা) তার মৃত্যু কামনা না করে। (মান লা ইয়াহদুরুহুল ফাকীহ, খ. ২, পৃ. ৬৮)

يَنبَغِي لِلرَّجُلِ أَن يُوَسِّعَ عَلَى عِيَالِهِ لِئَلَّا يَتَمَنَّوا مَوتَهُ.

৪২. যে উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে মহান আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (উয়ূনু আখবারির রিযা আ., খ. ২, পৃ. ২৪)

مَن لَم يَشكُرِ المُنعِمَ مِنَ المَخلُوقِينَ لَم يَشكُرِ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

৪৩. দানশীল ব্যক্তি মানুষের খাদ্য থেকে আহার করে যাতে তারাও (লোকেরা) তার খাদ্য থেকে আহার করে। আর কৃপণ ব্যক্তি অন্যদের খাবার থেকে আহার করে না যাতে তারাও তার খাবার থেকে আহার না করে। (উয়ূনু আখবারির রিযা আ., খ. ২ , পৃ. ১২)

اَلسَّخِيُّ يَأكُلُ مِن طَعَامِ النَّاسِ لِ يَأكُلُوا مِن طَعَامِهِ وَ البَخِ يلُ لَا يَأكُلُ مِن طَعَامِ النَّاسِ لِئَلَّا يَأكُلُوا مِن طَعَامِهِ.

৪৪. যে ব্যক্তি সময়কে গালমন্দ ও তিরস্কার করবে তাকে গালমন্দ ও তিরস্কারে দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হবে (অর্থাৎ তার তিরস্কার ও গালমন্দ হবে দীর্ঘস্থায়ী)। (উয়ূনু আখবারির রিযা আ., খ. ২, পৃ. ৫৩)

مَن عَتَبَ عَلَى الزَّمَانِ طَالت مَعتَبَتُهُ.

৪৫. দুনিয়ায় (পার্থিব জগতে) জনগণের নেতা হচ্ছেন দানশীল ব্যক্তিরা এবং আখেরাতে জনগণের নেতা হচ্ছেন মুত্তাকিগণ। (সাহীফাতুর রিযা আ., পৃ. ৮৬)

سَادَةُ النَّاسِ فِي الدُّنيَا الأَسخِيَاءُ وَ سَادَةُ النَّاسِ فِي الآخِرَةِ الأَتقِيَاءُ.

৪৬. তিক্ত ও কটু হলেও তোমরা সত্যের ওপর ধৈর্যধারণ করো (দৃঢ়পদ থেক)। (ফিকহুর রিযা আ., পৃ. ৩৬৮)

اِصبِرُوا عَلَى الحَقِّ وَ إِن كَانَ مُرّاً.

৪৭. তোমাদের মুখ হচ্ছে তোমাদের প্রভুর সাথে যোগাযোগ করার পথ ও মাধ্যম। সুতরাং মিসওয়াক করে নিজ মুখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ। (সাহীফাতুর রিযা আ., পৃ.৫৪)

أَفوَاهُكُم طُرُقٌ مِن طُرُقِ رَبِّكُم فَنَظِّفُوهَا بِالسِّوَاكِ.

৪৮. মহান আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়াদি (হারামগুলো) পরিত্যাগ এবং মুমিনকে কষ্টদান থেকে বিরত থাকার চেয়ে বেশি উপকারী আর কোনো তাকওয়া-পরহেজগারী নেই। (বিহারুল আনওয়ার, খ. ৭৮, পৃ. ৩৪৮)

لَا وَرَعَ أَنفَعُ مِن تَجَنُّبِ مَحَارِمِ اللهِ وَ الكَفِّ عَن أَذَى المُؤمِنِ.

৪৯. যে ব্যক্তি নিজ নাফ্সের (প্রবৃত্তি) হিসাব-নিকাশ করে সে লাভবান হয় এবং যে ব্যক্তি নিজ নাফ্সের ব্যাপারে উদাসীন থাকে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (বিহারুল আনওয়ার, খ. ৭৮, পৃ. ৩৫৫)

مَن حَاسَبَ نَفسَهُ رَبِحَ وَ مَن غَفَلَ عَنهَا خَسِرَ.

৫০. যে ব্যক্তি বিচক্ষণতার সাথে নিজ কর্ম সম্পাদন করে না সে হচ্ছে ভুল পথে ভ্রমণকারী পথিকের ন্যায় যার সফরের গতি যত বাড়বে ততই সে সঠিক পথ (আসল লক্ষ্য) থেকে ভ্রষ্ট হবে ও দূরে চলে যাবে। (ফিকহুর রিযা আ., পৃ. ৩৮১)

اَلعَامِلُ عَلَى غَيرِ بَصِيرَةٍ كَالسَّائِرِ عَلَى غَيرِ الطَّرِيقِ لَا يَزِيدُهُ سُرعَةُ السَّيرِ إِلَّا بُعدَاً عَنِ الطَّرِيقِ.

৫১. মহান আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন যার ঘর আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও আক্রমণকারীকে প্রতিহত করে না ও তার বিরুদ্ধে লড়ে না। (উয়ূনু আখবারির রিযা আ.)

إِنَّ اللهَ عُزَّ وَ جَلَّ يُبغِضُ رَجُلاً يَخَالُ فِي بَيتِهِ وَ لَا يُقَاتِلُ.

৫২. পরস্পর যুদ্ধরত দু'দলের মধ্যে ঐ দল বিজয়ী হবে যারা হচ্ছে বেশি ক্ষমাশীল। (তুহাফুল উকূল, পৃ. ৫২৪)

مَا التَقَت فِئَتَانِ قَطُّ إِلَّا نُصِرَ أَعظَمُهُمَا عَفوَاً.

৫৩. যে ব্যক্তি সবার কাছে প্রিয় হতে চায় তার উচিত গোপনে ও প্রকাশ্যে (সর্বাবস্থায়) মহান আল্লাহকে ভয় করা। (ফিকহুর রিযা আ., পৃ. ৩৮১)

مَن أَرَادَ أَن يَكُونَ أَعَزَّ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللّهَ فِي سِرِّهِ وَ عَلَانِيَتِهِ

৫৪. বুদ্ধিবৃত্তি (আক্ল) হচ্ছে মহান আল্লাহর দান ও আশীর্বাদ (অর্থাৎ তা মানুষের অর্জিত নয়; বরং তা হচ্ছে স্রষ্টা প্রদত্ত) এবং ভদ্রতা ও শিষ্টাচার হচ্ছে কষ্টার্জিত (অর্থাৎ কষ্ট করে ভদ্রতা ও আদব-কায়দা শিখতে হয় এবং এর জন্য চেষ্টা-সাধনা ও কষ্ট সহ্য করতে হয়)। (তুহাফুল উকূল, পৃ. ৩৪২)

اَلعَقلُ حِبَاءٌ مِنَ اللّهِ وَ الأَدَبُ كُلفَةٌ.

৫৫. কাজ করার আগে চিন্তা-ভাবনা করা তোমাকে আফসোস ও পরিতাপ থেকে নিরাপদ রাখবে। (উয়ূনু আখবারির রিযা আ., খ. ২, পৃ. ৫৪)

اَلتَّدبِيُر قَبلَ العَمَلِ يُؤمِنُکَ مِنَ النَّدَمِ.

৫৬. চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে আয়নাস্বরূপ যা তোমাকে তোমার দোষ-ত্রুটি ও গুণগুলো দেখিয়ে দেয়। (ফিকহুর রিযা আ., পৃ. ৩৮০)

اَلتَّفَكُّرُ مِرآتُکَ تُرِیکَ سَيِّئَاتِکَ وَ حَسَنَاتِکَ.

৫৭. সচ্ছলতা ও সম্মান (সদা) ঘূর্ণনরত (অর্থাৎ অস্থিতিশীল ও স্বল্পস্থায়ী), তাই যখন তারা (সচ্ছলতা ও সম্মান) মহান আল্লাহর ওপর ভরসাকারীকে পাবে তখন তার কাছে স্থিতিশীল হবে ও স্থায়ীভাবে থেকে যাবে। (ফিকহুর রিযা আ., পৃ. ৩৫৮)

إِنَّ الغِنٰى وَ العِزَّ يَجُولَانِ فَإِذَا ظَفِرَا بِمَوَاضِعِ التَّوَكُّلِ أَوطَنَا.

৫৮. উপহার-উপঢৌকন অন্তরগুলো থেকে ঘৃণা দূর করে। (উয়ূনু আখবারির রিযা আ., খ. ২, পৃ. ৭৪)

اَلهَدِيَّةُ تُذهِبُ الضَّغَائِنَ مِنَ الصُّدُورِ.

৫৯. বিনয় ও নম্রতা হচ্ছে যে, তুমি অন্যদেরকে ঠিক সেই জিনিসটাই দেবে যার অনুরূপ তুমি পছন্দ কর যে তারা তোমাকে দিক। (মুসনাদুল ইমামির রিযা আ., খ. ১, পৃ. ২৭৪)

اَلتَّوَاضُعُ أَن تُعطِيَ النَّاسَ مِن نَفسِکَ مَا تُحِبُّ أَن يُعطُوکَ مِثلَهَ.

৬০. যে বান্দা মহান আল্লাহর জন্য ৪০ প্রভাত (দিন) একনিষ্ঠা ও একাগ্রতা (ইখলাস) সহকারে ইবাদত-বন্দেগি করবে তার অন্তঃকরণ থেকে তার কণ্ঠে প্রজ্ঞার ঝর্না প্রবাহিত হবে। (উয়ূনু আখবারির রিযা আ., খ. ২, পৃ. ৬৯)

مَا أَخلَصَ عَبدٌ لِلهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَربَعِينَ صَبَاحَاً إِلَّا جَرَت يَنَابِيعُ الحِكمَةِ مِن قَلبِهِ عَلٰى لِسَانِهِ.

৬১. দান-সাদাকাহ দাতা থেকে অনিবার্য বিপদাপদ দূর করে (অর্থাৎ দানকারীকে অবশ্যম্ভাবী বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখে ও রক্ষা করে।) (ফিকহুর রিযা আ., পৃ. ৩৪৭)

إِنَّ الصَّدَقَةَ تَدفَعُ القَضَاءَ المبرَمَ عَن صَاحِبِهِ.

৬২. যে ব্যক্তি সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ হতে চায় তার উচিত মহান আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করা। (ফিকহুর রিযা আ., পৃ. ৩৫৮)

مَن أَرَادَ أَن يَكُونَ أَقوَى النَاسِ فَليَتَوَكَّل عَلَى اللهِ.

৬৩. সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ (কামিল) মুমিন হচ্ছে সেই মুমিন যে সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী। (জামিউল আখবার, পৃ. ১২৫)

أَكمَلُ المؤمِنِينَ إِيمَانَاً أَحسَنُهُم خُلقَاً.

৬৪. মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের (ঈমান) পর বুদ্ধিবৃত্তির সর্বোচ্চ চূড়া হচ্ছে মানুষের সাথে বন্ধুত্ব এবং ভালো-মন্দ নির্বিশেষে সবার সাথে সদাচরণ। (উয়ূনু আখবারির রিযা আ., খ. ২, পৃ. ৩৫)

رَأسُ العَقلِ بَعدَ الإِيمَانِ بِاللهِ التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ وَ اصطِنَاعُ الخَيرِ إِلَى كُلِّ بَرٍّ وَ فَاجِرٍ

৬৫. (মহান আল্লাহর) নেয়ামতগুলো অস্বীকার করা হচ্ছে এমন পাপ যার শাস্তি অন্য সব পাপের চেয়ে দ্রুত আসে। (মুসনাদুল ইমামির রিযা আ., খ. ২ , পৃ. ২৮০)

أَسرَعُ الذُّنُوبِ عُقُوبَةً كُفرَانُ النِّعَمِ.

৬৬. ভর্ৎসনা ও নিন্দাবিহীন ক্ষমাই হচ্ছে সুন্দর ক্ষমা। (চল্লিশ হাদীস, পৃ. ১২০)

الصَّفحُ الجَمِيلُ : العَفوُ مِن غَيرِ عِتَابٍ.

৬৭. পুণ্যের গুপ্ত ধনভাণ্ডারগুলোর অন্তর্গত হচ্ছে নেক আমল গোপন রাখা এবং বিপদাপদে ধৈর্যধারণ এবং তা প্রকাশিত হতে না দেয়া। (উয়ূনু আখবারির রিযা আ., খ. ২, পৃ. ৩৮)

مِن كُنُوزِ البِرِّ : إِخفَاءُ العَمَلِ وَ الصَّبرُ عَلَى الرَّزَايَا وَ كِتمَانِ المصَائِبِ.

৬৮. মুমিন (প্রতিশোধ গ্রহণে) সক্ষম হলে তার ন্যায্য (প্রাপ্য) অধিকারের চেয়ে বেশি কিছু গ্রহণ করে না। (চল্লিশ হাদীস, পৃ. ১২৩)

اَلمؤمِنُ إِذَا قَدَرَ لَم يَأخُذ أَكثَرَ مِن حَقِّهِ.

৬৯. মুমিন ক্রুদ্ধ হলে তার ক্রোধ তাকে সত্যের (চৌহদ্দি) থেকে বের করে দেয় না (অর্থাৎ তাকে সত্য থেকে বিচ্যুত করে না)। (চল্লিশ হাদীস, পৃ. ১২৩)

اَلمؤمِنُ إِذَا غَضِبَ لَم يُخرِجهُ غَضَبُهُ مِن حَقٍّ.

৭০. যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ছাড়াই দিন শুরু করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (অর্থাৎ সে মুসলমান নয়)। (ফিকহুর রিযা, পৃ. ৩৬৯)

مَن أَصبَحَ لَا يَهتَمُّ بِأمرِ المسلِمِينَ فَلَيسَ مِنهُم.

৭১. মুসলমান হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার কণ্ঠ ও হাত থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে। (উয়ূনু আখবারির রিযা আ., খ. ২, পৃ. ২৪)

اَلمسلِمُ : الَّذِى يَسلَمُ المسلِمُونَ مِن لِسَانِهِ وَ يَدِهِ.

৭২. যে ব্যক্তি নিজের কদর (যোগ্যতা ও সামর্থ্য) সম্পর্কে ওয়াকিবহাল সে ধ্বংস হয় না। (উয়ূনু আখবারির রিযা আ., খ. ১, পৃ. ২৯৩)

مَا هَلَكَ امرُؤٌ عَرَفَ قَدرَهُ.

৭৩. যে ব্যক্তি নিজের জন্য (ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য) নেতৃত্ব চায় সে ধ্বংস ও অধঃপতিত হয়। কারণ, নেতৃত্ব কেবল নেতৃত্বের যোগ্য ব্যক্তির জন্য মানানসই। (ফিকহুর রিযা আ., পৃ. ৩৮৪)

مَن طَلَبَ الرِّئَاسَةَ لِنَفسِهِ هَلَكَ فَإِنَّ الرِّئَاسَةَ لَا تَصلُحُ إِلَّا لِأَهلِهَا.

৭৪. যে ব্যক্তি যে কোনো জিনিস এর সঠিক পথে অন্বেষণ করে সে পদস্খলিত হয় না। আর পদস্খলিত হলেও পরিত্রাণের পথ তার জন্য বন্ধ হয় না। (বিহারুল আনওয়ার, খ. ৭৮, পৃ. ৩৫৬)

مَن طَلَبَ الأَمرَ مِن وَجهِهِ لَم يَزِلَّ فَإِن زَلَّ لَم تُخذ لَهُ الحِيلَةُ.

৭৫. দানশীল (উদার ও মহানুভব) ব্যক্তি মহান আল্লাহ পাকের নিকটবর্তী, বেহেশতের নিকটবর্তী এবং মানুষেরও নিকটবর্তী। (চল্লিশ হাদীস, পৃ. ১২১)

اَلسَّخِىُّ قَرِيبٌ مِنَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَاسِ.

৭৬. ঈমানের লক্ষণগুলোর মধ্যে হচ্ছে : ১. গোপনীয়তা রক্ষা করা , ২. বিপদাপদে (দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্রে) ধৈর্যধারণ এবং ৩. মানুষের সাথে সদ্ভাব ও সদাচরণ। (চল্লিশ হাদীস, পৃ. ১২৪)

مِن عَلَامَةِ إِيمَانِ المؤمِنِ كِتمَانُ السِّرِّ وَ الصَّبرُ فِي البَأسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ مُدَارَاةُ النَّاسِ

৭৭. ফকীহ (ধর্ম সংক্রান্ত গভীর জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তির অধিকারী আলেম) হওয়ার লক্ষণগুলোর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে : ১. সহিষ্ণুতা, ২. জ্ঞান এবং ৩. মৌনতা অবলম্বন। (উয়ূনু আখবারির রিযা আ., খ. ১, পৃ. ৩৫৮)

مِن عَلَامَاتِ الفَقِيهِ: الحِلمُ وَ العِلمُ و الصَّمتُ.

৭৮. পরকালের জন্য নিকৃষ্ট পাথেয় হচ্ছে মহান আল্লাহর বান্দাদের ওপর অন্যায় ও জোর-জুলুম করা। (মুসনাদুল ইমামির রিযা আ., খ. ১, পৃ. ২৯২)

بِئسَ الزَّادُ إِلَى المَعَادِ العُدوَانُ عَلَى العِبَادِ.

৭৯. সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে মুসলমানকে ঠকায় অথবা তার ক্ষতিসাধন করে অথবা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। (উয়ূনু আখবারির রিযা আ., খ. ২, পৃ. ২৯)

لَيسَ مِنَّا مَن غَشَّ مُسلِمَاً أُو ضَرَّهُ أَو مَاكَرَهُ.

৮০. সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যার জ্বালাতন ও উৎপীড়ন থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না। (উয়ূনু আখবারির রিযা আ., খ. ২, পৃ. ২৪)

لَيسَ مِنَّا مَن لَم يَأمَن جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

৮১. (কারো প্রতি অন্যায়ভাবে) রাগান্বিত হয়ো না, কারো কাছে কিছু চেয়ো না এবং নিজের জন্য যা নিয়ে সন্তুষ্ট থাক ও পছন্দ কর ঠিক সেটা নিয়ে অন্যদের জন্যও সন্তুষ্ট থাক ও পছন্দ কর। (মুসনাদুল ইমামির রিযা আ., খ. ১, পৃ. ২৬৭)

لَا تَغضَب وَ لَا تَسأَلِ النَّاسَ وَ ارضَ لِلنَّاسِ مَا تَرضَى

৮২. স্বয়ং মদ হারাম এবং সব নেশাকর পানীয়ই হারাম। অতএব, কোন বস্তুর বেশি পরিমাণ যদি নেশার উদ্রেক করে তাহলে ঐ বস্তুর অল্প পরিমাণও হারাম হয়ে যাবে। (ফিকহুর রিযা আ., পৃ. ২৮০)

اَلخَمرُ حَرَامٌ بِعَينِهِ وَالمسكِرُ مِن كُلِّ شَرَابٍ فَمَا أَسكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.

৮৩. মানুষের সাথে সৌহার্দ্র্যপূর্ণ আচরণ ও বন্ধুত্ব হচ্ছে বুদ্ধিমত্তার অর্ধেক। (তুহাফুল উকূল, পৃ. ৫২০)

اَلتَّوَدُّدُ إِلَى النّاسِ نِصفُ العَقلِ.

৮৪. নেয়ামতপ্রাপ্ত (সচ্ছল) ব্যক্তির উচিত নিজ পরিবারের জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা আনয়ন (অর্থাৎ তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যয় ও যথোপযুক্ত ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা)। (তুহাফুল উকূল, পৃ. ৫১৯)

صَاحِبُ النِّعمَةِ يَجِبُ عَلَيهِ أَن يُوَسِّعَ عَلَى عِيَالِهِ.

৮৫. কোন মুসলমানকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা কোনো মুসলমানের জন্য জায়েয (বৈধ) হবে না। (উয়ূনু আখবারির রিযা আ., খ. ২ , পৃ. ৭১)

لَا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ أُن يُرَوِّعَ مُسلِمَاً.

৮৬. যে ব্যক্তি নিজের দারিদ্র ও অভাব-অনটনের কথা অন্যদের কাছে প্রকাশ করে সে তাদের কাছে নিজেকেই অপদস্থ ও খাটো করে। (ফিকহুর রিযা আ., পৃ. ৩৬৭)

مَن أَبدَى ضُرَّهُ إِلَى النَّاسِ فَضَحَ نَفسَهُ عِندَهُم.

৮৭. মন্দ ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের সঙ্গদান সৎ ও ভালো ব্যক্তিদের ব্যাপারে কুধারণার উদ্রেক করে। (উয়ূনু আখবারির রিয়া আ., খ. ২, পৃ. ৫২)

مُجَالَسَةُ الأَشرَارِ تُورِثُ سُوءَ الظَّنِّ بِالأَخيَارِ.

৮৮. মহান আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ, দানশীলতা (পুণ্য করা) এবং ইয়াকীন (নিশ্চিত বিশ্বাস)– এ তিন বিষয়ের চেয়ে বেশি সম্মানজনক ও গৌরবোজ্জ্বল কোনো বিষয় আসমান হতে অবতীর্ণ হয় নি। (ফিকহুর রিযা আ., পৃ. ৩৫৩)

مَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ أَجَلُّ وَ لَا أَعَزُّ مِن ثَلَاثَةٍ : التَّسلِيمِ وَ البِرِّ وَ اليَقِينِ.

মহান আল্লাহ আমাদেরকে ইমাম রিযা (আ.)-এর এসব অমিয় বাণী ও শিক্ষা আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করার তৌফিক দিন।

সংগ্রহ ও অনুবাদ : মোহাম্মাদ মুনীর হুসাইন খান

গাদীরের হাদিসের ওপর একটি পর্যালোচনা

গাদীরের হাদিসের গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ঠিক পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে হযরত আলী (আ.)-এর খিলাফত এবং ইমামত সংক্রান্ত বিষয়ে ভাগ্য নির্ধারণী একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিসগত দলিল হলো গাদীরের ভাষণ। বিদায় হজের পর 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে রাসূল (সা.) এ ভাষণটি দিয়েছিলেন। ইসলামের সর্বজনীনতা এবং রাসূল (সা.)-এর ওফাতের মাধ্যমে রেসালাতের পরিসমাপ্তি হওয়ার কারণে এ ভাষণটির গুরুত্ব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে; কারণ, ঐশী হেদায়াতের ধারাবাহিকতা বজায় থাকার জন্য নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি ও ইমামতের ধারার শুরু সমসাময়িক হতে হবে। এ কারণেই ইসলামের ঐশী হেদায়াতকারী নেতাদের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য আল্লাহ তা'আলা রাসূলের জীবনের শেষ বছরে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি প্রচারের দায়িত্ব দিয়েছেন।

গাদীরে খুমের ঘটনার প্রেক্ষাপটে কোরআনের আয়াত (সূরা মায়িদা : ৬৭) নাযিল হওয়া এবং বিদায় হজে রাসূলের ভাগ্য নির্ধারণী ভাষণ ইমামত ও রাসূলের পরবর্তী উত্তরাধিকারী নির্ধারণের বিষয়টি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তার চিহ্ন বহন করে। আল্লাহ তা'আলা গাদীরে খুমের এ ঘটনার মাধ্যমে ইমামতের বিষয়কে চিরন্তনতা দান করেছেন এবং এটিকে বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। যতদিন কোরআন থাকবে এবং এ আয়াত তেলাওয়াত করা হবে ততদিন গাদীর এবং ইমামত ও রাসূলের উত্তরাধিকারের বিষয়টি স্মরণ করা হবে।[১]

গাদীরে খুমের ঘটনা

দশম হিজরিতে নিজের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসার বিষয়টি রাসূল (সা.) বিভিন্ন উপলক্ষে উল্লেখ করেছিলেন। এ অবস্থায় তিনি যিলকদ মাসে বিদায় হজের ঘোষণা

দিয়ে মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হন। রাসূলের সাথে হজ করার মাধ্যমে আত্মিক প্রেরণার জন্য দূরবর্তী অঞ্চল থেকে মুসলমানরা মক্কার মসজিদুল হারামের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন। এ ঘটনাটিকে ইতিহাসে বিভিন্নভাবে নামকরণ করা হয়েছে, যেমন : 'হুজ্জাতুল বিদা', 'হুজ্জাতুল ইসলাম', 'হুজ্জাতুল বালাগ', 'হুজ্জাতুল কামাল', 'হুজ্জাতুত তামাম'। হজ পালন শেষে যখন সকল কাফেলা অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে তাদের নিজের অঞ্চলে যাওয়া জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল এমন সময় রাসূল (সা.) মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী গাদীরে খুমের 'জুহফা'[২] নামে একটি এলাকায় থামলেন এবং সকলকে একত্র হওয়ার নির্দেশ দিলেন। যাঁরা সামলে চলে গিয়েছিলেন তাঁদেরকে ফেরত আসার নির্দেশ দিলেন এবং যাঁরা এখনো পৌঁছেনি তাঁদের জন্য অপেক্ষা করলেন। কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী মহানবী (সা.) এক লক্ষের বেশি হাজী নিয়ে যোহর নামাজ শেষে জ্বলন্ত গরমে উটের ওপর বসার আসন দিয়ে বানানো মিম্বারে উঠে ভাগ্য নির্ধারণী ভাষণ দিয়েছিলেন।[৩]

গাদীরের ভাষণের বৈশিষ্ট্য

আলী (আ.)-এর ইমামত সংক্রান্ত অন্যান্য মূল পাঠের তুলনায় গাদীরের হাদিসটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী :

১. গাদিরের হাদিসটি এমন এক প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হয়েছে যে, সকল গোত্র থেকে আসা হাজীরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং রাসূল (সা.) এ বার্তাকে সকলের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। ইতিপূর্বে অন্য কোন হাদিস মুসলমানদের সকল গোত্রের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বর্ণিত হয় নি। তাই তাঁর এ কাজটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, আল্লাহ এবং রাসূল (সা.) এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি দিয়েছেন।

২. রাসূল (সা.) গাদিরের এ ভাষণটি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা হাজীরা তাঁর থেকে আলাদা হওয়ার সময় তাঁদের এবং মদিনার হাজিদের সামনে দিয়েছিলেন এ কারণে তা সকলের স্মরণ থাকবে। যদি এ ভাষণটি মক্কা অথবা মিনার প্রান্তরে দিতেন তাহলে বেলায়াত ও অভিভাবকত্বের বিষয়টি অন্যান্য বিষয়ের সাথে মিশ্রিত হতো এবং তাঁদের স্মরণেও বিক্ষিপ্ত আকারে থাকত।

৩. যেহেত সাধারণভাবে মানুষের প্রকৃতি হলো প্রত্যেকের শেষ অসিয়তকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা। যদি কেউ তার জীবনের বিভিন্ন সময়ে কোন কথা তার বন্ধুদের বলে, কিন্তু মৃত্যুর সময় তার উল্লেখ না করে তাহলে ঐ বিষয়টি ততটা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় না এবং কোন কোন সময় এক্ষেত্রে সন্দেহ প্রকাশ করা হয় যে, হয়তোবা সে তার আগের মত পরিবর্তন করেছে অথবা আশা করেছিল ঐ কাজটি করার, কিন্তু তার দৃঢ় ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মৃত্যুর সময় কেউ যদি আদেশ দেয় যে, সে মসজিদ নির্মাণ করতে চায় তাহলে কোন সন্দেহ ছাড়াই এ মসজিদ নির্মাণ করতে হবে বলে ধরে নেয়া হয়।

৪. গাদীরের হাদিসটিতে রাসূলের (সা.) উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। কারণ, তিনি বলেছেন : 'হে লোকসকল! আমি কী তোমাদের বিষয়ে তোমাদের থেকে অধিক অধিকার রাখি না?' অর্থাৎ আমি যা নির্দেশ দেই তোমাদেরকে অবশ্যই তা পালন করতে হবে যদিও তোমাদের অন্য কিছুর প্রতি আগ্রহ থাকে। উপস্থিত সকলে বললেন : 'আপনি আমাদের বিষয়ে আমাদের থেকে অগ্রাধিকারের অধিকারী।' তখন রাসূল (সা.) বললেন :

من كنتُ مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذُل من خذله

'আমি যার অভিভাবক আলী তার অভিভাবক। হে আল্লাহ! তুমি তার অভিভাবক হও যে আলীকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে। তার শত্রু হও যে আলীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। তাকে সাহায্য কর যে আলীকে সাহায্য করে। তাকে পরিত্যাগ কর যে আলীকে পরিত্যাগ করে।'

৫. এ হাদিসটি সনদের দিক থেকে সাধারণ ও বিশেষ সকল শ্রেণির মানুষের কাছে মুতাওয়াতির বলে গণ্য হওয়ার দৃষ্টিতেও অন্যান্য রেওয়ায়াত এবং হাদিসের ওপর প্রাধান্য রাখে। কারণ, সেগুলোর কোনটিই এ পর্যায়ে নয়।[৪]

গাদিরের ভাষণ

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর বক্তব্যকে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা এবং নিকটবর্তী সময়ে নিজের মৃত্যুর সংবাদ প্রদানের মাধ্যমে শুরু করেন। অতঃপর তিনি দ্বীনের মৌলিক

বিশ্বাসের বিষয়সমূহ অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদ, নিজের রিসালাত এবং কিয়ামত দিবসের বিশ্বাস সম্পর্কে স্বীকারোক্তি নেন এবং কোরআন ও আহলে বাইতকে আঁকড়ে ধরার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার পর আলী (আ.)-এর হাতকে এমনভাবে ওপরে তুলে ধরলেন যে, তাঁদের দুইজনের বগলের সাদা অংশ প্রকাশ পেয়েছিল এবং উপস্থিত সকল মানুষ হযরত আলীকে দেখে চিনতে পেরেছিলেন, অতঃপর রাসূল (সা.) বললেন :

يا ايها الناس من اولى بالمومنين من انفسهم

'হে লোকসকল! মুমিনদের ওপর তাদের চেয়েও কে বেশি অগ্রাধিকারের যোগ্য?' তাঁরা বললেন : 'আল্লাহ এবং রাসূল এ বিষয়ে অধিক জ্ঞান রাখেন।' এরপর রাসূল (সা.) বললেন : 'আল্লাহ আমার মাওলা (অভিভাবক) আর আমি মুমিনদের মাওলা এবং আমি তাদের নিজের ব্যাপারে তাদের চেয়েও বেশি অধিকার রাখি, আমার ইচ্ছা তাদের ইচ্ছার ওপর অগ্রাধিকার রাখে।' অতঃপর তিনি বললেন :

من كنت مولاه فعلى مولاه

'আমি যার মাওলা (অভিভাবক), আলীও তার মাওলা।'

এ বাক্যটিকে তিনি কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করলেন এবং এর পর আকাশের দিকে হাত তুলে দোয়া করলেন :

اللّٰهُمَّ والِ مَن والاهُ و عادِ مَن عاداهُ، وَ انصُر مَن نَصَرَهُ، وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَه و اَدِرِ الحقَّ معه حيثُ دار

'হে আল্লাহ! যে তাকে ভালোবাসে তাকে তুমি তাকে ভালোবাস। যে তার সাথে শত্রুতা করে তুমিও তার সাথে শত্রুতা কর। যে তাকে সাহায্য করে তুমিও তাকে সাহায্য কর। যে তাকে পরিত্যাগ করে তুমিও তাকে পরিত্যাগ কর। সে যেদিকে ঘোরে তার সাথে হককে ঘুরিয়ে দাও।'

অতঃপর তিনি বললেন :

اَلاَ فليبلغ الشَّاهِد الْغَائِب

'মনে রাখ, সকল উপস্থিত ব্যক্তি যেন এ বার্তা অনুপস্থিত ব্যক্তিকে পৌঁছে দেয়।'[৫]

শিয়া ও সুন্নি গ্রন্থসমূহে গাদিরের হাদিসের মূল্য

শিয়া এবং সুন্নি মনীষী ও গবেষকরা গাদীরের হাদিসের নির্ভরযোগ্য ও মুতাওয়াতির হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। শিয়া মনীষীদের মধ্যে অনেকেই, যেমন সাইয়্যেদ মুরতাজা গাদীরের হাদিসটির বিষয়ে সকল যুগের শিয়া-সুন্নি মনীষী ও গবেষকরা একমত বলে মনে করেন।[৬] তাঁর দৃষ্টিতে এ হাদিসটি কেবল শিয়াদের নিকট মুতাওয়াতির বলে গণ্য নয়; বরং সকল মুসলমানের নিকটই তা মুতাওয়াতির হিসেবে গণ্য হয়েছে।[৮]

মুহাম্মাদ জাফর কাত্তানী (মৃত্যু ১৩৪৫ হি.) তাঁর 'নাজমুল মুতানাছের মিনাল হাদিসিল মুতাওয়াতির' গ্রন্থের ২৩২ পৃষ্ঠায় 'আমি যার মাওলা, আলী তার মাওলা' হাদিসটি উল্লেখ করে যে পঁচিশজন সাহাবী তা বর্ণনা করেছেন তাঁদের নাম এনেছেন এবং যারা একে মুতওয়াতির বলেছেন তাঁদের নামও উল্লেখ করেছেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিশিষ্ট হাদিস বিশেষজ্ঞ ইবনে হাজার আসকালানীও (মৃত্যু ৮৫২ হি.) গাদীরের হাদিসের সূত্রের আধিক্য এবং এর সনদ সহীহ ও সঠিক হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন।[৯]

আল্লামা আমিনি শিয়া ও সুন্নি মাযহাবের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থগুলোতে গাদীরের হাদিসটি মুতাওয়াতির হওয়ার দাবি[১০] করেই শুধু ক্ষান্ত হন নি; বরং হাদিসটি যে মুতাওয়াতির তা প্রমাণ করেছেন।

গাদীরে খুমের ঘটনা এবং রাসূলের ভাষণের সত্যতার বিষয়টি আহলে সুন্নাতের কালামশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহেও বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়েছে।[১১]

এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া জরুরি যে, এমনকি ইবনে হাজার হাইতামী (মৃত্যু ৯৭৪ হি.), যিনি উমাইয়া ধারার এবং কঠিনভাবে মুয়াবিয়ার পক্ষ অবলম্বনকারী, তিনিও তাঁর 'সাওয়ায়িক' গ্রন্থে গাদীরের হাদিসকে সঠিক ও গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে উচ্চ মর্যাদার হাদিস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং এ সংক্রন্ত উত্থাপিত সংশয়ের উত্তর দিয়েছেন।[১২]

সালাফী হাদিস বিশেষজ্ঞ আলবানী গাদীরের হাদিসের বিভিন্ন সূত্রের দীর্ঘ পর্যালোচনা ও তা সহীহ প্রমাণের পর ইবনে তাইমিয়া কর্তৃক এ হাদিসটির শেষাংশকে জাল ও

মিথ্যা হওয়ার দাবির সমালোচনায় বলেছেন যে, এ হাদিসের বিচারের ক্ষেত্রে তিনি তাড়াহুড়া করেছেন এবং যথার্থ দৃষ্টি দেন নি।[১৩]

কুশচীসহ কোন কোন সুন্নি আলেম বুখারী, মুসলিম এবং ওয়াকেদীর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গাদীরের হাদিস বর্ণনা না করার কারণে একে দুর্বল হাদিস বলে মনে করেছেন?![১৪]

এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, প্রথমত অন্যান্য সহীহ হাদিস গ্রন্থসমূহে গাদীরের হাদিসের বর্ণনা এসেছে এবং হাকিম নিশাবুরীও তাঁর রচিত গ্রন্থ 'আল-মুসতাদরাকু আলাস সাহীহাইন'-এ তা বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও হাদিস বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা, যেমন যাহাবী, ইবনে হাজার আসকালানী, ইবনে হাজার হাইতামী গাদিরের হাদিসের মুতাওয়াতির অথবা সঠিক ও বিশুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি সত্যায়ন করেছেন।

সুতরাং একটি বা দুটি হাদিস গ্রন্থে কোন হাদিস উল্লিখিত না হওয়া তা অশুদ্ধ বা জাল সন্দেহ করার বিষয়টি দলিল হিসেবে কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষত যখন ঐ হাদিসটি একশ' দশ জন সাহাবী ও চুরাশি জন তাবেয়ী নবী করিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। পনের জন সুন্নি মনীষী এ হাদিসকে মুতাওয়াতির হিসেবে দাবি করেছেন এবং পঁচিশ জনের অধিক সুন্নি আলেম ও ইসলামি চিন্তাবিদ একে সঠিক ও সহীহ হাদিস বলেছেন। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রায় চারশ' প্রসিদ্ধ মনীষী তাঁদের গ্রন্থে এ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়াও এ হাদিস সকল যুগে মুতাওয়াতির হওয়ার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য ও জ্ঞানগত পদ্ধতির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে।[১৫]

দ্বিতীয়ত, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের হাদিসের উৎসমূলের সাথে পরিচিত ব্যক্তিরা খুব ভালোভাবে জানেন যে, সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত না হওয়ার বিষয়টি স্বয়ং কোন হাদিস অগ্রহণযোগ্য ও দুর্বল বলে গণ্য হওয়ার দলিল হতে পারে না; কারণ, বুখারী ও মুসলিম সকল সহীহ হাদিসকে তাঁদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন নি। এ কারণে প্রসিদ্ধ সুন্নি হাদিস বিশেষজ্ঞ হাকিম নিশাবুরী বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থের পূর্ণতা দানের জন্য 'মুসতাদরাকু আলাস সাহীহাইন' গ্রন্থ রচনার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ গ্রন্থটিতে যে সকল হাদিস সহীহ বুখারী ও মুসলিমে উল্লিখিত হয় নি সেগুলোকে একত্র করেছেন।[১৬]

তৃতীয়ত ইবনে হাজার সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, বুখারী নিজেই বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যে পরিমাণ সহীহ হাদিস সংগ্রহ করেছিলেন তার সবগুলোই তাঁর সহীহ (বুখারী) গ্রন্থে বর্ণনা করেন নি।[১৭]

এছাড়াও বুখারী তাঁর আরেকটি গ্রন্থ 'তারীখুল কাবীর'-এ বিভিন্ন অধ্যায়ে এ হাদিসকে একাধিকবার বর্ণনা করেছেন।[১৮]

আর ঐতিহাসিক ওয়াকেদী কোন হাদিস বর্ণনা না করার কারণে কোন হাদিসের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে সন্দেহ করার অবকাশ নেই; ওয়াকেদীকে ইসলামি গবেষকদের অগ্রাহ্য করাই এর কারণ হিসেবে যথেষ্ট। সুন্নি হাদিস বিশেষজ্ঞ যাহাবী তাঁর 'সীয়ারু আলামীন নুবালা' গ্রন্থে গুরুত্বের সাথে বলেন, হাদিস বিষয়ে বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর দুর্বলতার বিষয়ে সকলে একমত।[১৯]

চতুর্থত, এ হাদিস সম্পর্কে অনবগতি অথবা এর বিষয়বস্তুর প্রতি বিদ্বেষ থাকার কারণে অনেকেই তা বর্ণনা করে নি; তাই এ বিষয়টি হাদিসের দুর্বলতা হিসেবে গণ্য হবে না।

পঞ্চমত, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের একটি সার্বিক নিয়ম রয়েছে। আর তা হলো ইতিবাচককে (বর্ণিত হাদিসকে গ্রহণ) নেতিবাচকের (বর্ণিত হাদিসকে প্রত্যাখ্যানের) ওপর প্রাধান্য দান। যেমনটি হালাবী সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে ইতিবাচকতা, নেতিবাচকতার ওপর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।

গাদিরের হাদিস মুতাওয়াতির হওয়ার দলিল

গাদীরের হাদিসের বিভিন্ন সনদ বর্ণিত হয়েছে। মরহুম আল্লামা আবদুল হুসাইন আমিনী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এবং শিয়াদের সূত্রে বর্ণিত সনদগুলোকে তাঁর 'আল-গাদীর ফীল কিতাব ওয়াল সুন্নাতি ওয়াল আদাব' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সংকলন করেছেন এবং একশ' দশজন সাহাবির নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে আবু হুরাইরা, আবু লাইলা আনসারী, বাররা বিন আযিব অন্যতম।[২০]

চুরাশিজন তাবেঈ গাদীরের হাদিসটিকে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে আবু রাশেদ বাহরানী, আবু সুলাইমান আল-মুয়াযযিন, আসবাক বিন নুবাতা অন্যতম, একইভাবে

দ্বিতীয় হিজরি শতকে ছাপ্পান্ন জন, তৃতীয় হিজরি শতকে বিরান্নবই জন, চতুর্থ হিজরি শতকে আশিজন, পঞ্চম হিজরি শতকে ত্রিশজন, ষষ্ঠ হিজরি শতকে ২০ জন, সপ্তম হিজরি শতকে তেইশজন, এভাবে চৌদ্দতম হিজরি শতক পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে ৩৬০ জন ইসলামি গবেষক ও হাদিসশাস্ত্রবিদ গাদীরের হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। যে সকল ইসলামি ইতিহাসের গ্রন্থ আমাদের হাতে রয়েছে, এগুলোর মধ্যে এগারো জন সুন্নি ইতিহাসবিদ গাদীরের হাদিসটিকে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে বালাজুরী, ইবনে কুতাইবা ও তাবারী অন্যতম এবং পঁচিশজন সুন্নি ইসলামি গবেষক, যেমন ইবনে ইদরিস শাফেয়ী, আহমাদ বিন হাম্বাল, তিরমিযী, নাসাঈ, ত্বাহাবী এ হাদিসের বর্ণনাকারী। এ ছাড়াও দশজন কোরআনের মুফাসসির তাঁদের গ্রন্থে এ হাদিসটিকে তাঁদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে তাফসীরে তাবারী, সা'লাবী, কুরতুবী উল্লেযোগ্য। আটজন কালামশাস্ত্রবিদ যাঁদের মধ্যে কাজী আবু জাফর বাকলানী, ইযযি শাফেয়ী, শারিফ জুরজানী প্রমুখ তাঁদের 'আকাঈদ' (মৌলিক বিশ্বাসসমূহ) সংক্রান্ত আলোচনায় এ হাদিসটি পর্যালোচনা করেছেন। এ ছাড়াও পাঁচজন শব্দবিদও এ হাদিসটিকে বর্ণনা করেছেন, যাঁদের মধ্যে হামাবী তাঁর 'মুজামুল বুলদানে', জুবাইদী তাঁর 'তাজুল আরুসে' তা উল্লেখ করেছেন।[২১] সামষ্টিকভাবে এ হাদিসের বর্ণনাকারী ৫০০ জনে পৌঁছায়।[২২]

একইভাবে ইবনে আছির[২৩] ও কুরতুবী তাঁদের নিজস্ব সনদে এ হাদিসটি বণর্না করেছেন[২৪] এবং ইবনে কাছির দামেশকী[২৫], ইবনে মাজা কাজভিনী[২৬] এবং মুত্তাকী হিন্দী[২৭] বিভিন্ন সূত্র হতে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। একইভাবে হাদিসশাস্ত্রবিদরা গাদীরের হাদিসের বর্ণনার মাধ্যমে আলী (আ.) কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রমাণ পেশের ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যেমন : আবী তুফাইল[২৮], যাইদ ইবনে আরকাম[২৯], আমির বিন ওয়াছিলা[৩০], আনাস বিন মালিক[৩১], আবদুর রহমান বিন আবী লাইলা[৩২], আসবাগ বিন নুবাতা[৩৩], উমাইর বিন সায়াদ[৩৪], যাইদ বিন শাবা ও যাদান বিন উমর[৩৫] ও ইবনে ওয়ালিদ এবং অন্যান্য। যদি কোন ব্যক্তি বিবেকবান ও সুবিবেচক হয় এবং ইতিহাসের বিষয়ে পড়াশুনা করে থাকে তাহলে সহজে স্বীকার করবে যে, গাদীরের হাদিসের সনদে কোন অবস্থাতেই সন্দেহ প্রকাশ করার সুযোগ নেই।

গাদীরের হাদিসের নির্দেশনা

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ঠিক পরবর্তী উত্তরাধিকার হিসেবে আলী (আ.)-এর ইমামত ও খেলফতের বিষয়ে গাদীরের ভাষণ একটি সুস্পষ্ট ও অকাট্য নির্দেশনা হিসেবে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে আমরা এ ভাষণটির শাব্দিক নির্দেশনা সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং এরপর এর বিষয়বস্তুর নির্দেশনা ও সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে অলোচনা করব।

প্রথমত, গাদীরের ভাষণের শাব্দিক নির্দেশনা গাদীরের ভাষণ সুস্পষ্টভাবে কোন কিছুর দায়িত্বভার ও কর্তৃত্বের নির্দেশ করে। গুরুত্বপূর্ণ যে শব্দটি এ ভাষণে ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো 'মাওলা', যা 'আমি যার মাওলা, আলী তার মাওলা' (من كنت مولاه فعلي مولاه) বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে। ওয়ালীয়্যুন (وَلِيّ) শব্দটি, ওয়ালইয়ুন (وَلِي) শব্দমূল থেকে এসেছে। ওয়ালীয়্যুন শব্দের অর্থ হলো নিকটবর্তী। কোন কিছুর দায়িত্বশীলকে এ জন্য ওয়ালী বলা হয় যে, যেহেতু সে ঐ জিনিস ও বিষয়ের নিকটবর্তী; যেমন রক্তের বদলার অভিভাবক (ولي دم) মৃত্য ব্যক্তির অভিভাবক (ولي ميت) এবং যার কোন অভিভাবক নেই সুলতান তার অভিভাবক। মাওলা (مولي) শব্দের অর্থ হলো অভিভাবক এবং ইচ্ছার মালিক। আওলা (اولي) শব্দটি পরিচালক এবং অন্যান্য অর্থ এর শব্দমূল থেকে এসেছে। আরবি ভাষায় মাওলা শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এদের মধ্যে প্রতিবেশী, মুক্তিদানকারী, মুক্ত ব্যক্তি, একসাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, চাচাত ভাই, অভিভাবক ও ইচ্ছার অধিকারী এবং হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারী ব্যক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সর্বশেষ অর্থটি বেশি প্রসিদ্ধ। গাদীরের হাদিসে 'মাওলা' শব্দটি হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারী ব্যক্তির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অন্য কোন অর্থে নয়, কারণ :

১. হাদিসের শুরুতে একটি বিশেষ নির্দেশনা আছে, যেহেতু বলা হয়েছে, 'আমি কি তোমাদের বিষয়ে তোমাদের চেয়ে অগ্রাধিকার রাখি না?' এই অগ্রাধিকারের অর্থ হলো হস্তক্ষেপ করার অধিকার।

২. আরাব ভাষাভাষীদের মাঝে 'মাওলা' শব্দটি এ অর্থে অনেক বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন কেউ যদি বলে 'আগুন তাদের মাওলা' (النار مولاهم) অর্থাৎ আগুন তাদের জন্য অধিক উপযুক্ত (اولي بهم النار) অথবা কোন আরব যদি বলে, 'মাওলাল

আব্‌দ' (مولي العبد) অর্থাৎ যিনি কোন দাসের ওপর অগ্রাধিকার রাখে এবং হস্তক্ষেপ করার অধিকারসম্পন্ন।

৩. এ হাদিসটি বর্ণনার সময় 'মাওলা' শব্দের অন্যান্য অর্থ ব্যবহৃত হয় নি। কারণ, এটি যৌক্তিক নয় যে, অত্যন্ত গরম ও উত্তপ্ত আবহাওয়ায় রাসূল (সা.) সকল মানুষদের থামিয়ে রেখে 'মাওলা' শব্দটি অন্য অর্থে ব্যবহার করবেন, যেমন, 'আমি যার প্রতিবেশী, আলী তার প্রতিবেশী' অথবা 'আমি যার দাস মুক্তকারী, আলী তার দাস মুক্তকারী'।[৩৬]

দ্বিতীয়ত, গাদীরের ভাষণের বর্হিভূত নির্দেশনা। গাদীরের ভাষণে যে শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে তা থেকে যেমন এ বিষয়টি বোঝা যায় যে, 'মাওলা' শব্দ দ্বারা রাসূল (সা.)-এর উদ্দেশ্য তাঁর স্থলাভিষিক্তি ও নেতৃত্ব ছাড়া অন্য কিছু নয়। তেমনি এ ভাষণের বহির্ভূত বেশ কিছু নির্দেশনাও এ বিষয়টি প্রমাণ করে। এখানে আমরা এরূপ কয়েকটি দলিলের প্রতি ইশারা করব :

গাদীরের ভাষণের বিষয়বস্তু থেকে শ্রোতাদের অনুধাবনে যদি গাদীরের ভাষণের বাহ্য অর্থ মুসলিম উম্মাহর ওপর আলী (আ.)-এর ইমামত, নেতৃত্ব ও অভিভাবকত্বের বিষয়টি প্রমাণের জন্য সুস্পষ্ট দলিল বলে গণ্য নাও হয়, তাহলেও যাঁরা ঐ বিশাল সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন এ বিষয়ে তাঁদের অনুধাবনই (এ থেকে তাঁরা যা বুঝেছেন) ইমামীয়াদের বিশ্বাসের সপক্ষে দলিল হিসেবে যথেষ্ট। যাঁদের জন্য এ ভাষণটি দেওয়া হয়েছে তাঁরা এ ভাষণ থেকে যা বুঝেছেন ও ইমামীয়ারা যা বিশ্বাস করে তা একই অর্থাৎ তাঁরা তা থেকে ইমামত ও অভিভাবকত্ব ছাড়া অন্য কোন অর্থ বোঝেন নি। আল্লামা আমিনী তাঁর 'আল-গাদীর' গ্রন্থে গাদীর বিষয়ক কবিতা পাঠকারী কবিদের নাম রাসূলের গাদীরের ভাষণের সময় থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত তাঁদের কবিতাসহ সংকলন করেছেন।

অভিনন্দন ও মুবারবকবাদের হাদিস

রাসূলে আকরাম (সা.) আলী (আ.)-কে নেতা ও অভিভাবক হিসেবে পবিচয় করানোর পর আদেশ দিয়েছিলেন যে, সকলে যেন হযরত আলীকে মুমিনদের নেতা হিসেবে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানায়।

রাসূল (সা.) এ বক্তব্যকে 'অভিনন্দন ও মুবারকবাদের হাদিস' বলা হয়েছে। তিনি বলেছেন : 'আলীকে মুমিনদের নেতা হিসেবে সালাম কর।' সাথে সাথে রাসূলের (সা.) নির্দেশ বাস্তবয়িত হয়েছে, সকলে একের পর এক শুভেচ্ছা জানানোর জন্য তাঁর কাছে গেলেন।

বুরাইদা বিন হাসিব আসলামী বলেন : "রাসূল (সা.) সাত সদস্যের দলের অন্যতম হিসেবে আমাকে এবং অন্যদেরকে, যাঁদের মধ্যে আবু বকর, উমর, তালহা ও জুবায়েরও ছিলেন, নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন : 'মুমিনদের অভিভাবক ও শাসক হিসেবে আলীকে সালাম ও অভিনন্দন জানাও।' অতঃপর আমরা যেভাবে তিনি বলেছিলেন সেভাবে ('মুমিনদের অভিভাবক! আপনার প্রতি সালাম ও অভিনন্দন!') তাঁকে অভিনন্দন জানালাম। আর তখন রাসূল (সা.) আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন।"

অভিনন্দন ও মুবারকবাদের হাদিসটি মুসলমানদের সকল মাযহাবের মনীষীদের নিকট অকাট্য ও গ্রহণযোগ্য একটি হাদিস হিসেবে গৃহীত হয়েছে এবং তাঁরা তাঁদের গ্রন্থসমূহে এটিকে উল্লেখ করেছেন, এমনকি তাঁদের অনেকে এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন নাজ্জাশীর মাশায়েখ (হাদিস শিক্ষক) ইবনে থাদ্বায়েরীর 'আত-তাসলীম আলা আমীরিল মুমিনীন বি ইমরাতিল মুমিনীন' গ্রন্থটি এবং সাইয়্যেদ ইবনে তাউস রচিত 'কাশফুল ইয়াকীন বি ইখতিছাছে মাওলানা আলী বি ইমরাতিল মুমিনীন' গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও আল্লামা আমিনী তাঁর 'আল-গাদীর' গন্থে 'অভিনন্দনের হাদিস'-এর শিরোনামে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের গ্রন্থসমূহের ষাটটি সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণিত হওয়া বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

গাদীরের ভাষণের বিষয়বস্তু অভিভাবকত্ব ও প্রশাসনিক নেতৃত্ব হওয়া সংক্রান্ত আরেকটি নির্দেশনা হলো গাদীরের ভাষণের পর রাসূলের সাহাবিগণ কর্তৃক আলীকে মুসলমানদের মাওলা, নেতা ও দায়িত্বশীল হিসাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন। তাঁরা নিম্নলিখিত বাক্যটিকে বিশাল সমাবেশে মুখে উচ্চারণ করেছেন : 'মারহাবা! সাবাস! হে আবু তালিবের সন্তান! আপনার প্রতি; আপনি আমার এবং সকল মুমিনের অভিভাবক হয়েছেন।' বিখ্যাত কবি হাসসান বিন সাবিত এ ঘটনার ওপর ভিত্তি করে কবিতা পাঠ করেছিলেন।

গাদীরের ভাষণের অভিভাবকত্ব ও প্রশাসনিক নেতৃত্ব সংক্রান্ত এর আরেকটি বহির্গত নির্দেশনা হলো কোরআনের যে আয়াতগুলো গাদীরের ঘটনার প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে। যেমন সূরা মায়িদার নিম্নোক্ত দুই আয়াত :

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا ۚ

'আজকের দিনে তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামতকে তোমাদের ওপর সম্পূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে আমার মনোনীত দ্বীন করলাম।' (মায়িদা : ৩)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿٦٧﴾

'হে রাসূল! আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে যা আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে তা পৌঁছে দিন। আর যদি আপনি তা না করেন, তবে আপনি আপনার রিসালাতের বার্তাই পৌঁছে দেন নি (দায়িত্ব পালন করেন নি)। আর (এ বাণী পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে) আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদের হেদায়াত করবেন না। (মায়িদা : ৬৭)

গাদীরের হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণ উপস্থাপন

বেলায়াত ও অভিভাবকত্বের বিষয়টিই যে গাদীরের হাদিসের উদ্দেশ্য তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণকারী আরেকটি দলিল হলো আলী (আ.) এবং বনি হাশিমের অন্যান্য সদস্য এবং রাসূলের সাহাবীদের থেকে অনেক বার এ হাদিসকে হযরত আলীর ইমামত ও স্থলাভিষিক্তের দলিল হিসেবে উপস্থাপন করতে দেখা গেছে। সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে আমরা এখানে আলী (আ.) থেকে শুধু দুটি দলিল উপস্থাপনের নমুনা উল্লেখ করব।

প্রথম দলিল : ২৩ হিজরিতে তৃতীয় খলিফা নির্ধারণের জন্য যে শুরা গঠিত হয়েছিল সেখানে খলিফা নির্বাচনের দিনে আলী (আ.) যে দলিল পেশ করেছিলেন তা আবু তুফাইল আমের বিন ওয়াছিলাহ থেকে শিয়া ও সুন্নি উভয় মাযহাবের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত

হয়েছে। ইমাম আলী (আ.) দলিল উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যে উপস্থিতদের কসম দিয়ে বলেছেন : "তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তোমাদের মধ্য হতে কি কেউ সেখানে ছিল যাকে রাসূল (সা.) বলেছিলেন : 'আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা। হে আল্লাহ! যে আলীকে অভিভাবক হিসেবে মানে তুমি তার অভিভাবক হও। যে তার সাথে শত্রুতা করে তার সাথে শত্রুতা কর। যে তাকে সাহায্য করে তাকে সাহায্য কর। প্রত্যক্ষদর্শীরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট এ বার্তা পৌঁছে দেয়... এ সংক্রান্ত আরো যা কিছু বলা হয়েছিল, তা কি আমি ছাড়া অন্য কারো সম্পর্কে?!' তাঁরা উত্তরে বলেছিলেন : 'না, আল্লাহর কসম (আপনি ছাড়া অন্য কারো সম্পর্কে বলা হয় নি)।' এ কসম দেওয়ার হাদিসটি আল্লামা আমিনীর বর্ণনা ছাড়াও আহলে সুন্নাতের গ্রহণযোগ্য সূত্রসমূহে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আবীল হাদীদ এ রেওয়ায়েতকে 'মুস্তাফিজ' পর্যায়ের (খবরে ওয়াহেদের ঊর্ধ্বে) মনে করেছেন।

দ্বিতীয় দলিল : কোন কোন মুনাফিক ব্যক্তি আলী (আ.)-এর ইমামতের বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করার প্রেক্ষিতে তিনি কুফার বৃহৎ ময়দান রাহবাহ-তে সকলকে আহ্বান করেছিলেন এবং ভাষণ দানের মাধ্যমে নিজের ইমামতের সপক্ষে যুক্তি পেশ করেছিলেন। আল্লামা আমিনীর বর্ণনা অনুযায়ী আলী (আ.)-এর দলিল উপস্থাপনের বিষয়টি এত বেশি আকর্ষণীয় ছিল যে, অনেক তাবেয়ী এ ঘটনাকে বর্ণনা করেছেন এবং এর দলিল আলেমদের গ্রন্থসমূহে তাওয়াতুর পর্যায়ে পৌঁছেছে।[৩৭]

এ বিষয়ে এখানে আহমাদ ইবনে হাম্বাল থেকে বর্ণনা করব, তিনি জাযান বিন আবি উমর (অর্থাৎ আবু আমর ফারেসি) থেকে বর্ণনা করেছেন : "রাহবাহর ময়দানে আলী (আ.)-এর ভাষণ শুনেছিলাম। তিনি সেখানে উপস্থিতি মানুষদেরকে কসম দিয়ে বলেছিলেন যে, যারা গাদীরের দিনে রাসূলকে দেখেছিল এবং তাঁর বক্তব্য শুনেছিল তারা যেন সাক্ষ্য দেয়। তেরজন পুরুষ দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিয়ে বলেছিলেন : 'আমরা রাসূলুল্লাহকে বলতে শুনেছি যে, 'আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা।'"[৩৮]

গাদীর বিষয়ে দুটি সংশয়ের জবাব

প্রথম সংশয় (ইজমার সাথে বৈপরীত্যের সংশয়) : বলা হয়ে থাকে যে, যদি গাদীরের হাদিসে 'মাওলা'র অর্থ ইমামত এবং অভিভাবকত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকার হয় তাহলে

হযরত আবু বকরের খেলাফত– যা ইজমার ওপর প্রতিষ্ঠিত, তার সাথে এর বিরোধ সৃষ্টি হবে। এ বিরোধিতার সমাধান হিসেবে এ হাদিসের 'মাওলা'কে সাহায্যকারী ও বন্ধু অর্থে গ্রহণ অর্থাৎ তা তা'ভীল (ভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যা) করতে হবে; তা ছাড়া উপায় নেই।

এর জবাবে বলা যায়, গাদীদের হাদিসের আলোচনায় বলা হয়েছে যে, 'মাওলা' শব্দটিকে অভিভাবকত্ব এবং নেতৃত্ব ছাড়া অন্য কোন অর্থে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এরূপ অকাট্য ও সুস্পষ্ট বর্ণনার পাশাপাশি বিদ্যমান অন্যান্য নির্ভরযোগ্য দলিলের উপস্থিতিতে ইজমার কোন স্থান নেই।

তাছাড়া হযরত আবু বকরের খেলাফতের ব্যাপারে যে ইজমা দাবি করা হয় তা ত্রুটিমুক্ত নয়। কারণ, এ খেলাফত যে সকিফায়ে বনু সায়িদাতে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেখানে রাসূল (সা.)-এর প্রসিদ্ধ সাহাবীদের অনেকেই অনুপস্থিত ছিলেন এবং হযরত আলী[৩৯], আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও তাঁর সন্তানেরা, যুবায়ের ইবনে আওয়াম, বাররা ইবনে আযিব, উতবা ইবনে আবি লাহাব, সালমান ফারসি, আম্মার বিন ইয়াসির, আবু যার গিফারী, খালিদ ইবনে সায়িদ ইবনে আস, মিকদাদ ইবনে আমর, উবাই ইবনে কা'ব প্রমুখ সাহাবা এর বিরোধিতা করেছিলেন। সুতরাং কোনরূপ ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয় নি।[৪০]

দ্বিতীয় সংশয় (একই সময় দুইজন নেতা ও অভিভাবকের উপস্থিতির সংশয়) : আহলে সুন্নাহর কোন কোন আলেম বলেছেন যে, রাসূলের জীবদ্দশায় একমাত্র তিনিই মুসলমানের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রাখতেন। রাসূল (সা.)-এর অভিভাবকত্ব ও শাসন থাকা সত্তেও ইসলামি উম্মাহর শাসনকর্তা নির্ধারণের কোন অর্থ হয় না। এ কারণে বাধ্য হয়ে এ হাদিসের 'বেলায়াত' শব্দকে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা এবং ইমামত ছাড়া অন্য অর্থে ব্যাখ্যা করব।

সংশয়ের উত্তরে বলা যায় প্রথমত, রাসূল (সা.) যে বক্তব্যসমূহ যেখানে তিনি বলেছেন : 'আমি তোমাদের মধ্য হতে শীঘ্রই বিদায় নেব এবং আমি তোমাদের মাঝে দুটি ভারি ও মূল্যবান জিনিস কোরআন এবং আহলে বাইত রেখে যাচ্ছি'– এগুলো থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, তিনি ভবিষ্যতে তাঁর উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত কে হবেন তা নির্ধারণ ও ঘোষণার পরিকল্পনা করেছিলেন, তাই তা তাঁর জীবদ্দশার সাথে সম্পর্কিত

কোন বিষয় ছিল না। এ কারণে এখানে একই সময় দুইজন শাসক থাকার বিষয় আদৌ উত্থাপিত হয় না।

দ্বিতীয়ত, দৈনন্দিন জীবনে মানুষের কথপোকথনের মাঝে সাধারণত এমন কিছু ভাবার্থ ও শব্দ এবং নাম ও উপাধি ব্যবহার করা হয় যা বর্তমান সময়ের জন্য নয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য তাদের মধ্যে বিদ্যমান যোগ্যতা ও সক্ষমতা প্রকাশের জন্য তা ব্যবহার করা হয়। অনেক শাসক তাদের উত্তরাধিকারীকে তাদের জীবদ্দশায় নেতা ও অভিভাবক বলে ঘোষণা করে থাকে। সেই সময় হতেই তাদেরকে নেতা ও অভিভাবক হিসেবে নামকরণ করা হয় যদিও বর্তমান সময়ের জন্য তারা শাসক নাও হয়। এছাড়াও রাসূল (সা.) জীবদ্দশায় তাঁর অভিভাবকত্বের অধীনে আলী (আ.)-এর অভিভাবকত্ব বিদ্যমান ছিল। যেমনটি মানযিলাতের হাদিস অর্থাৎ হযরত আলী ও রাসূল (সা.)-এর সম্পর্ক হযরত হারুন ও মূসা (আ.)-এর সম্পর্কের অনুরূপ হওয়ার হাদিস থেকে বোঝা যায়।

তথ্যসূত্র

১. আল-গাদীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫ (ইতিহাসের দৃষ্টিতে গাদীরের গুরুত্বের অধ্যায়)।

২. 'জুহফা' মক্কা থেকে ১৬০ কিলোমিটার উত্তরে এবং মদিনার থেকে ৪৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত।

৩. তাফসীরে নমুনা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮; আল-গাদীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯; মাফাহীমুল কোরআন, ৭ম খণ্ড, পৃ ৫০৭; ইমাম ফাখরুদ্দিন রাযি, আত-তাফসীরুল কাবীর, ১২তম খণ্ড, পৃ. ৪০১; আদ-দুররুল মানছুর, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৮।

৪. শাহহে ফারসীয়ে তাজরীরদুল ইয়তিক্বাদ, পৃ. ৫১৭।

৫. আল-গাদীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫।

৬. আশ-শাফী ফীল ইমামাহ, শারীফ মুরতাজা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬১।

৭. আল্লামা হিল্লী (মৃত্যু ৭২৬ হি.) মুহাক্কেকে তূসীর (মৃত্যু ৬৭২ হি.) বক্তব্যকে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'এ হাদিসকে মুসলমানরা সমষ্টিগতভাবে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণনা করেছেন।'; কাশফুল মুরাদ ফী শারহী তাজরীদীল ইয়তিক্বাদ, ইলাহিয়াতের অধ্যায়, পৃ. ১৯১।

৮. নাজমুল মুতানাছির মিনাল হাদিসিল মুতাওয়াতির, পৃ. ১৯৪।

৯. ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার আসকালানী, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৬১।

১০. দালায়েলুস সিদ্‌ক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৩; হাফিজ সুয়ূতী স্বীকার করেছেন। কেননা, এ হাদিসটি মুতাওয়াতির হওয়ার বিষয়টি তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে..., কেন (এ

হাদিসটি) মুতাওয়াতির বলে গণ্য হবে না? যখন নিশ্চিতভাবে এ হাদিসটির সূত্রের সংখ্যা আহলে সুন্নাতের নিকট একশ'রও অধিক এবং এ হাদিসটি সত্তর জন অথবা এর চেয়েও অধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থের লেখক, তাবারী সম্পর্কে একদল লেখক ও গবেষক উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এ হাদিসটি পঁচাত্তরটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে এ বিষয়ে 'আল-বেলায়াত' নামে স্বতন্ত্র এক গ্রন্থও বিদ্যমান রয়েছে। ইবনে উকদাহ সম্পর্কেও তাঁরা বলেছেন যে, তিনি এ হাদিসটি একশ' পাঁচটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং এ বিষয়ে 'আল-মুয়ালাত' নামে তাঁর স্বতন্ত্র গ্রন্থও রয়েছে। ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর 'তাহযিবুত তাহযিব' গ্রন্থে হযরত আলীর জীবনী বর্ণনায় মাওলায়িয়াত বা আলীর মাওলা ঘোষিত হওয়ার হাদিসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। আর আবুল অব্বাস ইবনে উকদাহ এ হাদিসটির সূত্রগুলো সঙ্কলনের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং সত্তর জন বা তার অধিক সংখ্যক সাহাবী থেকে তা নকল করেছেন। আর ইবনে জারির তাবারীও তাঁর গ্রন্থে ঐ সূত্রগুলোকে সঙ্কলন করেছিলেন।

১১. শারহুল মাউয়াকেফ, কাজী আদি-দ্বীন আবদুর রহমান ইয্যি, মুহাক্কেক সাইয়্যেদ শারীফ আলী ইবনে মুহাম্মাদ জুরজানী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৬০।

১২. আল-সাওয়ায়েকুল মুহরেকা আলা আহলির রাফদ ওয়ায যিনদিকাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭।

১৩. সিলসিলাতু আহাদিসিস সাহীহাহ, আলবানী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৩।

১৪. শারহি তাজরীদ, কুশচী, পৃ. ৩৬৯।

১৫. তাফসীরে নামুনেহ, আয়াতুল্লাহ মাকারেম সিরাজী, একদল লেখকের সহযোগিতায় রচিত, ৫ম খণ্ড, পৃ, ৭; আবাকাতুল আনওয়ার ফী ইমামাতে আইম্মাতে আতহার, মীর হামিদ হুসাইন হিন্দী (মৃত্যু ১২৪৬-১৩০৬ হি.), ১ম খণ্ড থেকে ৬ষ্ঠ খণ্ডে হাদিসের সনদ সংক্রান্ত অলোচনা করেছেন এবং ৬ষ্ঠ খণ্ডের পরের অংশ থেকে ১০ম খণ্ডে হাদিসের বিষয়বস্তু সংক্রান্ত পর্যালোচনা করেছেন।

১৬. আরো বিস্তারিত জানার জন্য 'আদিল্লাতু ইমামাতি আমীরিল মুমিনীন মিনাস সুন্নাতে নুবুওয়াতি ওয়াল আকল' গ্রন্থটির ৮০ নং পৃষ্ঠা দেখুন।

১৭. মুকাদ্দামাতুল ফাতহিল বারী, ইবনে হাজার আসকালানী, মিশর, মাতবায়াতুস সালাফীয়া (সালাফী প্রকাশনা)।

১৮. তারীখুল কাবির, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৫, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৩, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪১।

১৯. সীয়ারু আলামীন নুবালা, যাহাবী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৫, একইভাবে তিনি লিখেছেন, নাসাঈ বলেছেন : 'রাসূলের প্রতি জাল ও বানোয়াট হাদিস তৈরির জন্য চারজন কুখ্যাত ছিল। এরা হলো মদিনার ইবনে ইয়াহিয়া, বাগদাদের ওয়াকেদী, খোরাসানের মাকাতেল ইবনে সুলাইমান, সিরিয়ার মুহাম্মাদ বিন সাঈদ।

২০. আল-গাদীর, ১ম খণ্ড, ১৪-৬২।

২১. আল গাদীর, ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২২. মানশুরে আকাঈদে ইমামিয়া, পৃ. ১৬০।

২৩. উসদুল গাবাতি ফী মা'রিফাতিস সাহাবা, মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ শাইবানী, বৈরুত, দারুল ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮।

২৪. আল জামেয়ু লী আহকামিল কুরআন, বৈরুত, দারুল আহইয়ায়িল তুরাছিল আরাবী, ১৮তম খণ্ড, পৃ. ২৭৮, ১৪০৫ হি.।

২৫. আল বিদায়া ওয়াল নিহায়া, আবুল ফিদা হাফিজ বিন কাছির দামেশকী, বৈরুত, মাকতাবাতুল মাআরেফ, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৫০।

২৬. সুনানু ইবনে মাজাহ, মুহাম্মাদ কাজভিনী, গবেষণায় মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী।

২৭. কানজুল উম্মাল ফী সুনানিল আহওয়াল, আলী মুত্তাকী হিন্দী, বৈরুত, মুয়াসসেসাতুর রিসালাহ, ১৪০৫ হি.।

২৮. মুসনাদে ইবনে হাম্বাল, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৮২, হা. ১৯৩২১।

২৯. খাসায়েছুল আমীরিল মুমিনীন, পৃ. ১৭৩, হাদিস ৯৩; আল বিদায়া ওয়াল নিহায়া, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১১ এবং ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৭।

৩০. শারহু নাহজিল বালাগা, ইবনে আবীল হাদীদ, বৈরুত, দারুল হায়াইল কুতুব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৬৭-১৬৮, প্রথম প্রকাশনা ১৩৭৯ ফারসি সাল।

৩১. প্রাগুক্ত, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ২১৭।

৩২. উসদুল গাবাতি ফী মা'রিফাতিস সাহাবাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮।

৩৩. প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১২৬।

৩৪. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ঐ, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮।

৩৫. তাজকিরাতুল খাওয়াস, সিবত ইবনে জাওজী, পৃ. ৩৫, বৈরুত, মুয়াসসিসাতু আহলি বাইত, ১৪০১ হি.।

৩৬. কাশফুল মুরাদ ফী শারহী তাজরীদুল ইয়তিক্বাদ, আল্লাম হিল্লী (ইলাহিয়াত অধ্যায়), পৃ. ১৯১।

৩৭. ইবনে আছির, উসদুল গাবাতি ফী মা'রিফাতিস সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫; খাওয়ারিজমি, আল-মানাকিব, পৃ. ১৫৬-১৫৭; ইবনে কাছির, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১০।

৩৮. আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭০।

৩৯. আবু হামিদ গাজ্জালী তাঁর 'সিররুল আলামীন ওয়া কাশফু মা ফিদ দারাইন' গ্রন্থে (১ম খণ্ড, পৃ.১৮) এবং ইবনে হাযম তাঁর আশ-শামিল ফিস সানায়াতিত তায়্যিবাহ' গ্রন্থে (১ম খণ্ড, পৃ. ৪) বলেছেন : 'আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও তাঁর সন্তানেরা এবং আলী, তাঁর স্ত্রী (হযরত ফাতিমা) ও তাঁদের সন্তানরা সাকিফার লোকদের সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিলেন।'

৪০. যায়নুদ্দিন ইবুনল ওয়ারদি, তারিখে ইবনে ওয়ারদি, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৭ হিজরি; আবুল ফিদা, আল-মুখতাছার ফি আখবারিল বাশার (তারীখে আবিল ফিদা), ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭।

অনুবাদ : মো. রফিকুল ইসলাম

ইমাম আলী (আ.) ও খেলাফত বিষয়ক দুটি প্রশ্ন

মো. আশিফুর রহমান

মহান আল্লাহর সিংহ, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উত্তরাধিকারী ও তাঁর ভাই, মহান ইমামগণের পিতা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আ.)-এর জীবন ছিল বৈচিত্র্যময়। পবিত্র মক্কায় আবরাহার হাতি বাহিনীর আক্রমণের ৩৩ বছর পর ১৩ রজব মহান আল্লাহ্‌র ঘর পবিত্র কা'বায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদেই আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে শাহাদাতবরণ করেন। আমৃত্যু তিনি এক পবিত্র জীবন যাপন করেছেন। বালক বয়সেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। একেবারে ছোটবেলায় তিনি শিক্ষক হিসাবে পান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষককে। শিক্ষকের প্রতিটি কথা তিনি মেনে চলতেন, শিক্ষকের আচার-আচরণ থেকে শিক্ষা লাভ করতেন, শিক্ষকের পেছনে পেছনে সর্বত্র গমন করতেন। আর শিক্ষকও ছাত্রকে বিশেষভাবে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ছিলেন সজাগ। যখন তিনি ইবাদাত-বন্দেগি করার জন্য হেরা পর্বতের গুহায় যেতেন তখনও তাঁর এ ছোট ছাত্রকে সাথে নিয়ে যেতেন। অল্প বয়সেই এ ছাত্র আধ্যাত্মিকতায় এতটা উচ্চ আসন লাভ করেন যে, অদৃশ্য জগতের অনেক কিছু তাঁর সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তিনি শয়তানের ক্রন্দন-ধ্বনি শুনতে পেতেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) তাঁকে বলতেন : 'আমি যা দেখি, তুমিও তা দেখ, আমি যা শুনি, তুমিও তা শোন, তবে তুমি নবী নও।'– নাহজ আল বালাঘা, খুতবা ১৯১

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর কাছ থেকে তিনি যে জ্ঞান অর্জন করেছেন তা অন্য কারও পক্ষে অর্জন করা সম্ভব ছিল না। এজন্যই তিনি তাঁকে 'জ্ঞান নগরীর দরজা' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) কর্তৃক 'আকযাউন্‌ নাস' বা মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক বলে অ্যাখ্যায়িত হয়েছেন।

অন্যদিকে হযরত আলী (আ.) আজীবন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে সহযোগিতা করেছেন। ইসলামের প্রতিটি যুদ্ধে তিনি বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাই তিনি 'আসাদুল্লাহ্‌' বা আল্লাহর সিংহ হিসেবে অভিহিত হয়েছেন।

হযরত আলী (আ.)-এর মর্যাদা এবং খেলাফতে তাঁর অধিকার সম্পর্কে সব যুগেই বিতর্ক চলে এসেছে। মুসলমানদের একটি দল মনে করে আলী (আ.) মুসলমানদের চতুর্থ খলীফা। তাঁর অবস্থান মুসলমানদের প্রথম তিন খলীফার পরে। খেলাফত প্রশ্নে তাঁদের

বক্তব্য হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) খেলাফতের দায়িত্বে কাউকে নিয়োগ করে যান নি; বরং এর দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহ্র ওপর অর্পণ করেছেন। আর মুসলমানরাও তাদের খলীফাগণকে নির্বাচন করেছে। অন্যদিকে আহলে বাইতের অনুসারীরা মনে করে আলী (আ.) যেহেতু নিষ্পাপ এবং সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাই সাহাবীদের মধ্যে তাঁর মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। আর তাঁর যোগ্যতার কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে তাঁকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু রাসূলের ওফাতের পর তাঁর আদেশকে পাশ কাটিয়ে আলী (আ.)-কে খেলাফত থেকে বঞ্চিত করা হয়।

পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াত, সূরা মায়েদার ৬৭ নং আয়াত, সূরা রাদের ৭ নং আয়াত, সূরা তওবার ২৯ নং আয়াতসহ অনেক আয়াত, এসব আয়াতের শানে নুযূল এবং হাদীসে সাকালাইন, হাদীসে মানযিলাত, হাদীসে ইয়াওমুদ্দার সহ অসংখ্য হাদীস থেকে অকাট্যভাবে আলী (আ.)-এর রাসূলের উত্তরাধিকারী হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। কিন্তু এরপরও মুসলমানরা আলী (আ.)-কে নেতা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে।

অনেকে বলে থাকে, এটা কীভাবে সম্ভব যে, মুসলমানরা রাসূলের আদেশ অমান্য করেছে? রাসূলের সময়ের মুসলমানরা যেহেতু উঁচু স্তরের মুমিন ছিলেন সেহেতু তাঁরা কখনই রাসূলের নির্দেশ অমান্য করতে পারেন না। কিন্তু ইতিহাস অন্য কথা বলে। অনেক ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সেই যুগে সকল মুসলমান এক রকম ছিল না। অনেকেই রাসূলের আদেশ অমান্য করেছে। যা হোক, মুসলমানদের একটি দল রাসূলের ওফাতের পরপরই আলী (আ.)-এর খেলাফতের অধিকারকে অস্বীকার করে এসেছে। কিন্তু ইতিহাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক হযরত আলীর নির্বাচন ও প্রথম তিন খলীফার প্রতি হযরত আলীর অসন্তোষের বিষয়ে অনেক বেশি দলিল ও অকাট্য প্রমাণ থাকায় তাদের সেই দাবির অসারতা প্রমাণিত হয়। আর এজন্যই তারা আরও দু'টি বিষয়ের অবতারণা করেছে।

প্রথম বিষয়টি হল : হযরত আলী (আ.) প্রথম তিন খলীফার খেলাফত বা শাসনব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলেন। তিনি তাঁদেরকে বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়ে সহাযোগিতাও করেছেন। যদি তিনিই প্রথম তিন খলীফাকে মেনে নিতে পারেন তাহলে খেলাফতের ব্যাপারে অন্য কারও প্রশ্ন উত্থাপনের কোন যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে না এবং এ কারণেই পূর্ববর্তী খলীফাগণের সমালোচনা করার কোন অধিকারও কেউ রাখে না।

আর দ্বিতীয় বিষয় হল : যদি হযরত আলী খেলাফত দাবি করে থাকেন তাহলে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানের নিহত হবার পর যখন মুসলমানরা আলী (আ.)-এর কাছে সমবেত হয়ে তাঁকে খেলাফত নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে, তখন কেন তিনি খেলাফত গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেন? এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, খেলাফতের বিষয়ে তাঁর কোন আগ্রহই ছিল না। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যদি তাঁকে খলীফা মনোনীত করে গিয়ে

থাকেন এবং কোন কারণে তিনি বঞ্চিত হয়ে থাকেন, তবে সুযোগ আসামাত্রই তিনি তা নিজের অধিকারে নিয়ে নিতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি।

এখন আমরা এ দুটি বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করব।

প্রথম বিষয় : ইবনে জারীর তাবারী, ইবনে কাসীর, ইবনে আসীর, ইবনে সা'দ, ইয়াকুবী সহ বড় বড় ঐতিহাসিকদের সবাই প্রথম খলীফার খেলাফত নির্বাচন নিয়ে সৃষ্ট সমস্যার কথা তাঁদের ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে বর্ণনা করেছেন। হাদীস গ্রন্থগুলোতেও এ সংক্রান্ত সমস্যার কথা বর্ণিত হয়েছে। কী ছিল সেই সমস্যা? দ্বিতীয় ও তৃতীয় খলীফার নির্বাচন নিয়েই বা কী হয়েছিল?

ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত হয়েছে যে, আলী (আ.) প্রথম তিন খলীফার খেলাফতকালে তাঁদেরকে সহযোগিতা করেছেন। কিন্তু এটি একটি বিরাট প্রশ্ন যে, তিনি কি তাঁদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছিলেন, নাকি তাঁকে মেনে নিতে বাধ্য করা হয়েছিল, নাকি অন্যান্য পারিপার্শ্বিকতার কারণে তিনি নীরব থেকেছেন। এসব প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওফাতের সময়ের ঘটনাবলি এবং তখনকার মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে হবে।

বর্তমানকালে মতোই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগেও মুসলমানরা ঈমান ও আমলের দিক থেকে সবাই একই রকম ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময় কয়েক ধরনের মুসলমানের অস্তিত্ব ছিল। একদল ছিলেন সত্যিকার মুমিন, কিন্তু তাঁদের পাশাপাশি স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন দুর্বল চিত্তের মুমিন এবং গোত্রপতি দ্বারা প্রভাবিত মুসলমানও ছিল, আর ছিল মুনাফিক গোষ্ঠী। এ মুনাফিক গোষ্ঠীই রাসূলের বিরুদ্ধে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

মুনাফিকদের ব্যাপারে সতর্ক করে সূরা বাকারা, সূরা তওবা ও অন্যান্য সূরায় আয়াত নাযিল হয়েছে, এমনকি সূরা মুনাফিকুন নামে স্বতন্ত্র সূরাও নাযিল হয়েছে। জীবদ্দশায়ই রাসূল (সা.) এসব মুনাফিকের অনেককে প্রকাশ্যে চিহ্নিত করেছেন। যেমন আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই। আবার অনেকের সম্বন্ধে তিনি কাউকে কাউকে বলে গিয়েছিলেন। যেমন হযরত হুযাইফাকে তিনি কতিপয় মুনাফিকের নাম বলেছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁকে সেসব নাম প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন। এর সত্যতা পাওয়া যায় দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমরের কথায়। যেখানে তিনি হুযাইফাকে জিজ্ঞেস করতেন যে, সেসব নামের মধ্যে তাঁর নামও রয়েছে কিনা। (কানজুল উম্মাল, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৪; ইবনে আসাকির, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯৭; এহইয়াউ উলুমুদ্দীন, ১ম খণ্ড) অবশ্য রাসূলের ওফাতের পর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে এসব মুনাফিকের পরিচয় প্রকাশিত হয়ে যায়।

পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে সাবধান করছে। আয়াতটি হল :

ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ

'আজ কাফিররা তোমাদের ধর্ম থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব, তাদেরকে ভয় কর না; বরং আমাকে ভয় কর।'– সূরা মায়েদাহ্ : ৩

এর অর্থ এভাবে বলা যেতে পারে যে, কাফিররা নয়, বরং মুসলমানরাই ইসলামের ক্ষতি করবে। কোন্ মুসলমান? যারা অন্তর দিয়ে ইসলামকে উপলব্ধি করেছে তারা? কখনই নয়; বরং যারা কেবল নামে মুসলমান। আজ যদি আমরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করি তবে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হই যে, আসলে মুসলমানরাই ইসলামের সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছে এবং এখনো করে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পরে নয়; বরং ওফাতের পূর্বেই মুসলমানরা ইসলামের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই এমন ক্ষতিকর বিষয় প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। রাসূলের জীবনের শেষ দিনগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেবল দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে উপস্থাপন করা হল।

ক. রাসূলুল্লাহ্ (সা.) শাম (সিরিয়ায়) সীমান্তে সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমে রাসূল (সা.) কর্তৃক মনোনীত অধিনায়কের বিরোধিতা করে যাত্রা বিলম্ব করা হয়। এরপর রাসূলের অসুস্থতার অজুহাতে মুসলমানরা রাসূলের নির্দেশ অমান্য করতে থাকে।

খ. আর এরপরই রাসূলের অসিয়ত লিখতে বাধা দেওয়ার সেই কলঙ্কিত কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : নবী (সা.)-এর রোগ যখন কঠিন হয়ে পড়ল তখন তিনি বললেন : 'আমাকে লিখবার উপকরণ এনে দাও, আমি তোমাদের জন্য এমন এক লিপি লিখে দেই যার পরে তোমরা পথ হারাবে না।' তখন কেউ একজন বললেন : নবী (সা.)-এর রোগ প্রবল হয়েছে। আমাদের কাছে তো আল্লাহ্র কিতাবই রয়েছে। সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' এতে সাহাবিগণের মধ্যে মতভেদ হল এবং শোরগোল বেড়ে গেল। তখন তিনি বললেন : 'তোমরা আমার কাছ থেকে উঠে যাও। আমার কাছে ঝগড়া করা উচিত নয়।'

হযরত ইবনে আব্বাস আফসোস করে বলতেন : 'আল্লাহ্র রাসূল ও তাঁর লিখতে চাওয়ার মাঝে উদ্ভূত পরিস্থিতি একটা বিপদই বিপদ।'

এ প্রসঙ্গে বর্ণনাগত কিছু পার্থক্য সহ বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১১২; ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং ৪০৮২ ও ৪০৮৩; ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ৫২৫৮।

রাসূলকে শেষ পর্যন্ত তাঁর অসিয়ত লিখতে দেওয়া হয় নি। আজ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আশংকা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। তাঁর উম্মতের মধ্যে আজ শত শত বিভক্তি। আর সকল ভাগ-উপবিভাগের দাবি : 'আমরাই সঠিক পথের অনুসারী। আর অন্য সবাই পথভ্রষ্ট, বিচ্যুত।' তাহলে রাসূলের উম্মত বিচ্যুত হয়েছে এটা স্বীকার করতেই হবে। এর পেছনে দায়ী কে? তথাকথিত মুসলমানরা নাকি কাফির-মুশরিকরা?

পবিত্র কুরআনে রাসূলের আনুগত্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলছেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوۡاْ عَنۡهُ وَأَنتُمۡ تَسۡمَعُونَ

﴿٢٠﴾

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর ও তাঁর রাসূলের (আনুগত্য কর)।'- সূরা আনফাল : ২০

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ﴿١﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرۡفَعُوٓاْ أَصۡوَٰتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجۡهَرُواْ لَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِبَعۡضٍ أَن تَحۡبَطَ أَعۡمَٰلُكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ ﴿٢﴾

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উচ্চকিত কর না, তাহলে তোমাদের অজ্ঞাতে তোমাদের আমলনামা বিনষ্ট হয়ে যাবে।' সূরা হুজুরাত ১-৩

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) যখন হযরত উসামা ইবনে যায়েদের সেনাবাহিনীকে মদীনা ত্যাগ করার আদেশ দিয়েছিলেন অথবা যখন মুসলমানদের লেখার উপকরণ আনার আদেশ দিয়েছিলেন তখন কি তারা ভুলে গিয়েছিল যে, আদেশদাতার আদেশ স্বয়ং আল্লাহ্‌র আদেশ-

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظٗا

﴿٨٠﴾

'যে রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল।'- সূরা নিসা : ৮০

অথবা

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ

'রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা হতে তোমাদের নিষেধ করে তা হতে বিরত হও।'- সূরা হাশর : ৭

না, কখনই নয়। আরবদের স্মৃতিশক্তি কখনই এত দুর্বল ছিল না। নাকি তারা এ আয়াতগুলোর অর্থ বোঝে নি? না, তও নয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় তাদের কাছে এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন।

হযরত আলী (আ.) বলেন : 'হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম! তারা আল্লাহ্র বাণী শুনেছিল এবং তার অর্থও বুঝেছিল, কিন্তু দুনিয়ার চাকচিক্য তাদের চোখে অধিক প্রিয় হয়ে পড়েছিল এবং দুনিয়ার জাঁকজমক ও বিলাসিতা তাদেরকে প্রলুব্ধ করে পথভ্রষ্ট করেছিল।'- নাহ্জ আল বালাঘা, খুতবা : ৩, শিকশিকিয়ার বক্তব্য, পৃ. ১৫, অনুবাদ : জেহাদুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০০

মুসলমানরা রাসূলের আদেশের বিরোধিতা করেছে; যে রাসূলের ওপর ওহী অবতীর্ণ হয় বলে তারা বিশ্বাস করত, যে রাসূলের অনেক অলৌকিক ঘটনা তারা প্রত্যক্ষ করেছে সেই নবীর আদেশ তারা লঙ্ঘন করতে শুরু করে। এরা তো বাহ্যিকভাবে মুসলমানই ছিল। পৃথিবীর কোন ব্যক্তি কি তাদেরকে 'কাফির' বলতে পারবে? কখনই নয়। তাহলে তারা কেমন মুসলমান ছিল?

একদল রাসূলকে অন্যান্য মানুষের মতো দোষ-গুণে মিশ্রিত মানুষ বলে মনে করত। তাঁর আদেশ-নিষেধকে তারা সাধারণ মানুষের আদেশ-নিষেধের মতো মনে করত। তাই যখন তারা রাসূলের জীবদ্দশাতেই তাঁর মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করেছে তখন তাদের কাছে হযরত আলীর মর্যাদা কতটুকুই বা হতে পারে? কারণ, তাঁর সম্পর্কে তো এই রাসূলই বলেছিলেন : 'আমি জ্ঞানের নগরী, আর আলী তার দরজা', (তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস নং ৩৬৬১) এবং 'হে আলী! আমার কাছে তোমার মর্যাদা মূসার কাছে হারুনের ন্যায়, তবে আমার পরে কোন নবী নেই।' (আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত সহীহ আল-বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং ৪০৬৮; বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত সহীহ মুসলিম, ৭ম খণ্ড, হাদীস নং ৬০৪০; ও জামে আল তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস নং ৩৬৬৩)

শুধু তা-ই নয়, রাসূলের ওফাতের পর এই একই গোষ্ঠী হযরত আবু বকরের কাছে হযরত উসামাকে সেনাপতির পদ হতে অপসারণের দাবি জানায়। [ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত সীরাত বিশ্বকোষ, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৮৮; আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত হযরত আবু বকর (রা.), পৃ. ১১৫-১১৬]

যারা বলে, সেই সময়ের মুসলমানরা রাসূলের প্রতিটি কথার অনুসরণ করত, তাদের কথার বিপরীতে এটি একটি বড় দৃষ্টান্ত। এ ঘটনা রাসূলের ওফাতের অনেক বছর পর নয়, মাত্র কয়েকদিন পর ঘটে। একটিমাত্র যুদ্ধের সেনাপতি হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক নিযুক্ত সেনাপতিকে যারা পরিবর্তন করে দেওয়ার জন্য দাবি করতে পারে সেখানে

তারা কিভাবে আলী (আ.)-এর মতো ব্যক্তিকে গোটা মুসলিম উম্মাহর নেতা বলে মেনে নিতে পারে? এ আলীর হাতেই তো তাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন ও তাদের গোত্রের নেতারা কাফির অবস্থায় নিহত হয়েছিল।

অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তো মুনাফিকদের চিনতে পেরেছিলেন, তারপরও কেন তিনি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন নি?

এর জবাবে বলতে হয়, প্রথমত যাদের বিরুদ্ধে রাসূল (সা.) ব্যবস্থা নেবেন তাদের সংখ্যা মোটেও কম ছিল না। তাঁর অসিয়ত লিখতে বাধা দেওয়ার ঘটনায় আমরা লক্ষ্য করি যে, এমন সংখ্যক সাহাবী তাঁর আদেশের বিপরীতে কথা বলতে শুরু করেন যার ফলে রাসূলের সামনে দু'দলের ঝগড়া শুরু হয়ে যায়।

আবার উসামা বিন যায়েদের বাহিনী কি বিশ-ত্রিশজন বা মুষ্টিমেয় সাহাবী ছাড়া রণাঙ্গনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে পারছিল না? যদি রাসূলের বিরোধিতাকারী মুসলমানদের সংখ্যা স্বল্প হত তবে তাদেরকে ছাড়াই উসামা যুদ্ধযাত্রা করতে পারতেন। কিন্তু এমন সংখ্যক ব্যক্তি উসামার নেতৃত্বের বিরোধিতা করছিল যার ফলে তাঁর পক্ষে সম্ভবই হচ্ছিল না শামের দিকে রওয়ানা হওয়ার। এ থেকে আমরা রাসূলের বিরোধিতাকারীদের সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি মাত্র। তাদের প্রকৃত সংখ্যা কেবল আল্লাহ্ই জানেন।

দ্বিতীয়ত, মুনাফিকদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর একটি প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে।

তাবুক অভিযান শেষে মদীনায় ফেরার পথে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে মুনাফিকরা। এ দলে কুরাইশদের আটজন ও মদীনার চারজন মুসলমান ছিল। তারা পাহাড়ি উপত্যকা থেকে রাসূলকে নিচে ফেলে দিয়ে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। রাতের বেলা হযরত হুযাইফা রাসূলের উট চালাচ্ছিলেন, আর হযরত আম্মার-ইবনে ইয়াসির উটের লাগাম ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। রাসূল গিরিপথ ধরে একটু উঁচুতে উঠতেই হঠাৎ পেছনে কতিপয় আরোহীকে দেখতে পেলেন যারা তাঁকে অনুসরণ করছিল। তাদের পরিচিতি যেন প্রকাশিত না হয়ে পড়ে সেজন্য তারা তাদের মুখ কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখেছিল। রাসূল তাদেরকে লক্ষ্য করে জোরে ভীতিপ্রদ আওয়াজ দেন এবং হযরত হুযাইফাকে লাঠি দিয়ে তাদের উটগুলোকে তাড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। মুনাফিকরা রাসূলের বজ্রকণ্ঠের আওয়াজে ভীত হয়ে পালিয়ে যায়।

হযরত হুযাইফা বলেন : "আমি তাদের উটগুলোর পায়ের চিহ্ন দেখে তাদেরকে চিনতে পেরেছিলাম এবং মহানবী (সা.)-কে বলেছিলাম : 'আমি আপনার কাছে তাদের পরিচিতি তুলে ধরব যাতে আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন।' মহানবী তখন আমাকে নির্দেশ দেন, আমি যেন তাদের নাম প্রকাশ না করি। সম্ভবত তারা তওবা করতে পারে। মহানবী আরও বলেন : 'আমি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করলে বিধর্মীরা বলবে : মুহাম্মাদ শক্তি ও ক্ষমতার তুঙ্গে পৌঁছার পর নিজ সঙ্গী-সাথিদের গর্দানের ওপর তরবারির আঘাত হেনেছে।"– চিরভাস্বর মহানবী (সা.), ২য় খণ্ড সূত্রে আল ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী,

৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৪২-১০৪৩; বিহারুল আনওয়ার, ১১তম খণ্ড, পৃ. ২৪৭ এবং সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এ কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এ কথার মাধ্যমেই মুনাফিকদের বিরুদ্ধে রাসূলের কোন শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ না করার কারণ স্পষ্ট হয়ে যায়। এ হলো মাত্র কয়েকজনের বিষয়। যদি রাসূল (সা.) তাঁর মৃত্যুশয্যায় তাঁর অনুসারীদের নির্দেশ দিতেন মুনাফিকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাহলে অবশ্যই সেটা গৃহযুদ্ধের রূপ নিত। কারণ, তখন মুনাফিকদের সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে গিয়েছিল। বনি ইসরাইলের মতো আরবরাও রাসূলকে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হত না। পরিণতিতে ইসলাম ধর্মই পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত– যে ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) দীর্ঘ তেইশ বছর এত সংগ্রাম করেছেন।

মুসলমানদের একটি দল রাসূলকে একজন রাষ্ট্রনায়ক ছাড়া কিছুই মনে করে নি– যিনি মৃত্যুপথযাত্রী। তাঁর মৃত্যুর পর কে রাষ্ট্রের অধিপতি হবে– এ বিষয়টিই তাদের কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। ক্ষমতার লোভ তাদেরকে অন্ধ করে ফেলে। আর তাই যারা রাসূলের গায়ে আঁচড় লাগতে দিতে রাজি ছিল না, যারা বুককে ঢাল করে রাসূলকে রক্ষা করেছে, আজ তারাই রাসূলের ওফাতের জন্য প্রহর গুণছে, কখন সেই কাঙ্ক্ষিত ক্ষণ আসবে যখন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যাবেন!

এখানে আমাদের মনে এ প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, কেন তারা রাসূলকে রক্ষা করতে চাইত? এটা কি তাদের ঈমানের জোর ছিল, নাকি তাদের কারো কারো অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে, আবার কারো কারো অন্তরে স্পষ্টভাবেই ক্ষুদ্র গোত্রের অধিপতি হওয়া অপেক্ষা বৃহত্তর আরব ভূখণ্ডের অধিপতি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করত?

এক্ষেত্রে আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই যে, সব মুসলমান একই রকম ছিলেন না। যাঁরা সত্যিকার মুমিন ছিলেন তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদেশ তাঁর জীবদ্দশায় যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খ মেনে চলেছেন তেমনি তাঁর ওফাতের পরও তাঁর আদেশ মেনে চলেছেন এবং তাঁরা ইসলাম ও রাসূলের জন্য জীবন দিয়েছেন, ইসলামের জন্য নিজেদের সর্বস্ব কুরবানি করেছেন। আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিকট তাঁদের জন্য সর্বোত্তম প্রতিদান কামনা করছি এবং তাঁদের অবস্থান আরও উচ্চ করার জন্য মহান আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করছি। আমাদের এ আলোচনার উদ্দেশ্য কেবল তারাই যারা পরবর্তীকালে ইসলামের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করেছে– মুসলমানদেরকে বিচ্যুতির পথে পরিচালিত করেছে।

যা হোক, রাসূলের ওফাতের পর আলী (আ.) প্রথম খলীফার বাইয়াত গ্রহণে বিলম্ব করেন। তিনি এ ব্যাপারে তাঁর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। রাসূলের ইন্তেকালের পর সাকীফায়ে বনু সায়েদায় সংঘটিত ঘটনা প্রবাহের সংবাদ আলী (আ.)-কে অবহিত করা হলে তিনি জানতে চান যে, আনসাররা কী বলেছিল।

লোকেরা বলল : 'তারা দাবি করেছিল, একজন প্রধান তাদের থেকে এবং অপর প্রধান অন্যদের মধ্য থেকে নিয়োগ করতে।' তখন তিনি বললেন : 'তোমরা কেন রাসূলের অসিয়ত সম্পর্কে বললে না যে, আনসারদের মধ্যে যারা ভালো লোক তাদের প্রতি উত্তম ব্যবহার করবে, আর যারা মন্দ লোক তাদেরকে সবসময় ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিতে দেখবে?' লোকেরা বলল : 'রাসূলের এ অসিয়তের মধ্যে তাদের দাবির বিরুদ্ধে কী আছে?' তিনি বললেন : 'যদি নেতৃত্ব তাদের হতো, তবে তাদের অনুকূলে অসিয়ত থাকার প্রয়োজন ছিল না।' তারপর জিজ্ঞেস করলেন : 'কুরাইশরা কী জবাব দিল?' লোকেরা বলল : 'তারা যুক্তি দেখাল যে, তারা রাসূলের সাজারার (বংশধরদের) অন্তর্ভুক্ত।' আলী (আ.) বললেন : 'তারা সাজারার যুক্তি দেখিয়েছে, অথচ এর ফল বিনষ্ট করে ফেলেছে।'- নাহ্জ আল বালাঘা, খুতবা ৬৬, পৃ. ৮২, অনুবাদ : জেহাদুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০০

উল্লেখ্য, হযরত আবু বকরের বংশধর সাত স্তর ও হযরত উমরের বংশধর নয় স্তর ওপরে গিয়ে রাসূলের বংশধারায় মিলিত হয়েছে।

এ অবস্থায় আলী (আ.) কী করবেন? তিনি কি কোন প্রতিবাদ না করেই তাঁর অধিকার হরণকে মেনে নেবেন? নাকি বিদ্রোহ করবেন?

আলী (আ.) বিনা প্রতিবাদে তাঁর অধিকার হরণকে মেনে নেন নি। তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন। তবে যতটুকু না করলেই নয় ততটুকু প্রতিবাদ করার মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য খেলাফতের বিষয়ে চিন্তার উপাদান তিনি দিয়ে গিয়েছেন। আলী (আ.) যদি কোন প্রতিক্রিয়াই প্রদর্শন না করতেন তবে খেলাফতের বিষয়ে আজ ভিন্ন চিন্তার কোন সুযোগই আসত না। তাঁর প্রতিবাদের পরও যেভাবে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হয় তিনি প্রতিবাদ না করলে কি অবস্থা হতো সেটা সহজেই অনুমেয়।

কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, হযরত আলী তো ছিলেন 'আল্লাহ্র সিংহ', তাহলে কেন তিনি নিশ্চুপ ছিলেন?

এর জবাবে বলা যায়, প্রশ্নটা হযরত আলী সম্পর্কে না করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সম্পর্কে করাই তো যুক্তিযুক্ত। যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মুসলমানদের অবস্থা দেখে নিশ্চুপ হয়ে যান সেখানে হযরত আলীকে নিয়ে কেন প্রশ্ন করা হয়? নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ক্ষমতা আলী (আ.)-এর চেয়ে বেশি ছিল, কিন্তু তিনি যেমন পরিস্থিতির কারণে নিশ্চুপ ছিলেন, তেমনি হযরত আলীও একই কারণে নিশ্চুপ ছিলেন।

আবু সুফিয়ান ও হযরত আব্বাস কর্তৃক সাহায্যের প্রস্তাব দানের প্রেক্ষিতে আলী (আ.) যে জবাব দিয়েছিলেন তার মধ্যেই তাঁর নিশ্চুপ থাকার কারণ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন : 'যদি আমি বলেই ফেলি (খেলাফতের কথা), তবে তারা আমাকে বলবে ক্ষমতালোভী; আর যদি আমি নিশ্চুপ থাকি, তবে তারা বলবে, আমি মৃত্যুভয়ে ভীত। দুঃখের বিষয় এই যে, সকল উত্থান-পতনের মধ্যেও আমি টিকে রয়েছি। আল্লাহ্র কসম!

আবু তালিবের পুত্র মৃত্যুর সাথে এমনভাবে পরিচিত যেমন একটি শিশু তার মায়ের স্তনের সাথে। আমি নীরব রয়েছি আমার গুপ্ত জ্ঞানের কারণে যা আমাকে দান করা হয়েছে। যদি আমি তা প্রকাশ করি তবে গভীর কূপ থেকে পানি উত্তোলনরত রশ্মির মতো তোমরা কাঁপতে থাকবে।'- নাহ্জ আল বালাঘা, খুতবা ৫, পৃ. ২৫

অন্যদিকে আলী (আ.)-এর সমর্থনকারীর সংখ্যা এত কম ছিল যে, তাদের নিয়ে তাঁর দাবিতে সোচ্চার হওয়ার মতো কোন অবস্থাও তখন ছিল না। আলী (আ.) এদিকটি তাঁর এক ভাষণে ব্যক্ত করেন : 'রাসূলের ইন্তেকালের পর আমি লক্ষ্য করলাম, আমার পরিবার-পরিজন ছাড়া আমার আর কোন সমর্থক নেই। তাই আমার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাদেরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে বিরত রইলাম। পরিস্থিতি আমার চোখে ধূলিকণার মতো বেঁধা সত্ত্বেও আমি আমার চোখ বন্ধ রাখলাম, গলায় শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা সত্ত্বেও আমি পান করলাম, আমার শ্বাস-প্রশ্বাসে বিঘ্ন হওয়া এবং তিক্ত খাদ্য পাওয়া সত্ত্বেও আমি ধৈর্যধারণ করলাম।'– নাহজ আল বালাঘা, খুতবা ২৬, পৃ. ৪৯

হযরত আলী (আ.) তখনকার অবস্থা সম্পর্কে বলছেন : 'মুনাফিকরা ক্ষোভে ও রাগে আঙ্গুল কামড়াচ্ছিল। সেই সাথে মুরতাদ ও ধর্মত্যাগীরা সুযোগ খুঁজছিল। আর কাফির জাতিসমূহের অবস্থা আগে থেকেই স্পষ্ট ছিল। এদিকে আনসারগণও মুহাজিরদের বিরোধিতা করছিল ও এ দাবি করছিল যে, দু'জন খলীফার একজন মুহাজির হতে ও একজন আনসার হতে।'

হযরত আবু বকরের খেলাফত কালে ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। ভণ্ড নবীদের আবির্ভাব হয়, মুসলমানদের মধ্যে ধর্মত্যাগের প্রবণতা দেখা দেয়। এসব ছিল মুসলমানদের মধ্যকার বিশৃঙ্খলা। অন্যদিকে রোমান সীমান্ত আগে থেকেই এতটা সংঘাতময় হয়ে ওঠে যে, রাসূল (সা.) তার মৃত্যুশয্যায়ও সেখানে সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'হে লোকসকল! জেনে রাখ, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন আমাদের মাঝ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন তখন এটাই প্রয়োজন ছিল যে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত শাসনকার্যের ব্যাপারে আমাদের সাথে যেন কেউ বিবাদ না করে এবং তার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি না দেয়। কারণ, আমরাই ছিলাম তাঁর ওয়ারিশ, নিকটাত্মীয় এবং অভিভাবক। কিন্তু প্রত্যাশার বিপরীতে একদল কুরাইশ আমাদের অধিকারের প্রতি হাত বাড়ায় এবং আমাদের থেকে খেলাফতকে ছিনিয়ে নেয় ও নিজেদের জন্য কুক্ষিগত করে। আল্লাহ্র শপথ! যদি মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ ও ফাটল সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকত এবং ইসলামী ভূখণ্ডে পুনরায় কুফরী ও শির্ক প্রত্যাবর্তনের ভয় না থাকত এবং ইসলাম ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হওয়ার আশঙ্কা না থাকত তাহলে অবস্থা যা দেখছ তা থেকে ভিন্ন কিছু হতো।'– বেলায়াতের দ্যুতি, পৃ. ১৬৪-১৬৫ সূত্রে নাহজুল বালাগাহ, ইবনে আবিল হাদীদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৭

ইবনে আবিল হাদীদ এ প্রসঙ্গে অভিমত ব্যক্ত করেন : 'অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, কালের পরিক্রমায় হিংসা-বিদ্বেষ ও প্রতিশোধ পরায়ণতাসমূহ বিস্মৃত হয়ে যায় এবং প্রতিহিংসাপূর্ণ অন্তরসমূহ ক্রমেই শীতল হয়ে পড়ে। সময়ের আবর্তনে একটি প্রজন্ম গত হয় এবং নতুন প্রজন্ম তার স্থলাভিষিক্ত হয়। ফলে পুরাতন হিংসা-বিদ্বেষগুলো ক্রমেই ফিকে হয়ে পূর্ববর্তী প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্থানান্তরিত হয়। হযরত আলী (আ.) যেদিন খেলাফতের আসনে আরোহণ করেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর পঁচিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। তাই স্বভাবতঃই আশা করা হচ্ছিল যে, এ দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে হিংসা ও বিদ্বেষগুলো বিস্মৃতির তলে হারিয়ে গেছে। কিন্তু আশার বিপরীতে দেখা গেল যে, সিকি শতাব্দী পার হওয়ার পরও হযরত আলী (আ.)-এর বিরোধীদের মানসিকতা পরিবর্তিত হয় নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর ইন্তেকালের পরে হযরত আলী (আ.)-এর প্রতি তাদের যে প্রতিহিংসা ছিল তার কিছুই হ্রাস পায় নি।

এমনকি কুরাইশ বংশের লোকেরা এবং তাদের কিশোর ও যুবকরা– যারা ইসলামের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধসমূহ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে নি এবং বদর, ওহুদ, খায়বার ইত্যাদি রণাঙ্গনে কুরাইশের বিরুদ্ধে হযরত আলী (আ.)-এর বীরত্ব দেখে নি তারাও তাদের পূর্বপুরুষদের ন্যায় হযরত আলী (আ.)-এর বিরুদ্ধে কঠিন শত্রুতায় অবতীর্ণ হয় এবং তাঁর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে।

এমতাবস্থায় ইমাম (আ.) যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর খেলাফতের আসনে বসতেন এবং শাসনকর্তৃত্ব হাতে তুলে নিতেন তাহলে বিরোধীদের মধ্যে এমন এক আগুন প্রজ্বলিত হতো এবং এমন বিস্ফোরণ ঘটতো যার ফলে ইসলাম মুছে যেত, আর মুসলমানদের ধ্বংস হওয়ার এবং ইসলামী রাজ্যসমূহে পুনরায় জাহেলিয়াত প্রত্যাবর্তনের কারণ হতো।'– বেলায়াতের দ্যুতি, পৃ. ১৬৫-১৬৬ সূত্রে শার্হে নাহজুল বালাগাহ : ইবনে আবিল হাদীদ, একাদশ খণ্ড, পৃ. ১১৪ (খুতবা নং ৩১১)

এসব কারণে হযরত আলী (আ.) খেলাফত হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে সার্বিক পরিস্থিতি আলী (আ.)-এর দাবি উত্থাপনের জন্য উপযোগী ছিল না। তাই তিনি নীরবতা অবলম্বন করাকেই শ্রেয় মনে করেন। তবে নিজের যৌক্তিক অবস্থান প্রমাণের লক্ষ্যে তিনি প্রথম খলীফার বাইয়াত হতে বিরত থাকেন। কিন্তু তাঁকে জোরপূর্বক বাইয়াতের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।– বেলায়াতের দ্যুতি, পৃ. ১৮১

হযরত আলী তাঁর পূর্বসূরিদের সাহায্য করার ব্যাপারে বলেছেন : 'আল্লাহ্র শপথ, আমি কোনোদিনই ভাবি নি যে, আরবরা খেলাফতকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খান্দান থেকে বের করে নিয়ে যাবে কিংবা আমাকে তা থেকে বিরত রাখবে। আমাকে হতবাক করে দিল যে, লোকেরা অন্যের দিকে ধাবিত হয়েছে এবং তার হাতে বাইআত হয়েছে। একারণে আমি বিরত থাকলাম। দেখলাম যে, একদল মানুষ ইসলাম থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে এবং মুহাম্মাদ (সা.)-এর দ্বীনকে মুছে ফেলতে চাইছে। আমি ভয় পেলাম, যদি ইসলাম

ও মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে না আসি তাহলে তার দেহে ক্ষতবিক্ষত অবস্থা দেখতে পাব– যার দুঃখ আমার কাছে কয়েক দিনের হুকুমাতের চাইতে অনেক ভারী ও কষ্টকর হবে– যে হুকুমাতের স্বাদ মরীচিকা কিংবা মেঘমালার মতো দ্রুত হারিয়ে যায়। কাজেই এসব ঘটার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং মুসলমানদেরকে সাহায্য করলাম। ফলে বাতিল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো আর ইসলামের কোলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে এলো।'– বেলায়াতের দ্যুতি, পৃ. ১৬১-১৬২ সূত্রে নাহ্জুল বালাগাহ্ : 'আবদুহ্, পত্র নং ৬২

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর মৃত্যুর পূর্বে হযরত উমরের হাতে খেলাফতের ভার অর্পণ করেন। আলী (আ.) দ্বিতীয়বারের মত বঞ্চিত হন। তিনি তাঁর বিখ্যাত খুতবা 'শিকশিকিয়া'য় হযরত আবু বকর ও হযরত উমর সম্পর্কে বলেন : 'সাবধান! আল্লাহর কসম, আবু কুহাফার পুত্র (আবু বকর) নিজে নিজেই তা (খেলাফত) পরিধান করে নিয়েছিল। সে নিশ্চিতভাবেই জানত যে, খেলাফতের জন্য আমার অবস্থান এমন যেন যাতার কেন্দ্রিয় শলাকা। বন্যার পানি আমার কাছ থেকে প্রবাহিত হয় এবং পাখি আমার কাছ পর্যন্ত উড়ে আসতে পারে না। আমি খেলাফতের সামনে একটি পর্দা টেনে দিলাম এবং নিজেকে সেটা থেকে নির্লিপ্ত রাখলাম। এরপর আমি প্রবল বেগে আক্রমণ করা অথবা ধৈর্য সহকারে চোখ বন্ধ করে অন্ধকারের সকল দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করার বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। এরই মধ্যে বয়স্কগণ দুর্বল হয়ে পড়ল, যুবকেরা বৃদ্ধ হয়ে গেল এবং মুমিনগণ চাপের মুখে আমরণ কষ্ট করে কাজ করছিল। আমি দেখলাম এ অবস্থায় ধৈর্যধারণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সুতরাং আমি ধৈর্যধারণ করলাম যদিও তাদের কর্মকাণ্ড কাঁটার মতো চোখে বিঁধছিল এবং সামগ্রিক অবস্থা শ্বাসরুদ্ধকর হয়ে পড়েছিল। প্রথম জনের মৃত্যু পর্যন্ত আমার লুণ্ঠিত উত্তরাধিকারের জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু সে তা ইবনে খাত্তাবের হাতে তুলে দিয়ে গেল। এরপর আমার দিন উটের পিঠে (অতি দুঃখ-কষ্টে) কাটতে লাগল।...'

'...এটা এক অদ্ভুত ব্যাপার যে, জীবদ্দশায় সে খেলাফত থেকে অব্যাহতি পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু মৃত্যুকালে সে তা অন্য একজনের হাতে তুলে দিয়ে গেল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এরা দু'জনই পরিকল্পিতভাবে একই স্তনের বাঁটগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। এ জন (উমর) খেলাফতকে একটা শক্ত বেষ্টনীর মধ্যে রাখল, যেখানে কথাবার্তা ছিল উদ্ধত এবং স্পর্শ ছিল রূঢ়; অনেক ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল এবং তদ্রূপ ওজরও দেখানো হতো। খেলাফতের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিমাত্রই অবাধ্য উটের সওয়ারের মত হয়ে যেত- লাগাম টেনে ধরলে নাসারন্ধ্র কেটে যায়, আবার টেনে না ধরলে সওয়ার নিক্ষিপ্ত হয়। আল্লাহ্র কসম! ফলত মানুষ বলগাহীনতা, ভিন্নরূপিতা, অদৃঢ়তা ও পথভ্রষ্টতায় জড়িয়ে পড়েছিল।'...- খুতবা শিকশিকিয়া, নাহ্জ আল বালাঘা, পৃ. ১৪-১৫

আলী (আ.)-এর অপেক্ষা দীর্ঘ হতে থাকল। যখন হযরত উমর আহত হলেন তখন একদিন তিনি আলী (আ.)-কে বললেন : 'হে আলী! খেলাফতের জন্য তুমি বড়ই

লোভাতুর!' আলী (আ.) তাঁর এক বক্তৃতায় এ বিষয়কে এভাবে বর্ণনা করেন : "...কেউ একজন আমাকে বলল : হে আবু তালিবের পুত্র! তুমি খেলাফতের জন্য লোভাতুর হয়ে পড়েছ। আমি তাকে বললাম : 'আল্লাহ্‌র কসম, তুমিই বরং অনেক দূরবর্তী হওয়া সত্ত্বেও অধিক লোভাতুর। অপর পক্ষে আমি এর সুযোগ্য ও নিকটবর্তী (অধিকারী)। আমি আমার অধিকার হিসাবে খেলাফত দাবি করছি। অপরপক্ষে আমার ও খেলাফতের মধ্যে তোমরা অবৈধ হস্তক্ষেপ করেছ এবং আমার মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে দিচ্ছ।' যখন আমি অন্যদের সামনে যুক্তি দ্বারা তার শানে আঘাত করলাম, তখন সে চমকে উঠল এবং কী জবাব দেবে তা খুঁজে না পেয়ে যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেল।..." –নাহ্‌জ আল বালাঘা, খুতবা ১৭১, পৃ. ২০০

আলী (আ.) তাঁর লোভাতুর হওয়ার অভিযোগ খণ্ডন করে উল্টো তাদেরকে লোভাতুর সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ আলী (আ.) বুঝিয়ে দিলেন, কেউ নিজের অধিকার দাবি করলে তাকে লোভাতুর বলা যায় না; বরং তাকেই লোভী বলা যায় যে অন্য কারও ন্যায়সঙ্গত অধিকার দিতে অস্বীকার করেছে এবং অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও খেলাফতকে আঁকড়ে ধরে রাখার চেষ্টা করছে। আনসার ও মুহাজিররা যে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিলেন সেটাতেই খেলাফতের প্রতি তাঁদের লোভ প্রকাশিত হয়। আর অন্যদের ব্যাপার তো আছেই।

যদি আলী (আ.)-এর খেলাফতের প্রতি লোভ থাকত তাহলে তিনি আবু সুফিয়ানের প্রস্তাব গ্রহণ করে বিদ্রোহ করতে পারতেন, তৃতীয় খলীফা নির্বাচনের সময় পূর্ববর্তী খলীফাদের অনুসরণ করার ব্যাপারে তাঁকে যে শর্ত দেওয়া হয়েছিল তিনি তা মেনে নিয়ে খেলাফত লাভ করতে পারতেন অথবা হযরত উসমানের মৃত্যুর পর তাঁকে খেলাফত গ্রহণের জন্য অনুরোধ করার সাথে সাথে তিনি তা গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি এর কোনটিই করেন নি।

খেলাফতের জন্য তাঁর দাবির প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল যেন পরবর্তীকালে এর বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়ে না যায় এবং দ্বীন যেন অন্যদের লালসার শিকার না হয়ে পড়ে। খেলাফতের দ্বারা পার্থিব পদমর্যাদা লাভ বা জীবনের আনন্দ ও আরাম-আয়েশ উপভোগের উদ্দেশ্য থাকলেই তাকে লোভ বলা যায় যেটা অন্যদের ক্ষেত্রে ঘটেছে।

মক্কায় কুরাইশদের কারণে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর ইসলামের প্রচার কাজ বাধাগ্রস্ত হয়। এমনকি হিজরতের পর মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরও সর্বক্ষণ নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। দ্বিতীয় হিজরিতেই তাঁকে কাফির-মুশিরিকদের সাথে বদর যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। এরপর তাঁকে একের পর এক ওহুদ, খন্দক ও খায়বরসহ অনেকগুলো ছোট-বড় যুদ্ধে কাফির ও অন্যান্য শক্তির মোকাবিলা করতে হয়েছে। অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের পর দলে দলে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করেছে। মক্কা বিজয়ের পরই হুনায়নের যুদ্ধ ও তায়েফ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। নবম হিজরিতে তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। দশম হিজরিতে বিদায় হজ্ব অনুষ্ঠত হয়। এরপর একাদশ হিজরিতে রাসূল (সা.) ইন্তেকাল করেন। এতসব ঘটনার মধ্যে কতটুকু সময়ই

বা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) স্থিরভাবে ইসলাম প্রচার করতে পেরেছিলেন? এ সময়ের মধ্যে রাসূলের পক্ষে কি সম্ভব ছিল সবাইকে ইসলামের প্রকৃত বিষয়াবলি পুঙ্খানুপুঙ্খ শিক্ষা দেওয়া? এটা কখনই সম্ভব ছিল না। আর এজন্যই তিনি মাত্র এক ব্যক্তিকে বিশেষ শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন যিনি তাঁরই মতো ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালাতে সক্ষম এবং তাঁকেই তিনি নিজের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি একাধারে এর ধর্মীয় ও প্রশাসনিক নেতৃত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পরও একই ধরনের নেতৃত্ব আবশ্যক ছিল। কারণ, জাহেলীয়াতের শত শত বছরের কুসংস্কার ও অপশিক্ষার মোকাবিলায় মাত্র দশ বছরের ইসলামী শাসন কতটুকু ভূমিকা পালন করতে সক্ষম? যাদের ইসলামী জ্ঞান নেই তারা কিভাবে অন্যদেরকে ইসলামের দিকে পরিচালিত করবে?

যেহেতু হযরত আলীর পক্ষেই সম্ভব ছিল মুসলিম উম্মাহকে সঠিক পথে ও ইসলামী রাষ্ট্রকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সেজন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে এ পদে মনোনীত করেছিলেন। আর হযরত আলীও এ কারণে তাঁর অধিকারের দাবি তুলেছিলেন- লোভের বশবর্তী হয়ে নয়।

প্রশ্ন করা হতে পারে যে, শেষ পর্যন্ত যারা ইসলাম সম্পর্কে পুরোপুরি সবকিছু জানতেন না, তাঁরাই শাসনক্ষমতা লাভ করেছিলেন এবং তাঁরা ভালোভাবে মুসলিম উম্মাহকে ও ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন, পৃথিবীর বিস্তৃত অঞ্চল ইসলামী খেলাফতের অধীন হয়েছিল, বিশ্বের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী আজ মুসলমান। আর ইসলাম আজো বিশ্বের বুকে টিকে আছে। তাহলে কেন সে সময়ের শাসনব্যবস্থার সমালোচনা করা হবে?

এর জবাব হল : আজও ইসলাম আছে, পৃথিবীর বিশাল অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ইসলামী বিশ্ব; মুসলিম জনগোষ্ঠী পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ, কিন্তু তারপরও ইসলামের মধ্যে কেন এত বিভক্তি, কেন ইসলামী বিশ্ব আজ পরাশক্তিগুলোর সামনে নতজানু, কেন মুসলমানদের আজ এ দৈন্যদশা? এর কারণ হল মুসলমানদের প্রকৃত ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়া। যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওফাতের পর তাঁর নিযুক্ত ব্যক্তিকে মুসলিম উম্মাহ্র নেতা মেনে নেওয়া হত তাহলে ইসলাম আজ কোন্ অবস্থানে থাকত তা আমরা চিন্তাও করতে পারি না। শুধু স্থানের বিস্তৃতি ও জনসংখ্যার আধিক্য ইসলামের প্রসার বুঝায় না। ইসলামের বিস্তার অর্থ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার। সেটা কতটুকু হয়েছে সেটাই বিবেচ্য।

আমরা যদি ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দেই তাহলে দেখব প্রথম তিন খলীফা ইসলামের বিধানাবলি পুরোপুরিভাবে না জানার কারণে অনেক সময়ই ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছেন; আর আলী (আ.) তাঁদেরকে সে ভুলগুলোর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এ ব্যাপারে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমরের উক্তি প্রসিদ্ধ যে, 'আবুল হাসান না থাকলে উমর ধ্বংস হয়ে যেত।' (ইবনে যাওযী প্রণীত তাযকিরাতুল খাওয়াস, পৃ. ৫৭; ইস্তিয়াব, পৃ. ১৫-২০; এমদাদিয়া লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত আশারা মোবাশ্শারা, পৃ. ১৯৩)

ইসলামের মধ্যে অনেক বিদআত প্রবেশ করে। ইসলামের সাম্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিপরীতে বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যের পরিবর্তে সাম্রাজ্য জয় করাকে মুখ্য বিষয়ে পরিণত করা হয়। এরপর তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানের সময় বায়তুল মালের যথেচ্ছ ব্যবহার হয় এবং খলীফার অযোগ্য ও ফাসেক আত্মীয়-স্বজনকে বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর নিয়োগ করা হয়। খেলাফতের যেটুকু ইসলামী রূপ তখন পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল তাও ধ্বংস হয়ে যায়। এসব কারণে মুসলমানদের মধ্যে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে ওঠে।

এখানে প্রশ্ন করা হতে পারে যে, কেন আলী (আ.) এ অবস্থায় নিশ্চুপ ছিলেন? তিনি নিশ্চুপ ছিলেন বৃহত্তর কল্যাণের কথা ভেবে। যদি তিনি সেদিন নিশ্চুপ না থাকতেন তাহলে আজ আমরা এ প্রশ্ন করারই সুযোগ পেতাম না যে, কেন তিনি নিশ্চুপ ছিলেন? এর অর্থ হল আজ আমরা জানতে পারছি প্রকৃত ইসলাম এমন ছিল না। একে বিকৃত করা হয়েছে। যদি তিনি প্রতিটি বিষয়ে বিরোধিতা করতেন হয়ত তাঁকে হত্যা করা হত। এটা অসম্ভব বলে মনে করার কোন কারণই নেই। ইতিহাসে হযরত ফাতেমার ঘরে আগুন দেওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।– আল মিলাল ওয়ান নিহাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭

আবার এ প্রসঙ্গে হযরত যুবাইয়েরের কথা স্মরণ করা যেতে পারে যিনি ছিলেন আলী (আ.)-এর একজন বড় সমর্থক এবং তাঁর পক্ষে প্রথম তরবারি উত্তোলনকারী। (মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল প্রণীত 'হযরত আবু বকর, পৃ. ৮৩-৮৪, আধুনিক প্রকাশনী সূত্রে ইবনে কুতাইবার গ্রন্থ 'কিতাবুল ইমামাত ওয়াসসীয়াসা) অথচ আলী (আ.)-এর খেলাফতকালে সর্বপ্রথম তাঁর বিরুদ্ধে এই যুবাইরই উটের যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। হযরত আলীকে হত্যা করতে পারলেই এরপর প্রতিটি কথা ও কাজকে ইসলামী বলে চালিয়ে দেওয়া যেত। আমাদের সত্য-মিথ্যা নিয়ে চিন্তার প্রয়োজন হত না, সঠিক পথ বেছে নেওয়ার কথা উঠত না। তাই আমরা বলতে পারি যে, হযরত আলী (আ.) তাঁর প্রজ্ঞার কারণেই নিশ্চুপ ছিলেন।

আলী (আ.) বলেন : 'হে আল্লাহ্! কুরাইশ ও তাদের সাহায্যকারীদের বিরুদ্ধে আমি তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি। তারা আমার আত্মীয়তার অধিকার অস্বীকার করেছে, আমার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছে এবং খেলাফতের ব্যাপারে আমার বিরোধিতার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। অথচ খেলাফত আমার অধিকার।'- নাহ্জ আল বালাঘা, খুতবা ১৭১, পৃ. ২০০

হযরত উমর মৃত্যুর সময় ছয় সদস্যের শুরা (পরামর্শক কমিটি) গঠন করে দিয়ে যান। শুরার ছয়জন সদস্য ছিলেন হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের, হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ। আলী (আ.) এ শুরা সম্পর্কে বলেন : 'এতদসত্ত্বেও কালের দৈর্ঘ্য আর কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে তার মৃত্যু পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করে রইলাম। সে খেলাফতের বিষয়টি একটি দলের হাতে ন্যস্ত করল এবং আমাকেও তাদের একজন মনে করল। হায় আল্লাহ্! এ মনোনয়ন বোর্ড দিয়ে আমি কী করব? তাদের প্রথম জনের তুলনায় আমার শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে কি

কখনও কোন সংশয় ছিল যে, এখন আমাকে এ সকল লোকের সমপর্যায়ের মনে করা হল? কিন্তু তারা শান্ত থাকলে আমিও শান্ত থাকলাম এবং তারা উঁচুতে উড়লে আমিও উঁচুতে উড়তাম। তাদের একজন আমার প্রতি হিংসাপরায়ণতার কারণে আমার বিরোধী হয়ে গেল এবং অপর একজন তার বৈবাহিক আত্মীয়তা ও এটাসেটা নিয়ে আমার বিরুদ্ধে চলে গেল। ফলে (তালহা) এদের তৃতীয়জন বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার সাথে তার পিতামহের সন্তানরা দাঁড়িয়ে গেল এবং এমনভাবে আল্লাহ্‌র সম্পদ গলাধঃকরণ করতে লাগল যেভাবে বসন্তের ক্ষুধার্ত উট গোগ্রাসে গিলতে থাকে । তার ক্রিয়াকলাপ তাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে গেল এবং তার অতিভোজন তাকে অবনত করল।'- নাহ্‌জ আল বালাঘা, খুতবা ৩, শিকশিকিয়াব খুতবা, পৃ. ১৪

যখন পরামর্শক কমিটি হযরত উসমানের হাতে বাইয়াত গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় তখন তিনি বলেছিলেন : 'নিশ্চয়ই তোমরা জেনেছ যে, খেলাফতের জন্য অন্য সকলের চেয়ে আমার অধিকার বেশি। আল্লাহ্‌র কসম! যতদিন পর্যন্ত মুসলিমদের বিষয়াষয় সঠিকভাবে চলবে এবং আমি ব্যতীত অন্যদের ওপর কোন অত্যাচার থাকবে না ততদিন আমি আল্লাহ্‌র কাছে পুরস্কারপ্রার্থী হয়ে নিশ্চুপ থাকব এবং খেলাফতের সকল আকর্ষণ ও প্রলোভন হতে নিজেকে সরিয়ে রাখব যা তোমরা আকুলভাবে বাসনা কর।'– নাহ্‌জ আল বালাঘা, খুতবা ৭৩, পৃ. ৮৮

আলী (আ.) তাঁর পূর্ববর্তী তিন খলীফার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তিনি বিভিন্ন সময়ে তাঁর এ অসন্তুষ্টির বিষয় প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর অধিকার কেড়ে নেওয়ার ব্যাপারে তাঁদেরকে দোষারোপও করেছেন। তবে তিনি তাঁদের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন পরিচালনা করেন নি বা বিদ্রোহও করেন নি। প্রকৃতপক্ষে খেলাফতের দাবিতে সোচ্চার হওয়ার মতো কোন ক্ষেত্রই তখন ছিল না। আর এটি স্বতঃসিদ্ধ যে, যদি কোন কাজ করার ক্ষেত্র না থাকে তাহলে ঐ কাজ করতে গেলে কখনই কাঙ্ক্ষিত সফলতা পাওয়া যাবে না। এমনকি এতে বিপরীত ফলও হতে পারে। আমরা যদি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর জীবনের দিকে লক্ষ্য করি তাহলেও দেখব কীভাবে তিনি পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) দীর্ঘ ২৩ বছর ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যে ১৩ বছর মক্কায় ও ১০ বছর মদীনায়। মক্কায় ১৩ বছরের নবুওয়াতী জীবনে তিনি কাফিরদের কঠোর নির্যাতন সহ্য করেছেন। মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক লোক তখন ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল। শত্রুর সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার মত লোকবল তখন রাসূলের ছিল না। আর এ অবস্থায় লোকদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ধারণা দেওয়াটিই মূল বিষয় ছিল। মহান আল্লাহ্‌র পরিচিতি লাভ এবং জাহেলীয়াতের পঙ্কিলতাকে কাটিয়ে সবাইকে মানুষ হিসাবে গড়ে তোলাই ছিল প্রধান দায়িত্ব।

ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি মক্কায় তের বছর নির্যাতন সহ্য করেছেন। কিন্তু শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র জেহাদে লিপ্ত হননি। আবার ইসলামকে পৃথিবীতে টিকিয়ে রাখবার জন্য এর পথে প্রতিবন্ধকতা অপসারণের জন্য সামর্থ্য অর্জিত হওয়ার পর যুদ্ধে অবতীর্ণ

হয়েছেন। যদি মক্কার জীবনে যখন টিকে থাকার মত সামর্থ্য অর্জিত হয়নি তখন তিনি কাফির-মুশরিকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতেন তাহলে পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতো না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল সময়োপযোগী। আর সেজন্যই তিনি পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্র ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে যেতে পেরেছেন। তাই বলা যায়, ক্ষেত্র প্রস্তুত হবার পরই কেবল কাজ এগিয়ে নেওয়া যায়।

আলী (আ.) তাঁর ভাষণগুলোতে যেভাবে তাঁর অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন, তেমনি তাঁর নীরবতার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন। রাসূলের ওফাত থেকে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানের মৃত্যুবরণ পর্যন্ত সমস্ত পরিস্থিতি আলী (আ.) খেলাফত দাবির প্রতিকূলে ছিল। আর এটাই হল প্রথম তিন খলীফার সাথে তাঁর নীরব থাকার কারণ। তবে যখনই তাঁর নিকট থেকে কোন পরামর্শ চাওয়া হয়েছে তিনি তাঁদেরকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন এবং একটি খুতবায় তিনি এ বিষয়টি উল্লেখও করেছেন যে, 'তোমাদের শাসনকর্তা হওয়ার চেয়ে আমি তোমাদের পরামর্শদাতা হব। এটাই তোমাদের জন্য ভালো হবে।' –নাহ্জ আল বালাঘা, খুতবা ৯১, পৃ. ১১৪

এবার দ্বিতীয় বিষয়ের আলোচনায় প্রবেশ করতে চাই।

রাসূলের ওফাতের পঁচিশ বছর পর হযরত উসমানের নিহত হবার মাধ্যমে আলী (আ.)-এর খলীফা হবার পথ উন্মুক্ত হয়। কিন্তু তখন আলী (আ.) খেলাফত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এখন প্রশ্ন হল হযরত উসমান নিহত হবার পর যখন তাঁর সামনে আর কোন বাধাই ছিল না তখন কেন তিনি খেলাফত গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন? এখনও কি ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় নি? যে জনবলের স্বল্পতার কথা আমরা বলেছিলাম এখন তো সেই জনবল তাঁর পক্ষে কথা বলছে, তারা তাঁকে খেলাফতে দেখতে চাচ্ছে, তাঁকে সব ধরনের সহযোগিতা দিতে চাচ্ছে। তবে কেন তিনি খেলাফত হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন?

এক্ষেত্রে কেন মুসলমানরা আলী (আ.)-কে তাদের নেতা বলে মেনে নিতে চাইছে এ বিষয়টি আলোচনা করা প্রয়োজন। তারা হযরত আবু বকরের খেলাফতের খুব সংক্ষিপ্ত সময় পেয়েছিল। এ সময়ে আলী (আ.)-এর অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিষয়টি তারা জানত, কিন্তু তারা এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করে নি। কারণ, তারা হযরত আবু বকরের সাথে হযরত আলীর পার্থক্য করে নি; বরং ইসলামে তাঁর অবদানই তাঁকে অপছন্দ করার বিষয়ে পরিণত হয়। কুরাইশদের বড় বড় নেতা যেহেতু হযরত আলীর হাতে নিহত হয়েছিল সেজন্য কুরাইশরা আলীকে সহ্য করতে পারত না। মুমীন আলীর চেয়ে কাফির উতবা, শাইবাহ, আবু জেহেলরা কুরাইশদের কাছে প্রিয় পাত্র ছিল।

হযরত আবু বকর বনু উমাইয়্যাকে সিরিয়ায় (শাম) শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত করেন। এরপর হযরত উমরের শাসনামলে আমীরে মুয়াবিয়া একনাগারে ছয় বছর শামের গভর্নর হিসাবে বহাল থাকায় সামরিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই শক্তিশালী হবার সুযোগ পায়। এরপর হযরত উসমানের সময়ের প্রথম কয়েকটি বছর মোটামুটি কেটে যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। একচেটিয়াভাবে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র

উমাইয়্যা রাজত্ব কায়েম হয়। অযোগ্য শাসনকর্তাদের কেউ কেউ ধর্মীয় ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে ছিল, এমনকি অনেকে মদপান, ব্যভিচার প্রভৃতি অনৈতিক বিষয়ের সাথে জড়িত ছিল। এ গভর্নররা বাইতুল মালকে অবৈধভাবে ব্যবহার করতে থাকে। পরিশেষে উমাইয়্যাদের অত্যাচারে অতীষ্ট হয়ে বিভিন্ন প্রদেশের লোকজন বিদ্রোহ করে। উমাইয়্যাদের কারণেই হযরত উসমান নিহত হন।

হযরত উসমানের হত্যাকাণ্ডের পর বিশৃঙ্খল অবস্থায় কেউ শাসনক্ষমতা গ্রহণ করতে চাচ্ছিল না। যারা খেলাফতের জন্য লালায়িত ছিল তারাও ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায়। মানুষ নিজেদের জীবন সম্পর্কে, তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ও নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। যখন চারদিকে আতংক ছড়িয়ে পড়েছিল এবং পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য আর কোন পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না তখন বাধ্য হয়ে সকলে আলী (আ.)-এর শরণাপন্ন হয়। তারা আলী (আ.) ছাড়া আর কাউকে কল্পনাই করতে পারছিল না। কিন্তু আলী (আ.) জানতেন যে, তারা নিরুপায় হয়ে তাঁর কাছে এসেছে। তাঁর শাসনব্যবস্থা তাদের জন্য কঠিন হয়ে যাবে বলে তিনি তাদেরকে সাবধান করে দেন। তিনি বলেন : 'আমরা একটা বিষয়ের মুখোমুখি হচ্ছি যার বিবিধ দিক ও রং রয়েছে যা হৃদয় সহ্য করতে পারে না। আকাশে মেঘ ভাসছে এবং সঠিক পথ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। তোমাদের জানা দরকার যে, যদি আমি তোমাদের কথায় সাড়া দেই তবে আমি যা জানি সেভাবেই তোমাদের পরিচালনা করব এবং অন্যে কী বলবে বা দোষারোপকারীর নিন্দার পরোয়া আমি করব না। যদি তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও তবে আমি তোমাদের একজনের মতোই হব। তোমাদের কর্মকাণ্ডের ভার অন্য কাউকে দিলে আমিও তাকে মেনে চলব এবং তার কথা শ্রবণ করব। আমি তোমাদের প্রধান হওয়া অপেক্ষা উপদেষ্টা হওয়াকে অধিকতর ভালো মনে করি।'–নাহ্জ আল বালাঘা, খুতবা ৯১, পৃ. ১১৪

ইবনে আবিল হাদীদ এ বিষয়কে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : 'তিনি এ ভাষণের মাধ্যমে মুসলমানদের এ কথা বুঝাতে চান যে, 'যদি তোমরা তোমাদের দুনিয়াদারির স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আমাকে চাও তবে জেনে রাখ, আমি তোমাদের যন্ত্রের মতো কাজ করতে প্রস্তুত নই। তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে মনোনীত কর যে তোমাদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে। যদি অন্য কাউকে মনোনীত কর তবে আমি তা মেনে নেব। তোমরা আমার অতীত জীবন দেখেছ। আমি পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়া আর কিছু অনুসরণ করতে প্রস্তুত নই। যদি তোমরা আমাকে মনোনীত না কর, তবে তোমাদের দুনিয়াদারির জন্য ভালো হবে। কারণ, আমার হাতে ক্ষমতা না থাকলে আমি তোমাদের দুনিয়ামুখী কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারব না। যদি আমার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে সংকল্প করে থাক তাহলে মনে রেখ, তোমরা আমার প্রতি বিরাগ দেখাও, আর আমার বিরুদ্ধে সমালোচনা কর, আমি তার তোয়াক্কা না করে তোমাদের ন্যায়পথে পরিচালিত করতে প্রয়োজনে বল প্রয়োগ করব। ন্যায়ের ব্যাপারে কোন কিছুর সাথে আমার আপোষ

নেই।' তবু লোকজন তাঁকে খেলাফত গ্রহণের জন্য পুনঃপুন অনুরোধ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তিনি খেলাফত গ্রহণ করেন।

তিনি তাঁর খেলাফত গ্রহণের অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে : 'সে সময় আমার দিকে জনতার দ্রুত আগমন ছাড়া আর কোন কিছু আমাকে বিস্মিত করে নি। চতুর্দিক হতে হায়নার কেশরের মতো এত অধিক সংখ্যক জনতা এগিয়ে আসল যে, হাসান ও হুসাইন পদদলিত হবার অবস্থায় পড়েছিল এবং আমর উভয় কাঁধের কাপড় ছিঁড়ে গিয়েছিল। ভেড়া ও ছাগলের পালের মতো তারা আমার চারদিকে জড়ো হয়েছিল।'- নাহ্জ আল বালাঘা, খুতবা : ৩, পৃ. ১৪

আরেকটি খুতবায় তিনি বলেছেন : 'আমার বাইয়াত গ্রহণের জন্য তোমরা আমার হাত তোমাদের দিকে টেনে নিয়েছিলে, কিন্তু আমি হাত ফিরিয়ে নিয়েছি। আবার তোমরা আমার হাত টেনে ধরে রেখেছিলে, কিন্তু আমি জোর করেছিলাম। তৎপর তৃষ্ণার্ত উট যেভাবে জলাধারে ভিড় করে তোমরাও সেভাবে আমার চারদিকে ভিড় করে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছিলে যে, আমার জুতা ছিঁড়ে গিয়েছিল, কাঁধের কাপড় পড়ে গিয়েছিল এবং দুর্বলরা পদদলিত হয়েছিল। আমার বাইয়াত গ্রহণ করে মানুষ এত বেশি উল্লসিত হয়েছিল যে, শিশু-কিশোররা নাচতে শুরু করেছিল। বৃদ্ধরা কাঁপতে কাঁপতে (বার্ধ্যেকের কারণে) আমার কাছে চলে এসেছিল, রুগ্নরা এলোপাথারিভাবে, আর কিশোরীরা মাথায় ঘোমটা ফেলে আমার দিকে ছুটে এসেছিল।'- নাহ্জ আল বালাঘা, খুতবা : ২২৭, পৃ. ২৮৯

আলী (আ.) তাঁর খেলাফত গ্রহণের কারণও বর্ণনা করছেন : 'যিনি শস্যকণা ভেঙ্গে চারা গজান ও জীবিত সত্তা সৃষ্টি করেন তাঁর কসম করে বলছি, যদি মানুষ আমার কাছে না আসত এবং সমর্থনকারীরা যুক্তি নিঃশেষ না করত এবং জ্ঞানীদের সঙ্গে এ মর্মে আল্লাহ্র কোন অঙ্গীকার না থাকত যে, জালিমের অতিভোজন আর মজলুমের ক্ষুধায় তারা মৌন সম্মতিও দিতে পারবে না, তাহলে আমি খেলাফতের রশি তার নিজের কাঁধের ওপর নিক্ষেপ করতাম এবং শেষজনকে প্রথম জনের পেয়ালা দ্বারা পানি পান করাতাম। তখন তোমরা দেখতে পেতে যে, তোমাদের এ দুনিয়া আমার মতে ছাগলের হাঁচির চেয়েও নিকৃষ্টতর।'- নাহ্জ আল বালাঘা, খুতবা : ৩, শিকশিকিয়ার খুতবা, পৃ. ১৫

আলী (আ.) আল্লাহ্র পরিত্যক্ত আদেশাবলি প্রতিষ্ঠা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি যখন সংস্কারের কাজে হাত দেন তখনই জনগণের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে শুরু করে।

মুসলিম জনগণ দীর্ঘ পঁচিশ বছরে যে জীবন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল তার সাথে আলী (আ.)-এর শাসনব্যবস্থায় পার্থক্য দেখা দেওয়ায় তারা হতাশ হয়ে পড়ে। যেহেতু জনগণ, সেনাবাহিনী, সরকারী কর্মচারীরা পূর্ববর্তী শাসকদের বিশ্বাস ও কর্ম দ্বারা প্রভাবিত ছিল তাই সেগুলোর বিপরীত কিছু দেখলেই বা তাদের পছন্দের বিপরীত কিছু

ঘটলেই তারা ক্রোধ প্রকাশ করত, ভ্রূকুটি করত, যুদ্ধ এড়িয়ে চলত, এমনকি বিদ্রোহ করতেও প্রস্তুত হতো।

ইবনে আবিল হাদীদ লিখেছেন : 'আমীরুল মুমিনীনের খেলাফত কালের ঘটনাপ্রবাহ মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, তাঁকে কোণঠাসা করা হয়েছিল। কারণ, তাঁর মর্যাদা জানার মতো লোক ছিল মুষ্টিমেয় এবং মৌমাছির ঝাঁকের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক মনে করত যে, তাঁকে মান্য করা বা তাঁর সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা বাধ্যতামূলক নয়। তারা পূর্ববর্তী খলীফাদের কথা ও কাজকে তাঁর কথা ও কাজের ওপরে স্থান দিত এবং তারা মনে করত তাঁর সকল কাজে পূর্ববর্তী খলীফাদের অনুসরণ করা উচিত। তারা এমনও বলেছিল যে, পূর্ববর্তী খলীফাদের নিয়মনীতি অনুসরণ না করলে তারা আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ ত্যাগ করবে। এসব লোক আমীরুল মুমিনীনকে একজন সাধারণ নাগরিক মনে করত। যারা তাঁর সাথি হয়ে যুদ্ধ করেছে তাদের অধিকাংশই সম্মানের খাতিরে অথবা আরবদের গোত্রনীতি অনুসরণ করে যুদ্ধ করেছে। তারা দীন বা ঈমানের খাতিরে যুদ্ধ করেনি।'

যারা যে সুবিধা লাভের জন্য আলী (আ.)-কে খলীফা বলে মেনে নেয় তাদের সেই সুবিধা না পাওয়ায় তারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। প্রথমেই আসে হযরত তালহা ও হযরত যুবাইরের নাম। যাঁরা আলী (আ.)-এর কাছে যথাক্রমে বসরা ও কুফার গভর্নরের পদ আশা করে বিফল হন। (বেলায়াতের দ্যুতি, পৃ. ৩৭৫ সূত্রে তারীখে খুলাফা, মিসর থেকে মুদ্রিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯) অন্যদিকে তাঁদেরকে প্রদত্ত বৈষম্যমূলক ভাতাব্যবস্থা বাতিল করার পর তাঁরা ক্ষুব্ধ হন। তাঁরা হযরত উসমানের হত্যাকাণ্ডের বিচারের দোহাই দিয়ে সর্বপ্রথম হযরত আলীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। বিপুল সংখ্যক সৈন্য তাঁরা সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। আর তাঁদের সাথে যোগ দেন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা। আলী (আ.)-এর বিপক্ষে সৈন্য যোগাড় করতে তাঁদেরকে বেগ পেতে হয় নি, কিন্তু আলী (আ.)-কে সৈন্য যোগাড় করতে বেগ পেতে হয়। জামাল, সিফফিন, নাহরাওয়ান প্রতিটি যুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে একই অবস্থা দেখা দেয়। আবার যে সৈন্য তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তারা তাঁর কথা মানতে চাইত না, যুদ্ধে অনীহা প্রকাশ করত। আলী (আ.) যে কারণে খেলাফত নিতে চাচ্ছিলেন না, তিনি জনগণ সম্পর্কে যে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন জনগণ ধীরে ধীরে সেই অবস্থার দিকে যেতে থাকে। আলী (আ.)-এর শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা যেন উন্মুখ হয়ে ওঠে। তাদের আচরণে ও কথায় তারা এ বিষয়টি বুঝিয়ে দেয়।

আলী (আ.) ন্যায়ের পক্ষাবলম্বন এবং জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য মুসলমানদের উদ্বুদ্ধকরণের চেষ্টা করতে থাকেন। তিনি বলেন : 'আমি তোমাদের যুদ্ধ দেখেছি এবং দেখেছি সারি থেকে তোমাদের সরে পড়া। তোমরা চারিদিক থেকে সিরিয়ার রূঢ় ও নীচ বেদুইন দ্বারা ঘেরাও হয়ে পড়েছিলে, অথচ তোমরা আরবদের প্রধান ও বিশিষ্টতার চূড়ায় এবং এমন মর্যাদার অধিকারী যেন উঁচু নাক ও বিরাট কুঁজওয়ালা উট। আমার বুকের

দীর্ঘশ্বাস প্রশমিত হতো যদি আমি একটি বারের জন্য দেখতে পেতাম যে, তোমরা তাদের ঘেরাও করে রেখেছ, যেভাবে তারা তোমাদের ঘেরাও করেছে; তোমরা তাদেরকে অবস্থানচ্যুত করেছ, যেভাবে তারা তোমাদের করেছে; তীর দ্বারা তাদেরকে হত্যা করেছ এবং বর্শা দ্বারা তাদের আঘাত করেছ, যাতে তাদের অগ্রবর্তী সারি পশ্চাতের সারির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে যেমন করে তৃষ্ণার্ত উট পানি দেখলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।'- নাহ্জ আল বালাঘা, খুতবা : ১০৬, পৃ. ১২৮

অপর এক খুতবায় তিনি বলেন : 'রাসূলের আহলে বাইতের দিকে তাকিয়ে দেখ। তাদের নির্দেশ মেনে চলো। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। কারণ, তারা কখনও তোমাদেরকে হেদায়াতের পথ ছাড়া অন্যদিকে নিয়ে যাবে না এবং কখনও তোমাদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে না। যদি তারা বসে, তোমরাও বসে পড় এবং যদি তারা দাঁড়ায়, তোমরাও দাঁড়িয়ে যেও। তাদের পুরোগামী হয়ো না, তাতে তোমরা বিপথগামী হয়ে যাবে এবং তাদের থেকে পিছিয়ে পড় না, তাতে তোমারা ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'আমি রাসূলের সাহাবীদের দেখেছি, কিন্তু তোমাদের মাঝে তাঁদের মতো কাউকে দেখি না। তাঁদের দিন শুরু হতো চুল ও মুখে ধুলো-বালি নিয়ে (অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে) এবং তাঁরা রাত কাটাতেন সেজদায় ও দাঁড়ানো অবস্থায় ইবাদাতে। কখনও কপাল এবং কখনও গাল তাঁরা মাটিতে রাখতেন। মনে হতো কেয়ামতের কথা চিন্তা করে তাঁরা যেন জ্বলন্ত কয়লার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। দীর্ঘক্ষণ সেজদায় পড়ে থাকায় তাঁদের কপালের মাঝখানে ছাগলের হাঁটুর মতো কালো দাগ পড়ে গেছে। যখন আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হতো তখন তাঁদের চোখ দিয়ে এত অশ্রু ঝরত যে, তাঁদের জামার কলার ভিজে যেত। শাস্তির ভয়ে ও পুরস্কারের আশায় তাঁরা এমনভাবে কাঁপতেন যেমন ঝড়ো হাওয়ায় বৃক্ষ কাঁপে।'-নাহ্জ আল বালাঘা, খুতবা : ৯৬, পৃ. ১১৯

এমনকি আলী (আ.) জনগণকে পরকালীন মুক্তির নিশ্চয়তাও দেন। তিনি বলেন : 'আমার জীবনের কসম! যারা ন্যায়ের বিরোধিতা করে অথবা বিপথে হাতড়ে বেড়ায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমার কোন শিথিলতা নেই এবং তাদের প্রতি আমার সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধও নেই। হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর; তার রোষে পতিত হওয়া থেকে দূরে থাক এবং তার করুণা যাচনা কর। তিনি তোমাদের যে সকল নির্দেশ দিয়েছেন সে পথে চল এবং যা তোমাদের আদেশ করেছেন তাতে দৃঢ়ভাবে অবস্থান কর। যদি তোমরা সেভাবে চল তবে এ আলী তোমাদের মুক্তির নিশ্চয়তা দিচ্ছে; হতে পারে ইহজগতে তোমরা তা নাও পেতে পার, কিন্তু পরকালের চিরস্থায়ী সুখ অবধারিত।'-নাহ্জ আল বালাঘা, খুতবা ২৪, পৃ. ৪৭

আরেকটি খুতবায় তিনি বলেন : '...তোমাদের সংখ্যাধিক্য দ্বারা কোন লাভ নেই। কারণ, তোমাদের হৃদয়ে ঐক্যের অভাব। আমি তোমাদের স্বচ্ছ পথেই রেখেছি যেখানে তোমাদের কেউ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না, কেবল যে নিজেকে ধ্বংস করে সে ছাড়া। যে ব্যক্তি

এ পথে লেগে থাকবে সে বেহেশত লাভ করবে এবং যে এ পথ থেকে সরে যাবে সে দোযখে যাবে।'- নাহ্জ আল বালাঘা, খুতবা ১১৮, পৃ. ১১৮

এরপরও তারা তাঁর কথায় সাড়া দিল না। আলী (আ.) বারবার জিহাদের আহ্বান জানানো সত্ত্বেও যখন তাঁর আহ্বানে মুসলমানরা সাড়া দিত না তখন তিনি অনেকগুলো ভাষণে তাদেরকে তিরস্কার করেন। তিনি বলেন : 'আমি এমন সব লোক নিয়ে আছি যারা আমার আদেশ অমান্য করে এবং আমার ডাকে সাড়া দেয় না। তোমরা পিতৃবিহীন হও (তোমাদের ওপর লানত)। আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়াতে কিসে তোমাদের বিলম্বিত করছে? তোমাদের দীন কি তোমাদের একত্র করবে না?

তোমাদের লজ্জাবোধ কি তোমাদের উত্তোলিত করবে না? আমি তোমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে সাহায্যের আহ্বান করছি, কিন্তু তোমারা আমার কথা শুনছ না এবং অবস্থা বেগতিক না হলে তোমরা আমার আদেশ মান্য করছ না। তোমাদের দ্বারা কোন রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করা যায় না এবং কোন উদ্দেশ্য সাধন করা যায় না। তোমাদের ভাইদের সাহায্য করার জন্য আমি আহ্বান করেছিলাম; কিন্তু তোমরা পেটের ব্যথায় কাতর উটের মতো গোঙ্গাতে লাগলে এবং পাছা-মরা উটের মতো দুর্বল হয়ে পড়লে। তারপর তোমাদের মধ্য থেকে কম্পমান-দুর্বল একদল সৈন্য আমার কাছে এল, যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে তাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং তারা যেন মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করছে।' (কুরআন ৮ : ৬)- নাহ্জ আল বালাঘা, খুতবা : ৩৯, পৃ. ৬৬

আলী (আ.) অন্য একটি খুতবায় বলেন : 'আমি তোমাদের জিহাদে আহ্বান করেছিলাম, কিন্তু তোমরা এলে না। আমি তোমাদের সতর্ক করেছিলাম, কিন্তু তোমরা শুনলে না। আমি তোমাদের গোপনে ও প্রকাশ্যে আহ্বান করেছিলাম, কিন্তু তোমরা সাড়া দিলে না। আমি তোমাদের আন্তরিক উপদেশ দিয়ছিলাম, কিন্তু তোমরা তা গ্রহণ করলে না। তোমরা কি উপস্থিত থেকেও অনুপস্থিত এবং স্বাধীন হয়েও ক্রীতদাস? আমি তোমাদের সম্মুখে প্রজ্ঞার কথা বলি, কিন্তু তোমরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। আমি তোমাদের সুদূরপ্রসারী উপদেশ দেই, কিন্তু তোমরা তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও। বিদ্রোহী লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য আমি তোমাদের উদ্বুদ্ধ করি, কিন্তু আমার বক্তব্য শেষ হবার আগেই সাবার পুত্রদের মতো তোমরা সরে পড়। তোমরা তোমাদের জায়গায় ফিরে গিয়ে একে অপরকে পরামর্শ দ্বারা প্রতারণা কর। বাঁকা হয়ে আমার কাছে আস। আমি তোমাদের সোজা করতে গিয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি, আর তোমরাও অশোধনীয় হয়ে পড়েছ।'

'হে সেসব লোক! যাদের দেহ এখানে উপস্থিত, কিন্তু মন অনুপস্থিত ও যাদের আকাঙ্ক্ষা বিক্ষিপ্ত, তোমরা শোন, তাদের শাসকগণ ফেতনা-ফ্যাসাদে লিপ্ত, আর তোমাদের নেতা আল্লাহ্র অনুগত, কিন্তু তোমরা তার অবাধ্য। অপরপক্ষে সিরিয়দের নেতা আল্লাহ্র অবাধ্য, কিন্তু তারা নেতার অনুগত। আল্লাহ্র কসম! দিনারের সাথে দেরহাম বিনিময়ের মতো মুয়াবিয়া যদি তোমাদের দশ জনকে নিয়ে বিনিময়ে তার একজন আমাকে দিত

আমি তাতেই সন্তুষ্ট হতাম। হে কুফাবাসী! তোমাদের কাছ থেকে আমি পাঁচটি জিনিসের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। এগুলো হল : কান থাকা সত্ত্বেও তোমরা বধির, কথা বলার শক্তি থাকা সত্ত্বেও তোমরা বোবা, চোখ থাকা সত্ত্বেও তোমরা অন্ধ, যুদ্ধে তোমরা খাঁটি সমর্থক নও এবং বিপদে তোমরা নির্ভরযোগ্য ভ্রাতা নও।'... নাহ্জ আল বালাঘা, খুতবা : ৯৬, পৃ. ১১৯

আরেকটি ভাষণে তিনি বলেন : 'তোমাদের ওপর আল্লাহর রহমতের কারণে তোমরা এমন এক মর্যাদা লাভ করেছ যাতে তোমাদের ক্রীতাদাসেরা আজ সম্মান পাচ্ছে এবং তোমাদের প্রতিবেশীরা ভালো ব্যবহার পাচ্ছে। এমনকি যার সঙ্গে তোমাদের কোন পার্থক্য নেই বা যারা তোমাদের কাছে ঋণী নয় তারাও তোমাদের সম্মান করে। ওই সকল লোকও আজ তোমাদের ভয় করে তোমাদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশংকা যাদের নেই বা যাদের ওপর তোমাদের কোন কর্তৃত্ব নেই। তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছ যে, আল্লাহর প্রতি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হচ্ছে, কিন্তু তোমরা তাতে ক্ষুব্ধ হচ্ছ না, যদিও তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য ভাঙ্গতে গেলে তোমরা ক্রোধে অস্থির হয়ে পড়তে। আল্লাহর আহকাম তোমাদের নিকট আসছে ও চলে যাচ্ছে এবং আবার তোমাদের নিকট ফিরে আসছে, কিন্তু তোমারা তোমাদের স্থান অন্যায়কারীদের কাছে হস্তান্তর করে দিয়েছ, তোমাদের দায়িত্ব তাদের দিকে নিক্ষেপ করেছ এবং আল্লাহর আহকামকে তাদের হাতে তুলে দিয়েছ। তারা সংশয়ে আমল করে এবং আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে পদচারণা করে। আল্লাহর কসম, যদি তারা তোমাদেরকে বিভিন্ন নক্ষত্রেও ছড়িয়ে দেয় তবুও আল্লাহ নির্দিষ্ট দিনে তোমাদেরকে একত্রিত করবেন যে দিনটি তাদের জন্য নিকৃষ্টতম হবে।'- নাহ্জ আল বালাঘা, খুতবা : ১০৫, পৃ. ১২৭

অনুচরদের অসর্তক আচরণ সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে আমীরুল মুমিনীন বলেন : 'আর কতকাল আমি তোমাদের ইচ্ছা ও অনুভূতির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে চলব? আমি তোমাদের ইচ্ছার সঙ্গে সেভাবেই খাপ খাইয়ে নিয়েছি যেভাবে মানুষ ফাঁপা কুঁজসম্পন্ন উট অথবা এদিক সেলাই করলে ওদিক বেরিয়ে পড়ে এমন ছেড়া কাপড়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। যখন শামের (সিরিয়ার) একটি ছোট বাহিনী তোমাদের ধারে কাছে ঘোরাফেরা করছিল তখন তোমরা ঘরের দরজা বন্ধ করে এমনভাবে লুকিয়ে পড়েছিলে যেন গিরগিটি অথবা ব্যাজার তার গর্তে লুকিয়ে পড়েছে। আল্লাহ্র কসম! তোমাদের মতো মানুষকে সমর্থন করলে অপদস্থ হওয়া অনিবার্য এবং তোমাদের সমর্থন নিয়ে তীর ছোঁড়া মানেই হল মাথা ও লেজ ভাঙ্গা তীর নিক্ষেপ করা। আল্লাহ্র কসম! ঘরের আঙ্গিনায় তোমরা সংখ্যায় অনেক, কিন্তু ব্যানারের নিচে তোমরা মুষ্টিমেয় কয়েক জন। নিশ্চয়ই আমি জানি কিসে তোমাদের আচরণের উন্নতি হবে এবং কী করে তোমাদের বক্রতা সোজা করতে হবে। কিন্তু আমি নিজেকে বরবাদ করে তোমাদের উন্নতি বিধান করব না। আল্লাহ্ তোমাদের অসম্মানিত ও ধ্বংস করতে পারেন। তোমরা অন্যায়কে যতটুকু বোঝ, ন্যায়কে ততটুকু বোঝ না এবং ন্যায়কে ধ্বংস করার জন্য যতটুকু প্রবৃত্ত

হও, অন্যায়কে ধ্বংস করার জন্য ততটুকু হও না।'- নাহ্জ আল বালাঘা, খুতবা ৬৮, পৃ. ৮৫

জিহাদের সময় যারা মিথ্যা ওজর দেখিয়েছিল তাদের সম্বন্ধে তিনি বলেন : 'হে লোকসকল! তোমরা শারীরিকভাবে ঐক্য দেখালেও তোমাদের মন-মানস ও কামনা বিবিধমুখি। তোমাদের কথায় কঠিন পাথর গলে যায় এবং তোমাদের কার্যকলাপ দেখে শত্রুপক্ষ প্রলুব্ধ হয়। তোমরা বসে বসে বাগাড়ম্বর কর, এটা করবে, ওটা করবে; অথচ যুদ্ধ আরম্ভ হলেই নিরাপদ দূরত্বে শটকে পড়। কেউ সাহায্যের জন্য আহ্বান করলে তোমরা কর্ণপাত কর না। তোমাদের সাথে কঠোর আচরণ করেও কোন লাভ হয় না। তোমরা এমন সব ভ্রান্ত ওজর দাঁড় করাও যেন খাতক তার ঋণ পরিশোধ করতে চায় না। অপদস্ত লোক কখনও নির্যাতন প্রতিহত করতে পারে না। কঠোর প্রচেষ্টা ছাড়া সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। এ ঘর ছাড়া আর কোন্টি তোমরা রক্ষা করবে? আমার পরে কোন্ ইমামের নেতৃত্বে তোমরা যুদ্ধ করবে?'

'আল্লাহর কসম! তোমরা আমাকে প্রতারণা করতে গিয়ে নিজেরাই প্রতারিত হচ্ছ এবং সেও তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হবে যে যুদ্ধক্ষেত্রে অকেজো তীর কুড়িয়ে জড়ো করে। তোমরা হলে শত্রুর ওপর নিক্ষিপ্ত ভাঙ্গা তীরের মতো। আল্লাহর কসম! বর্তমানে আমার অবস্থা এমন হয়েছে যে, আমি না পারি তোমাদের অভিমত গ্রহণ করতে, না পারি তোমাদের সাহায্য বা সমর্থনের আশা করতে, আর না পারি তোমাদের নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে। তোমাদের হয়েছেটা কী, শুনি? তোমরা কি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছ? তোমাদের রোগ নিরাময়ের উপায় কি? বিরুদ্ধপক্ষও তোমাদের মতোই মানুষ, কিন্তু বৈশিষ্ট্যে তারা তোমাদের চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির। তোমরা কি কাজের চেয়ে কথাই বেশি বলতে থাকবে? পরহেজগারী ছেড়ে গাফেল হয়ে থাকবে? তোমরা কি (ন্যায়ের পথে) কাজ না করার প্রতি আসক্ত হয়েই থাকবে?'- নাহ্জ আল বালাঘা, খুতবা ২৯, পৃ. ৫২

তিনি তাদেরকে তিরস্কার করতে থাকেন, আর জনগণও তাঁর নির্দেশ অমান্য করতে থাকে। তাই তিনি এক ভাষণে বলেন : 'দুর্ভাগ্য তোমাদের! তোমাদের তিরস্কার করতে করতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে ইহকালের জীবনেকেই অধিক পছন্দ করে বসেছ? তোমরা কি মর্যাদাকর অবস্থার স্থলে অমর্যাদাকর অবস্থাকে অধিক ভালবেসেছ? শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যখন আমি তোমাদের আহ্বান করি, তখন তোমরা এমনভাবে চোখ ছানাবড়া কর মনে হয় যমদূতকে

দেখেছ এবং মুমূর্ষু লোকের মত সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়।...'

'...আল্লাহ্র কসম! যুদ্ধানল প্রজ্বলনের জন্য তোমরা বড়ই মন্দ লোক! তোমরা গুপ্ত চক্রান্তের শিকার হচ্ছ, কিন্তু শত্রুকে তোমাদের শিকার করতে পারছ না। তোমাদের এলাকার সীমানা ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছে, অথচ তোমরা তাতে ক্রুদ্ধ হচ্ছ না। তোমাদের বিরুদ্ধ পক্ষের চোখে ঘুম নেই, অথচ তোমরা অমনোযোগী।...'

'...আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের অবস্থা দেখে আমার এ বিশ্বাস জন্মেছে যে, যদি যুদ্ধ বাধে এবং তোমরা তোমাদের চারদিকে মৃত লাশ দেখ, তবে তোমরা আবি তালিবের পুত্রকে ধড় থেকে দ্বিখণ্ডিত মস্তকের মতো পরিত্যাগ করে কেটে পড়বে।'... নাহ্‌জ আল বালাঘা, খুতবা : ৩৪, পৃ. ৬০

ইমাম আলী (আ.) জনগণের আচরণের কারণে অতীষ্ট হয়ে পড়েন। তিনি ইরাকের জনগণের উদ্দেশে বলেন : 'ওহে ইরাকের জনগণ। তোমরা হলে সেই গর্ভবতী মহিলার মতো যে গর্ভসময় পূর্তির পর একটি মৃত সন্তান প্রসব করে এবং তার স্বামীও মারা যায় এবং তার বৈধব্য দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পড়ে, ফলে দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজন তার উত্তরাধিকারী হয়। আল্লাহ্‌র কসম! আমি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তোমাদের কাছে আসি নি। অবস্থার প্রেক্ষিতে আমি আসতে বাধ্য হয়েছি। আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা বল, আলী মিথ্যা কথা বলে। আল্লাহ তোমাদের ধ্বংস করুন। কার বিরুদ্ধে আমি মিথ্যা বলি? আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে? কিন্তু তাঁর প্রতি ঈমান আনাতে আমিই তো প্রথম। তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে? কিন্তু আমিই তো প্রথম যে তাঁকে বিশ্বাস করে। কখনও নয়; আল্লাহ্‌র কসম! আমি যা বলেছি তা সম্পূর্ণ সঠিক। তোমরা সে সময় উপস্থিত ছিলে না, থাকলেও সে কথা বোঝার যোগ্য লোক তোমরা নও। তোমাদের ওপর অভিশাপ! আমি বিনামূল্যে আমার সুশোভন বক্তব্য তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি। আহা! এটা ধারণ করার মতো পাত্র যদি থাকত!'- নাহ্‌জ আল বালাঘা, খুতবা ৭০, পৃ. ৮৬

কিয়ৎকাল পরে তোমরা এটা অবশ্যই বুঝতে পারবে। (কুরআন-৩৮:৮৮)

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, আলী (আ.)-এর নির্দেশ অমান্য করতে গিয়ে পরিশেষে মুসলমানদের এমন অবস্থায় হয় যে, তারা তাঁকেই হত্যা করার হুমকি দেয়। সিফফিনের যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত জেনে মুয়াবিয়া বর্শার অগ্রভাগে কুরআন উত্তোলন করে আলী (আ.)-এর সৈন্যদের মধ্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করে। আলী (আ.) মুয়াবিয়ার কুট চালে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য তাঁর সৈন্যদের আহ্বান জানান। কিন্তু তাঁর এ আহ্বানে জনগণ সাড়া না দিয়ে তাঁকেই হত্যা করতে উদ্যত হয়।

মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকে কুরআন উত্তোলন করা হলে আলী (আ.) নিজের সৈন্যদের উদ্দেশে বলেন : 'হে সৈন্যগণ! এ প্রতারণা ও চাতুরির ফাঁদে পড় না। পরাজয়ের গ্লানি থেকে রক্ষা পাবার জন্য তারা এ কৌশল অবলম্বন করেছে। তাদের প্রত্যেকের চরিত্র আমার জানা আছে। তারা প্রকৃতপক্ষে কুরআনের অনুগামী নয়; দীন বা ঈমানের সাথে তাদের কোন সংশ্রব নেই। আমাদের জিহাদের মূল কারণই হল তাদেরকে কুরআন মেনে চলতে এবং কুরআনের আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করা।

আল্লাহ্‌র দোহাই, তোমরা তাদের প্রতারণামূলক কৌশলের শিকার হয়ো না। তোমরা এগিয়ে চল– তোমাদের উদ্যম, সংকল্প ও সাহস নিয়ে। তোমাদের শত্রুদের অবস্থা মুমূর্ষু প্রায়, তাদের নিশ্চিহ্ন করা পর্যন্ত থেমে যেও না।'

কিন্তু সৈন্যরা তাঁর কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে তাঁকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করে। তারা তাঁকে বলে : 'হে আলী! আপনি যদি কুরআনের ডাকে সাড়া না দেন তবে আমরা উসমানের সাথে যেমন ব্যবহার করেছি আপনার সাথেও তেমন ব্যবহার করব। আপনি এখনই যুদ্ধ বন্ধ করুন এবং কুরআনের ফয়সালা মেনে নিন।'

আলী (আ.)-এর মাজলুমীয়াত তাঁর সৈন্যদের প্রতি তাঁর এক ভাষণে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। তিনি বলেন : 'সাবধান, যাঁর হাতে আমার জীবন সেই আল্লাহ্‌র কসম! এসব লোক (মুয়াবিয়া ও তার লোক-লস্কর) তোমাদের পর্যুদস্ত করবে। এটা এজন্য নয় যে, তাদের অধিকার তোমাদের চেয়ে অধিক; বরং এটা এজন্য যে, তারা তাদের নেতার সাথে অন্যায়ের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তোমরা মন্থর গতিতে আমার ন্যায়পথ অনুসরণ করছ। মানুষ শাসকের অত্যাচারের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে; আর আমি আমার প্রজাদের অত্যাচারকে ভয় করি।'- নাহ্‌জ আল বালাঘা, খুতবা : ৯৬, পৃ. ১১৯

সবশেষে আলী (আ.) ভবিষ্যতের বিপদ সম্পর্কে মুসলমানদের সতর্ক করেন। তিনি বলেন : 'গুপ্ত বিষয় সম্পর্কে আমি যা জানি, যা তোমাদের কাছে আবরিত (গোপন) রাখা হয়েছে, তা যদি তোমরা জানতে পারতে তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের কর্মকাণ্ডের জন্য প্রকাশ্যে ক্রন্দন করতে এবং শোকে নিজের শরীরে আঘাত করতে। এমনকি কোন পাহারা ও বিকল্প ছাড়াই তোমাদের সম্পদ পরিত্যাগ করতে। তখন তোমরা প্রত্যেকেই অন্যের প্রতি মনোযোগ ছেড়ে নিজের প্রতি যত্নশীল হতে। কিন্তু যা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল তোমরা তা ভুলে গেছ এবং যে বিষয়ে তোমাদের সতর্ক করা হয়েছিল তা থেকে তোমরা নিজেদের নিরাপদ মনে করেছিলে। ফলে তোমাদের ধ্যান-ধারণা বিপথে চলে গেছে এবং তোমাদের কর্মকাণ্ড বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে।'

'আমি ইচ্ছা পোষণ করি আল্লাহ্‌ যেন আমার ও তোমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেন এবং আমাকে এমন লোক দেন যাদের আমার সাথে থাকার অধিকার তোমাদের চেয়ে বেশি আছে। আল্লাহ্‌র কসম! তারা হবে এমন যারা সুখদায়ক ধ্যান-ধারণার অধিকারী, সুগভীর প্রজ্ঞাবান ও সত্য ভাষণকারী লোক। তারা বিদ্রোহ থেকে দূরে থাকে। তারা আল্লাহ্‌র পথে দৃঢ়পদ এবং সহজ-সরল পথে চলে। ফলে তারা পরকালের অনন্ত জীবনে সুখ ও সম্মান অর্জন করে।

সাবধান! আল্লাহ্‌র কসম! বনি ছাকিফ এর হেলে-দুলে চলনভঙ্গির একটি লম্বা ছোকরাকে তোমাদের কর্তৃত্ব দেওয়া হবে। সে তোমাদের গাছপালা খেয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শরীরের চর্বি গলিয়ে ফেলবে।...'– নাহ্‌জ আল বালাঘা, খুতবা ১১৫, পৃ. ১৩৯

উল্লেখ্য, হযরত আলী যে লোকটির কথা উল্লেখ করেছিলেন সে ছিল হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যে পরবর্তীকালে উমাইয়্যা শাসকদের পক্ষে জনগণের ওপর অকথ্য অত্যাচার-নির্যাতন চালায়। যা হোক, আলী (আ.) অনেক খুতবায় তাঁর সময়ের মুসলমানদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আমরা এখানে তার কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করেছি। আর উপর্যুক্ত এ খুতবাগুলো থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর ওফাতের পর দীর্ঘ পঁচিশ বছর

মানুষ যে জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল আলী (আ.) যখন সেই জীবন-ব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেন তখন মানুষের পক্ষে তা মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আর এ কারণেই তিনি খেলাফত গ্রহণ করতে চাননি। তিনি জানতেন, খেলাফত গ্রহণ করেও কোন সুফল পাওয়া যাবে না। এরপরও আলী (আ.) খেলাফত গ্রহণ করেছিলেন যদি তাঁর প্রচেষ্টায় মুসলিম সমাজের কিছুটা উন্নতি হয়, এমনকি একজন মানুষও হেদায়েত পায়।

আলী (আ.) তাঁর খেলাফত গ্রহণের কারণ সম্পর্কে নিজেই বলেছেন : 'হে আল্লাহ্! তুমি তো জান যে, আমরা যা করেছি তা ক্ষমতার লোভে বা এ অসার দুনিয়া হতে কোন কিছু অর্জন করার জন্য করিনি; বরং আমরা চেয়েছিলাম তোমার দীনের চিহ্ন টিকিয়ে রাখতে, তোমার ন্যায়সমূহকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিতে, যাতে তোমার বান্দাদের মধ্যে যারা অত্যাচারিত তারা নিরাপদে থাকতে পারে এবং তোমার পরিত্যক্ত আদেশাবলি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।'- নাহ্জ আল বালাঘা, খুতবা : ১৩০, পৃ. ১৫৬

হযরত আলী (আ.) সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন, কিন্তু মানুষ হেদায়েত না চাইলে তাকে জোর করে হেদায়েত করা যায় না। অতীতে যেমন হয়নি, আজও তেমনিই রয়েছে। অতীতে যেমন মুসলমানরা প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে উদাসীন ও অসচেতন ছিল, আজও তেমনি উদাসীন ও অসচেতন। অন্যদিকে অনেকের ঈমান এতই দুর্বল যে, কোন বিষয়ে প্রশ্ন করতে ও জানতে ভয় পায় যে, ঈমানহারা হয়ে যাব। যদি নিজের বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে না পারি তবে হালকা বাতাসেই যে তা উপড়ে পড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ সত্য কোনদিন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে ভয় পায় না। আর মিথ্যার ঘর বড়ই দুর্বল!

মহান আল্লাহ্ আমাদের সত্য জেনে তা আঁকড়ে ধরার তৌফিক দান করুন।

তথ্যসূত্র

১. নাহ্জ আল বালাঘা, অনুবাদ : জেহাদুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর, ২০০০
২. বেলায়াতের দ্যুতি, দারুল কোরআন ফাউন্ডেশন, ঢাকা
৩. চিরভাস্বর মহানবী (সা.), ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

সাহাবীদের সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি

আল্লামা আসাদ হায়দার

সাহাবীদের সম্পর্কে যে ধারণা করা চলে তা তিনটি অবস্থার বাইরে নয় :

প্রথম : সাহাবীদের সকলেই 'আদেল্ এবং যেহেতু তাঁরা মুজ্তাহিদ সেহেতু তাঁরা যা-ই করেছেন তা-ই জায়েয। এটা হচ্ছে আহ্লে সুন্নাতের অধিকাংশের মত।

দ্বিতীয় : সাহাবিগণ অন্যদের মতোই; তাঁদের মধ্যে যেমন অনেকে 'আদেল ছিলেন তেমনি অনেকে ফাসেক ছিল। লোকদেরকে তাদের আমলের দ্বারা বিচার করা হয়। নেককার লোকেরা স্বীয় নেক আমলের কারণে পুরস্কৃত হবেন এবং বদকার লোকেরা তাদের বদ আমলের কারণে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। এটা হচ্ছে আহলে বাইতের অনুসারীদের মত।

তৃতীয় : সমস্ত সাহাবীই (আল্-'আইয়ায্ বিল্লাহ্) কাফের। এ হচ্ছে ইসলামের সীমারেখার বহির্ভূত লোকদের মত এবং কাফের লোকেরা ব্যতীত কেউ এরূপ মত প্রকাশ করে নি।

এই হলো এ বিষয়ে তিনটি ধারণা ও মত। এ তিনটি মত সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে আমাদেরকে সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে সত উদ্ঘাটনের চেষ্টা করতে হবে।

তৃতীয় মতটি বাতিল হওয়ার ব্যাপারে পুরোপুরি মতৈক্য রয়েছে। ইসলামের দুশমন এবং মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী ব্যতীত কেউ এরূপ মত পোষণ করে না। আর প্রথম মতটির তাৎপর্য হচ্ছে সাহাবীদের সম্পর্কে 'ইসমাতের (নিষ্পাপত্বের) ধারণার অনুরূপ অথবা এর মানে এই যে, তাঁদের ওপর থেকে দায়িত্ব (ফরয আঞ্জাম দেয়ার ও হারাম বর্জনের দায়িত্ব) প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। এ মতও ইসলাম সমর্থন করে না এবং দ্বীনী শিক্ষা এটিকে গ্রহণ করে না।

এরপর কেবল দ্বিতীয় মতটিই অবশিষ্ট থাকে যা আহলে বাইতের অনুসারীদের মত– যে মতে সাহাবীদের গ্রহণযোগ্যতাকে তাঁদের প্রত্যেকের আমল ও ঈমানের স্তরের শর্তাধীন বলে গণ্য করা হয়। এর ভিত্তিতে আহলে বাইতের অনুসারীরা মনে করে যে, সাহাবিগণ অর্থাৎ যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কথা শুনেছেন বা তাঁকে দেখেছেন তাঁরা দুই ভাগে বিভক্ত : হয় মু'মিন, 'আদেল ও নেককার, নয়তো মুনাফিক, ফাসেক ও গুনাহ্গার।

তাবূক যুদ্ধে হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর উক্তি থেকে বেশ ভালোভাবেই এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

তাবূক যুদ্ধের ঘটনায় জিবরাঈল এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে মুনাফিকদের কথা জানিয়ে দিয়ে যান। জিবরাঈল জানান যে, মুনাফিকরা বলাবলি করছে : 'মুহাম্মাদ আসমানী খবর অবগত, কিন্তু পানিপ্রবাহের পথের খবর অবগত নয়।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সা'দ্ বিন্ 'উবাদাহ্‌র কাছে এ বিষয়টি ক্ষোভের সাথে উল্লেখ করেন। তখন সা'দ্ তাঁকে বলেন : 'আপনি চাইলে তাদের শিরশ্ছেদ করুন।'

জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরশাদ করেন : "আমি চাই না যে, লোকেরা বলুক : 'মুহাম্মাদ তাঁর সাহাবীদেরকে হত্যা করছেন।' বরং যতক্ষণ তারা আমাদের সাথে থাকবে ততক্ষণ আমি তাদের সাথে উত্তম আচরণ করব।"[১]

অতএব, এটা সুস্পষ্ট যে, কেবল নবীর সাথে থাকাটাই কাউকে গুনাহ্ থেকে হেফাযত করে না এবং তাকে 'আদেলে পরিণত করে না। বরং ব্যক্তির আমল ও ঈমানের স্তরই তার দ্বীনী মর্যাদা ও অবস্থানকে নির্ধারণ করে।

আল্লাহ্‌র কিতাবে ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীসে এ ব্যাপারে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা উপরিউক্ত উপসংহারে উপনীত হওয়ার জন্য যথেষ্ট এবং তা আমাদেরকে অন্য যে কোনো দলিল ও যুক্তিপ্রমাণের মুখাপেক্ষিতা থেকে বেনিয়ায করে।

কোরআন মজীদ কতক সাহাবীকে দৃঢ়পদ মু'মিন হিসেবে উল্লেখ করেছে যাঁরা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত স্বীয় অঙ্গীকার আন্তরিকতার সাথে পালন করেছেন। বস্তুত ঈমান তাঁদের অস্থিমজ্জা ও রক্তমাংসে মিশে ছিল এবং তাঁরা পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য সংগ্রাম করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সম্পর্কে এরশাদ করেন :

... أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا ۖ
سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِى ٱلْإِنجِيلِ
كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ

১. দ্রষ্টব্য : *দালাএলুন্ নাবুওয়াহ্*, বায়হাক্বী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৫৬-২৫৭।

عَظِيمًا وَأَجْرًا مَّغْفِرَةً مِنْهُم الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَعَدَ الْكُفَّارَ بِهِمُ لِ

'তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর ও তাদের নিজেদের পরস্পরের প্রতি দয়ার্দ্র; (হে রাসূল!) আপনি তাদেরকে রুকূ'রত ও সিজদাহ্-অবনত এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি সন্ধানরত অবস্থায় দেখতে পান; তাদের চেহারায় সিজদাহ্র নিদর্শন রয়েছে। এদের (অনুরূপ বৈশিষ্ট্যাবলি সম্বলিত লোকদের) দৃষ্টান্ত তাওরাতে ও এদের দৃষ্টান্ত ইন্জীলে উল্লিখিত হয়েছে। এরা হচ্ছে সেই কৃষির ন্যায় যে, প্রথমে চারা মাথা তুললো, এরপর তাতে পানি সিঞ্চিত হলো, এরপর তা বিকশিত হলো ও স্বয়ং কাণ্ডের ওপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে গেলো এবং তা কৃষককে বিস্মিত-বিমোহিত করলো– যাতে (এর প্রাচুর্য দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা) কাফেরদেরকে ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ করে দেন। আর তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও যথাযথ আমল সম্পাদন করেছে তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।'[১]

এছাড়াও আল্লাহ্ তা'আলা প্রকৃত ঈমানদারদের সম্বন্ধে এরশাদ করেন :

بِأَمْوَالِهِمْ وَجَاهَدُوا يَرْتَابُوا لَمْ ثُمَّ وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ آمَنُوا الَّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

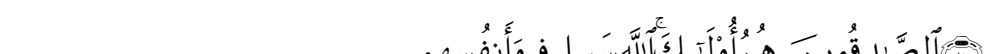

الصَّادِقُونَ هُمُ أُولَٰئِكَ اللَّهِ سَبِيلِ فِي وَأَنفُسِهِمْ

'নিঃসন্দেহে মু'মিন হচ্ছে তারা যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর আর সন্দেহে নিপতিত হয় নি এবং স্বীয় ধনসম্পদ ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে; এরাই হলো (স্বীয় ঈমানের দাবিতে) সত্যবাদী।'[২]

---

১. সূরা আল্-ফাত্হ্: ২৯। লক্ষণীয় যে, আয়াতের শেষাংশে সার্বিকভাবে সব সাহাবাকে শামিল করা হয় নি; বরং তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও যথাযথ আমল সম্পাদন করেছে কেবল তাদের জন্যই ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তেমনি এ সূরার ১৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ বাইআতে রেদওয়ানে অংশগ্রহণকারী যেসব সাহাবা রাসূলের হাতে বাইআত করেছেন তাঁদের প্রতি স্বীয় সন্তুষ্টির ঘোষণা দিলেও এটা যে সবসময়ের জন্য বহাল থাকবে তার নিশ্চয়তা দেন নি; বরং পূর্বেই ১০ নং আয়াতে রাসূলের সাথে বাইআত যে স্বয়ং আল্লাহর সাথে বাইআত তার প্রতি ইঙ্গিত করে এ বাইআত ভঙ্গের মন্দ পরিণতি যে বাইআত ভঙ্গকারীর ওপরই আরোপিত হবে তার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এ থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর সন্তুষ্টি কখনই নিঃশর্ত নয়। বরং শেষ জীবন পর্যন্ত ইসলামের প্রতি নিবেদিত থাকা, সৎকর্ম এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কৃত অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির ওপর অটল থাকার শর্তাধীন।– সম্পাদক

২. সূরা আল্-হুজুরাত্ : ১৫।

আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের প্রকৃত ঈমানদারদের–যারা স্বীয় ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী–সাথে থাকার জন্য আদেশ দিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।'[১]

আল্লাহ্ তা'আলা অপর এক আয়াতে এরশাদ করেন :

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

'আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যকার প্রথম দিককার অগ্রগামিগণ এবং যারা নেক আমলের ব্যাপারে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ্ তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হয়েছে। তিনি তাদের জন্য এমন বেহেশত প্রস্তুত করে রেখেছেন যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হয়েছে; সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। বস্তুত এটা এক বিরাট বিজয়।'[২]

এরা হলেন হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর এমন সাহাবী যাঁদের সম্পর্কে কারো পক্ষেই আল্লাহ্ তা'আলার উপরিউক্ত উক্তিসমূহের বরখেলাফে কোনো কিছু বলা সম্ভব নয়। অন্যদিকে কতক সাহাবী মুনাফিকসুলভ জীবনের অধিকারী ছিল– যারা ফিত্না সৃষ্টির এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে প্রতারণা করার ও তাঁর কাছে সত্যকে বিপরীতরূপে প্রদর্শন করার চেষ্টা করত। তাই তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দেন এবং তাদের সম্পর্কে সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়ে যায়। এই সাহাবীদের মধ্যে এমন কিছু লোক ছিল যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে কষ্ট দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা এদের সম্পর্কে এরশাদ করেন :

وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ

১. সূরা আত্-তাওবাহ্ : ১১৯।
২. সূরা আত্-তাওবাহ্ : ১০০।

"তাদের মধ্যে এমন লোকেরা রয়েছে যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে : 'এ লোকটি তো কানসর্বস্ব (যা শোনে তা-ই বিশ্বাস করে)।'"[১]

এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾

'নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয় আল্লাহ্ তাদের ওপর লা'নত্ করেন দুনিয়া ও আখেরাতে এবং তাদের জন্য তিনি অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।'[২]

আল্লাহ্ তা'আলা এদের সম্পর্কে আরো এরশাদ করেন :

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾

'আর যারা আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'[৩]

সাহাবীদের মধ্যে এমন লোকেরা ছিল যারা প্রতারণা করত এবং বাহ্যত ঈমানদার হবার দাবি করত। আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে তাদের পরিচয় তুলে ধরেছেন :

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

"আর লোকদের মধ্যে এমন লোকেরা রয়েছে যারা বলে : 'আমরা ঈমান এনেছি', কিন্তু (প্রকৃতপক্ষে) তারা মু'মিন নয়। তারা আল্লাহ্ ও ঈমানদারদেরকে প্রতারণা করে, তবে (প্রকৃতপক্ষে) তারা কেবল নিজেদের ছাড়া আর কাউকেই প্রতারণা করে না, কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না।"[৪]

আল্লাহ্ তা'আলা এদের সম্পর্কে আরো এরশাদ করেন :

---

১. সূরা আত্-তাওবাহ্ : ৬১।
২. সূরা আল্-আহ্যাব্ : ৫৭।
৩. সূরা আত্-তাওবাহ্ : ৬১।
৪. সূরা আল্-বাক্বারাহ্: ৮-৯।

حَنُ إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّا قَالُوٓا۟ شَيَـٰطِينِهِمْ إِلَىٰ خَلَوْا۟ وَإِذَا ءَامَنَّا قَالُوٓا۟ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ لَقُوا۟ وَإِذَا

﴿١٤﴾ مُسْتَهْزِءُونَ ۝

"তারা যখন ঈমানদারদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে : 'আমরা ঈমানদার' এবং যখন তারা তাদের শয়তানদের (তাদের নেতাদের) সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে তখন বলে : 'অবশ্যই আমরা (ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি) বিদ্রূপকারী।'"[১]

আল্লাহ্ তা'আলা এদের সম্পর্কে আরো এরশাদ করেন :

ٱلصَّـٰلِحِينَ مِنَ وَلَنَكُونَنَّ لَنَصَّدَّقَنَّ فَضْلِهِۦ مِنْ ءَاتَىٰنَا لَئِنْ ٱللَّهَ عَـٰهَدَ مَّنْ وَمِنْهُم ۞

فَأَعْقَبَهُمْ ﴿٧٦﴾ مُّعْرِضُونَ وَّهُم وَتَوَلَّوا۟ بِهِۦ بَخِلُوا۟ فَضْلِهِۦ مِّنْ ءَاتَىٰهُم فَلَمَّآ ﴿٧٥﴾

﴿٧٧﴾ يَكْذِبُونَ كَانُوا۟ وَبِمَا وَعَدُوهُ مَا ٱللَّهَ أَخْلَفُوا۟ بِمَآ يَلْقَوْنَهُۥ يَوْمِ إِلَىٰ قُلُوبِهِمْ فِى ن

'তাদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহ্র সাথে এ মর্মে অঙ্গীকার করেছিল যে, তিনি যদি আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে দান করেন (উপার্জন বৃদ্ধি করে দেন) তাহলে অবশ্যই আমরা সাদাকাহ্ প্রদান করব এবং অবশ্যই আমরা নেককার (ও শোকরকারীদের) অন্তর্ভুক্ত হব। অতঃপর আল্লাহ্ যখন স্বীয় অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে দান করলেন তখন তারা এ ব্যাপারে কার্পণ্য করল এবং তারা মুখ ফিরিয়ে নিল ও এড়িয়ে গেল। আর তারা যে আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং তারা যে মিথ্যা বলেছে তারই পরিণতিতে তিনি তাদের অন্তরে তাঁর সাথে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত সময়ের জন্য নেফাক স্থায়ী করে দিলেন।'[২]

এ থেকে এ উপসংহারেই উপনীত হতে হয় যে, যদিও হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর সাহচর্য অত্যন্ত মূল্যবান ও বিরাট ফযীলতের ব্যাপার, কিন্তু তাঁর সাহচর্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ (সাহাবিগণ) দুই ভাগে বিভক্ত : তাঁদের মধ্যে একদল ছিলেন এমন, আল্লাহ্ তা'আলা যাঁদের অন্তরকে পরীক্ষা করলে তাঁরা তাতে উত্তীর্ণ হন; তাঁরা নিজেদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য খালেস করে দিয়েছিলেন এবং তাঁরা ছিলেন উন্নত চরিত্র ও

১. সূরা আল্-বাক্বারাহ্: ১৪।
২. সূরা আত্-তাওবাহ্: ৭৫-৭৭।

আচরণের আদর্শ দৃষ্টান্ত; তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার বরাবরে বিনীত-অবনত ছিলেন এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সম্বন্ধে এরশাদ করেন :

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ
إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾
أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُمْ دَرَجَٰتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ
﴿٤﴾

'নিঃসন্দেহে মু'মিন হচ্ছে তারা, আল্লাহ্‌র কথা উল্লেখ করা হলে যাদের অন্তর আপ্লুত হয়ে যায় এবং তাদের সামনে তাঁর আয়াত পাঠ করা হলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, আর তারা তাদের রবের ওপর তাওয়াক্কুল করে– (এরা হচ্ছে এমন লোক) যারা নামায কায়েম রাখে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। এরাই হলো সত্যিকারের মু'মিন; তাদের জন্য তাদের রবের কাছে বিভিন্ন স্তরের মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক রয়েছে।'[১]

অন্যদিকে সাহাবীদের মধ্যে এমন লোকজনও ছিল ঈমান যাদের অন্তরে প্রবেশ করে নি। আল্লাহ্ তা'আলা এদের সম্পর্কে এরশাদ করেন :

يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ ۚ

'তারা মুখে তা-ই বলে যা তাদের অন্তরে নেই।'[২]

অতএব, যারা সত্যান্বেষী– যাঁরা কোনোরূপ অন্ধ ধ্যান-ধারণার অনুসারী নন এবং ভিত্তিহীন প্রচারণা ও অন্তঃসারশূন্য বাক্‌জালের দ্বারা প্রভাবিত হন না, তাঁদের চোখে এ সত্যটি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের জন্য যেসব শর্ত ও গুণাবলি উল্লেখ করেছেন সেগুলো এবং হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর নৈকট্যের বৈশিষ্ট্যাবলি তাঁকে প্রত্যক্ষকারী ঈমানের দাবিদার সকলের মধ্যে ছিল না।

সুতরাং এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এদের সকলের জন্য এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য সর্বজনীন বলে দাবি করার পিছনে যালেম শাসকদের বিশেষ লক্ষ্য কাজ করেছিল, তা হচ্ছে, জনগণের কাছে আহ্‌লে বাইতের বিশেষ মর্যাদা ও অবস্থানকে নিশ্চিহ্ন করা।

১. সূরা আল্-আন্‌ফাল্ : ২-৪।
২. সূরা আল্-ফাত্‌হ্ : ১১।

তাঁদের এ বিশেষ মর্যাদা ও অবস্থান ছিল এই যে, তাঁরা ছিলেন হেদায়াতের ইমাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রকৃত স্থলাভিষিক্ত (খলীফা) এবং জনগণের জন্য দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে তাঁর আস্থাভাজন ওয়াসী।

অতএব, এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সাহাবী নামে পরিচিত যে কারো ওপরেই পবিত্রতা আরোপ করার উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের সকলের স্তর ও মর্যাদাকে আহ্লে বাইতের সমুন্নত স্তর ও মর্যাদার সাথে অভিন্ন করে সকলকে এক করে ফেলা ও তাঁদের মধ্যকার পার্থক্য বিলুপ্ত করে দেয়া, আর এভাবে লোকদেরকে প্রকৃত ব্যাপারটি ভুলে যেতে বাধ্য করা। কারণ, ঢালাওভাবে সকল সাহাবীর ওপর পবিত্রতা আরোপ করার মানে হচ্ছে তাঁদের কর্ম ও আচরণের ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে রাখা, যদিও তাঁদের একাংশের অপছন্দনীয় কাজকর্মের ও অবিরাম যুলুমমূলক আচরণের ফিরিস্তিতে ইসলামের ইতিহাসের এক বিরাট অংশ পূর্ণ হয়ে আছে।

অধিকন্তু, কোরআন মজীদে মুনাফিকদের সম্পর্কিত যেসব দ্ব্যর্থহীন আয়াত রয়েছে এবং যেসব ঐতিহাসিক বাস্তবতা তাদের অপছন্দনীয় কাজকর্মের সাক্ষ্য দেয় সে সম্বন্ধে কী বলার আছে?

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দর্শনকারী ঈমানের ঘোষণা প্রদানকারীদের সকলের ওপরে ঢালাওভাবে পবিত্রতা আরোপের মুদ্রার অপর পিঠ হচ্ছে যালেম শাসকরা জনগণের অনুধাবনশক্তি ও বিচারবুদ্ধিকে ভোঁতা করে ফেলার এবং চিন্তার স্বাধীনতা হরণের যে নীতি গ্রহণ করে তার সাথে সমন্বয় সাধন।

কারণ, এদের সকলের ওপর পবিত্রতা আরোপের মানে হচ্ছে রাবীদের সম্পর্কে কোনো রকমের চিন্তাভাবনা ও পর্যালোচনা ছাড়াই এদের সকলের বর্ণিত রেওয়ায়াতকে হাদীসে রাসূল (সা.) হিসেবে গ্রহণ করে নেয়া। আর এর মানে হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা বিচারবুদ্ধি ('আক্ল্) রূপ যে নে'আমত দান করেছেন তাকে উপেক্ষা করা।

প্রশ্ন হচ্ছে, এভাবে সাহাবীদের জন্য ঢালাওভাবে যে নিষ্পাপত্ব দাবি করা হয়েছে তার উদ্ভব কখন ঘটেছিল? রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওফাতের আগে তথা তাঁর জীবদ্দশায় কি এর উদ্ভব ঘটেছিল, নাকি তাঁর ওফাতের পরে? এ ধারণাটির উদ্ভব যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওফাতের আগে ঘটে নি তার সপক্ষে অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে।

বায়হাক্বী স্বীয় ধারাবাহিক সনদসূত্রে আবূ 'আব্দুল্লাহ্ আশ্'আরী থেকে এবং তিনি আবূ দারদা' থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (আবূ দারদা') বলেন : "আমি বললাম : 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি শুনেছি যে, আপনি নাকি বলেছেন : অনেক লোক ঈমানের পর মুরতাদ হবে।' তিনি এরশাদ করলেন : 'হ্যাঁ, তবে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও।'"[১]

১. *তারীখে ইব্নে কাছীর*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৭০।

বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, কেউ কেউ বলেছেন, এখানে মুরতাদ বুঝাতে হযরত 'উসমানের হত্যাকারীদেরকে বুঝানো হয়েছে, আর আবূ দারদা' 'উসমান-হত্যার ঘটনার আগেই ইন্তেকাল করেন।

এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী এ হাদীসের বক্তব্য যাদের বেলায় প্রযোজ্য হয় তাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সাহাবীদের সংখ্যা আহলে বাইতের অনুসারীরা যাদেরকে মুনাফিক গণ্য করে তাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত লোকদের সংখ্যার চেয়ে অনেক অনেক বেশি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে সকল সাহাবী যে, 'আদেল ছিলেন না তার আরো অনেক প্রমাণ রয়েছে; এখানে সেসব প্রমাণ থেকে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

১. এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাতেব্ ছিল এবং সে সূরা আল্-বাক্বারাহ্ ও সূরা আলে 'ইমরান লিপিবদ্ধ করছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে غفوراً رحيماً লিখতে বললেন, কিন্তু সে عليماً حكيماً লিখল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে বললেন : 'এভাবে লেখ।' সে জবাব দিল : 'আমি যেভাবে চাই সেভাবেই লিখব।' রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন তাকে عليماً حكيماً লিখতে নির্দেশ দিতেন তখন সে سميعاً بصيراً লিখত। সে বলত : 'আমি মুহাম্মাদ সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে বেশি জানি।' কিছুদিন পর লোকটি মারা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরশাদ করলেন : 'যমীন তাকে গ্রহণ করবে না।' আনাস্ বলেন : আবূ ত্বাল্হাহ্ উদ্ধৃত করেছেন : আমি ঐ লোকটির দাফনের জায়গায় গেলাম। কিন্তু দেখলাম যে, তার লাশ এক কোণে পড়ে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম : 'এমন হয়েছে কেন?' লোকেরা বলল : 'আমরা তাকে কয়েক দফা দাফন করেছি, কিন্তু যমীন তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে।' ইব্নে কাছীর বলেন : শায়খাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর শর্তাবলির বিচারে এ রেওয়ায়াতটি সহীহ, কিন্তু তাঁরা দু'জন এ হাদীসটি (স্বীয় সংকলনে) গ্রহণ করেন নি।

২. আল্লাহ্ তা'আলা ওয়ালীদ বিন 'উক্বাহ্ বিন আবী মুহীত্বকে ফাসেক বলে অভিহিত করেছেন। ঘটনাটি ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে বনি মুসতালিক-এর সাদাকাহ্ সংগ্রহের জন্য পাঠিয়েছিলেন। সে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জানায় যে, তারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের সাথে মোকাবিলার জন্য একটি সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত নিলে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ...

'হে ঈমানদারগণ! কোনো ফাসেক লোক যদি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে তাহলে তোমরা তা যাচাই করো যাতে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো জনগোষ্ঠীর ক্ষতিসাধন না করো...।'[১]

ওয়ালীদ্ তো সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু কোথায় 'আদেল আর কোথায় ফাসেক!

১. সূরা আল্-হুজুরাত্: ৬।

৩. জা'দ্ বিন কায়েস ছিল বনি সালামাহ্র একজন লোক। তার সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়[১] :

لَمُحِيطَةٌۢ جَهَنَّمَ وَإِنَّ ۖ سَقَطُوا۟ ٱلْفِتْنَةِ فِى أَلَا ۚ تَفْتِنِّى وَلَا لِّى ٱئْذَن يَقُولُ مَّن وَمِنْهُم

بِٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٤٩﴾

"আর তাদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যে বলে : 'আমাকে (যুদ্ধে না যাওয়ার) অনুমতি দিন এবং আমাকে পরীক্ষার (ফিত্নার) মধ্যে ফেলবেন না।' সাবধান! মনে রেখ, তারা (এ ধরনের লোকেরা ইতিমধ্যেই) ফিত্নায় নিপতিত হয়ে আছে। আর অবশ্যই জাহান্নাম কাফেরদেরকে গ্রাস করে নেবে।"[২]

৪. একদল লোক 'মসজিদে যেরার' তৈরি করে। বাহ্যত তারা সাহাবী হিসেবে পরিচিত ছিল; তারা এ মসজিদে নামায আদায়ের জন্য জমায়েত হয় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খেদমতে হাযির হওয়া থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন এবং তাদের নেফাকের ওপর থেকে পর্দা অপসারণ করে দিয়ে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন :

إِرْصَادًا ٱلْمُؤْمِنِينَ بَيْنَ وَتَفْرِيقًۢا وَكُفْرًا ضِرَارًا مَسْجِدًا ٱتَّخَذُوا۟ وَٱلَّذِينَ

نَّهُمْ يَشْهَدُ وَٱللَّهُ ۖ ٱلْحُسْنَىٰٓ إِلَّآ أَرَدْنَآ إِنْ وَلَيَحْلِفُنَّ ۚ قَبْلُ مِن وَرَسُولَهُۥ ٱللَّهَ حَارَبَ لِّمَنْ و

لَكَٰذِبُونَ إِ ﴿١٠٧﴾

"যারা এমন মসজিদ পরিগ্রহণ করেছে যা হচ্ছে অনিষ্টতা, কুফ্র্ ও মু'মিনদের মধ্যে অনৈক্যের উৎস এবং যারা আগে থেকেই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছিল তাদের গোপন ঘাঁটি; (হে রাসূল!) তারা অচিরেই আপনার কাছে শপথ করে বলবে : 'আমরা কেবল উত্তম ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্য পোষণ করি নি।' কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই তারা মিথ্যাবাদী।"[৩]

১. *সীরাতে ইব্নে হিশাম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩২।
২. সূরা আত্-তাওবাহ্ : ৪৯।
৩. সূরা আত্-তাওবাহ্ : ১০৭।

এরা ছিল বারো জন মুনাফিক– যাদের মধ্যে একজন ছিল খায্যাম্ বিন্ খালেদ্ বিন্ ‘উবাইদ্; তার বাড়িতেই এ মসজিদটি তৈরি করা হয়। এছাড়া মু‘তাব্ বিন্ ক্বোশাইর্ এবং আবূ হাবীবাহ্ বিন্ আবীল্ আয্‘আর্-ও তাদের মধ্যে ছিল।[১]

৫. ছা‘লাবাহ্ বিন্ হাত্বেব্ বিন্ ‘উমার্ বিন্ উমাইয়াহ্ ছিল বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম। কিন্তু সে তার ধনসম্পদের যাকাত প্রদান করে নি। এ কারণে তার সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়[২] :

۞ وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ
﴿٧٥﴾ فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضْلِهِۦ بَخِلُوا۟ بِهِۦ وَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾

‘তাদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র সাথে এ মর্মে অঙ্গীকার করেছিল যে, তিনি যদি আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে দান করেন (উপার্জন বৃদ্ধি করে দেন) তাহলে অবশ্যই আমরা সাদাকাহ্ প্রদান করব এবং অবশ্যই আমরা নেককারদের (ও শোকরকারীদের) অন্তর্ভুক্ত হব। অতঃপর আল্লাহ্ যখন স্বীয় অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে দান করলেন তখন তারা এ ব্যাপারে কার্পণ্য করল এবং তারা মুখ ফিরিয়ে নিল ও এড়িয়ে গেল।’[৩]

ছা‘লাবাহ্ ছিল এমন একজন সাহাবী যে তার প্রতি ওয়াক্ত নামায যথাসময়ে আদায় করত। কিন্তু সে ছিল দরিদ্র ও রিক্তহস্ত। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলে : ‘আমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দো‘আ করুন যাতে তিনি আমাকে ধনসম্পদ দান করেন।’ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরশাদ করেন : ‘তোমার জন্য আফসোস্, ছা‘লাবাহ্! তুমি যদি অল্প সম্পদের জন্যও শোকর আদায় করো তাহলে তা তোমার জন্য প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হয়ে শোকর আদায় না করার চেয়ে উত্তম।’ জবাবে ছা‘লাবাহ্ বলল : ‘সেই আল্লাহ্‌র শপথ, যিনি আপনাকে রাসূল হিসেবে উত্থিত করেছেন, আপনি যদি আমাকে ধনসম্পদ দেয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দো‘আ করেন তাহলে (ধনসম্পদের অধিকারী হবার পর) প্রত্যেক হক্বদারের হক্ব আদায় করব।’ তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্‌র কাছে দো‘আ করলেন : ‘হে আল্লাহ্! ছা‘লাবাহকে ধনসম্পদ দান করো।’

এরপর ছা‘লাবাহ্‌র ধনসম্পদ ও আয়-উপার্জনের সূত্র অনেক বেড়ে গেল। কিন্তু সে তার ওয়াদা রক্ষা করল না এবং স্বীয় ধনসম্পদের যাকাত প্রদান করল না। সে নেফাকে জড়িয়ে পড়ল এবং শেষ পর্যন্ত তাতেই নিমজ্জিত হয়ে থাকল।

---

১. *সীরাতে ইব্‌নে হিশাম্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪১; *তাফ্‌সীরে ইব্‌নে কাছীর্*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৮।
২. *আল্-ইস্‌তী‘আব্* (*আল্-ইছ্বাবাহ্*র পার্শ্বটীকায়), ১ম খণ্ড, পৃ. ২০১।
৩. সূরা আত্-তাওবাহ্: ৭৫-৭৭।

৬. যূছ্-ছাদীয়াহ্ ছিল একজন সাহাবী এবং সে একজন বড় 'আবেদ্ ও পরহেযগার ছিল। তার ধার্মিকতা ও তাহাজ্জুদগুযারী অনেকেরই ঈর্ষার বিষয় ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে হত্যা করার জন্য নির্দেশ দান করেন। তিনি তার সম্পর্কে বলেন : 'এই লোকটির চেহারায় শয়তানের কলঙ্কের একটি নোংরা দাগ আছে।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে হত্যার জন্য আবূ বকরকে প্রেরণ করেন। কিন্তুআবূ বকর তাকে নামাযরত অবস্থায় দেখে ফিরে আসেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরপর উমরকে পাঠান। কিন্তু উমরও তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অতঃপর আলী (আ.)-কে পাঠালেন। কিন্তু আলী তাকে খুঁজে পেলেন না।[১]

উল্লেখ্য, যূছ্-ছাদীয়াহ্ ছিল সেই ব্যক্তি পরবর্তীকালে যে খারেজীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং ইমাম আলী (আ.) নাহ্রাওয়ানের যুদ্ধে তাকে হত্যা করেন।

৭. সাহাবী নামধধারী আরেকটি দল সুওয়াইলিম্-এর গৃহে সমবেত হতো এবং লোকদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনুগত্য করতে নিষেধ করত। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সুওয়াইলিম্-এর গৃহে আগুন ধরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন।[২]

৮. ক্বিয্মান্ বিন্ হার্ছ্ উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর পক্ষে কঠিনভাবে যুদ্ধ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবিগণ বললেন : 'আমাদের মধ্যে কেউই অমুকের ন্যায় কষ্ট স্বীকার করছে না।' কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরশাদ করেন : 'তোমরা জেনে রেখ যে, সে জাহান্নামী।' সে যখন যুদ্ধে আহত হলো এবং ধরাশায়ী হলো তখন অনেকে তাকে বললেন : 'জান্নাত তোমার জন্য উপভোগ্য হোক।' জবাবে সে বলল : 'এস্পান্দের[৩] জান্নাত। আল্লাহ্র শপথ, ওদের ওপর আমার যে ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল সে কারণে যুদ্ধ করেছি।'[৪]

৯. হাকাম্ বিন্ আবীল্ 'আছ্ বিন্ উমাইয়াহ্ বিন্ 'আব্দে শাম্স্ ছিল মারওয়ানের পিতা ও উসমানের চাচা। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে নিজের কাছ থেকে তাড়িয়ে দেন এবং লা'নত্ করেন। যুহ্রী ও 'আত্বায়ে খোরাসানীর সনদে ফাকেহী বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবিগণ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তিনি তখন হাকাম্কে লা'নত্ করছিলেন। তাঁরা বললেন : 'হে আল্লাহ্র রাসূল! সে কী করেছে?' তিনি বললেন : 'আমি আমার অমুক স্ত্রীর সাথে ছিলাম, তখন সে বেড়ার ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করে।'

এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একদিন হাকামের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে তাঁকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে উপহাস করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বিষয়টি বুঝতে পারলেন এবং বললেন : 'হে আল্লাহ্! তাকে গিরগিটিতে পরিণত করো।' তখন সে বুক মাটিতে লাগিয়ে

---

১. *আল্-ইছ্বাবাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৯।
২. *সীরাতে ইব্নে হিশাম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩২।
৩. সুগন্ধি উদ্ভিদবিশেষ– সুগন্ধির জন্য যার বীচি পোড়ানো হয়। – অনুবাদক
৪. *আল্-ইছ্বাবাহ্*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫।

হামাগুড়ি দিয়ে এক কোণে চলে যায়। লোকেরা তাকে 'খাইতুল বাতিল' (বাতিল সুতা) বলত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তার সম্পর্কে এরশাদ করেন : 'তার ঔরসে যে সন্তান রয়েছে তার কারণে আমার উম্মাতের জন্য আফসোস।'[১]

আয়েশা থেকে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি মারওয়ান ইব্‌নে হাকামকে বলেন : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি যখন তোমার পিতার ঔরসে ছিলে তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে লা'নত্ করেন।'[২]

১০. নাসায়ী তাঁর *সহীহ্* গ্রন্থে নিম্নোক্ত আয়াতের শানে নুযূল্ সম্বন্ধে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাস বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন :

وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَـْٔخِرِينَ ﴿٢٤﴾

'আমি তোমাদের মধ্যকার অগ্রগামীদের জানি এবং পশ্চাদবর্তীদেরও জানি।'[৩]

তিনি (আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাস) বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নামাযের জামা'আতে একজন সুন্দরী নারী অংশগ্রহণ করে। তখন তার প্রতি যাতে দৃষ্টি না পড়ে সে উদ্দেশ্যে কেউ কেউ পিছন থেকে সামনের কাতারে চলে যায়, কিন্তু কেউ কেউ শেষ কাতারে দাঁড়ায় এবং রুকূ'র সময় নিজের দুই হাতের মাঝখান দিয়ে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন।[৪]

(১১) আহ্‌মাদ ইব্‌নে হাম্বাল আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাস ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর থেকে উদ্ধৃত করেন যে, তাঁরা দু'জন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে মিম্বারে বসে বলতে শোনেন যে, তিনি এরশাদ করেন : 'যেসব লোক নামাযের জামা'আত পরিত্যাগ করেছে তারা যেন এ কাজ থেকে বিরত থাকে। নচেৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরসমূহে মোহর মেরে দেবেন এবং তাদের নাম গাফেলদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে নেবেন।'[৫]

(১২) আহ্‌মাদ ইব্‌নে হাম্বাল স্বীয় *মুসনাদ্* গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাস্‌'উদ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) স্বীয় সাহাবীদের উদ্দেশে এরশাদ করেন : "আমি তোমাদের আগে গিয়ে হাউযের কাছে থাকব এবং বহু জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব ও তাদের ওপর বিজয়ী হব, আর বলব : 'হে আমার রব! আমার সাহাবিগণ (আমার

---

১. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৬।
২. *শার্‌হে নাহ্‌জুল্ বালাগ্বাহ্*, ইব্‌নে আবীল্ হাদীদ্, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৫০।
৩. সূরা আল্-হিজ্‌র্ : ২৪।
৪. *ছ্বাহীহ্ নাসায়ী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮/৮৭০।
৫. *মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ্*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪০।

সাহাবীদের দয়া করো)।' তখন আল্লাহ্ বলবেন : '(হে রাসূল!) আপনি জানেন না আপনার পরে এরা কী সব কাজ করেছিল।'"[১]

ইব্নে মাস্'উদ্ থেকে এ হাদীসের শেষাংশ শব্দগত পরিবর্তন সহকারে নিম্নোক্তভাবেও বর্ণিত হয়েছে : '(হে রাসূল!) আমি আপনাকে হেফাযত করে রাখছি, যদিও তারা প্রজাপতির ন্যায় আগুনে পড়ে যাচ্ছে।'

তির্মিযী বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরশাদ করেন : (আহলে বাইতের অনুসারীমতের দিনে) আমার সাহাবীদের মধ্য থেকে একদলকে ডান দিকে ও একদলকে বাম দিকে নিয়ে যাবে। তখন আমি বলব : 'হে আমার রব! আমার সাহাবিগণ (আমার সাহাবীদের দয়া করো)।' তখন বলা হবে : '(হে রাসূল!) আপনি জানেন না আপনার পরে এরা কী সব কাজ করেছিল! আপনি যখন তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যান তখন তারা তাদের অতীতে ফিরে যায় (মুরতাদ হয়ে যায়)।' [রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরশাদ করেন :] সুতরাং আমি সে কথাই বলব যা তাঁর নেককার বান্দা বলেছেন (তা হচ্ছে) : 'তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তো (দিতে পারো, কারণ,) তারা তোমারই বান্দা।'[২]

এ হাদীসটিই মুসলিম এক সনদসূত্রে আয়েশা থেকে নিম্নোক্তরূপে উল্লেখ করেছেন : 'তোমরা যাতে আমার সামনে এসে হাযির হও সে লক্ষ্যে আমি হাউযের পাশে তোমাদের জন্য অপেক্ষায় থাকব। আল্লাহ্র শপথ, কতক লোক আমার থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং তখন আমি বলব : 'হে আমার রব!...।' মুসলিম এর অনুরূপ আরেকটি হাদীস উম্মে সালামাহ্ থেকে উদ্ধৃত করেছেন।[৩]

এ বিষয়ে আরো অনেক দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করা যায়, কিন্তু আরো বেশি দৃষ্টান্তের উল্লেখ হয়তো আলোচনাটিকে বিরক্তিকর পর্যায়ে উপনীত করবে। এ কারণে সাহাবীদের সকলেরই 'আদেল হওয়ার দাবি প্রত্যাখ্যানের জন্য এ পর্যন্ত যা উল্লেখ করা হলো তা-ই যথেষ্ট বলে মনে করি।

প্রকৃত ব্যাপার হলো এই যে, সাহাবী হওয়া বিরাট ফযীলতের ব্যাপার হলেও কেবল সাহাবী হওয়াই কারো জন্য নিষ্পাপত্ব আনয়নকারী নয়। সুতরাং সাহাবীদের মধ্যে একদিকে যেমন অনেক বুযুর্গ ব্যক্তি, অলি-আল্লাহ্ ও সিদ্দীক ছিলেন– যাঁরা ছিলেন উম্মাতের আলেম ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীসের বর্ণনাকারী, অন্যদিকে একদল ছিলেন অজ্ঞাতপরিচয়, তেমনি কতক ছিল মুনাফিক ও গুনাহ্গার। নিম্নোক্ত আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে, এরশাদ হয়েছে :

---

১. প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩১।
২. *ছ্বাহীহ্ তির্মিযী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭।
৩. *ছ্বাহীহ্ মুস্লিম্*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৫-৬৬।

مُرَدُوا۟ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾

'আর (হে রাসূল!) আপনার চারপাশে যাযাবর আরবদের মধ্যে মুনাফিক রয়েছে এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও রয়েছে– যারা নেফাকের ব্যাপারে খুবই কঠোর। আপনি তাদেরকে চিনেন না, আমি তাদেরকে চিনি। আমি অচিরেই তাদেরকে দুই বার শাস্তি দেব, অতঃপর তাদেরকে বিরাট শাস্তির কবলে নিক্ষেপ করব।'[১]

সাহাবীদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে মানসিকভাবে কষ্ট দিত। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

أَلِيمٌ عَذَابٌ لَهُمْ ٱللَّهِ رَسُولَ يُؤْذُونَ وَٱلَّذِينَ ﴿٦١﴾

'আর যারা আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'[২]

আমরা এ ধরনের লোকদের কাছ থেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ্ চাই এবং এদের সাথে সম্পর্কহীনতা কামনা করছি, তেমনি আল্লাহ্র কাছে পানাহ্ চাই ও সম্পর্কহীনতা কামনা করি সেই লোকদের থেকে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন :

مُّهِينٌ عَذَابٌ فَلَهُمْ ٱللَّهِ سَبِيلِ عَن فَصَدُّوا۟ جُنَّةً أَيْمَـٰنَهُمْ ٱتَّخَذُوٓا۟ ﴿١٦﴾

'তারা তাদের শপথসমূহকে ঢালরূপে গ্রহণ করেছে, অতঃপর তারা (লোকদেরকে) আল্লাহ্র পথ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে। অতএব, তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।'[৩]

তেমনি আমরা আল্লাহ্র কাছে পানাহ্ চাই ও সম্পর্কহীনতা কামনা করি সেই লোকদের থেকে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন :

১. সূরা আত্-তাওবাহ্ : ১০১।
২. সূরা আত্-তাওবাহ্ : ৬১।
৩. সূরা আল্-মুজাদিলাহ্ : ১৬।

﴿إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا﴾

'অবশ্যই মুনাফিকরা আল্লাহ্‌কে প্রতারণা করে, কিন্তু (প্রকৃতপক্ষে) তিনি তাদেরকে প্রতারিত করবেন, আর তারা যখন নামাযের উদ্দেশ্যে দাঁড়ায় তখন তারা কেবল লোকদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে গড়িমসির সাথে (নামাযে) দাঁড়ায়, আর তারা আল্লাহ্‌কে খুব কমই স্মরণ করে থাকে। তারা এর (মু'মিন ও কাফের এই দুই গোষ্ঠীর) মাঝে দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে– না এদের দিকে, না ওদের দিকে। আর আল্লাহ্ যাদেরকে গোমরাহ্ করেন আপনি কখনোই তাদের (মুক্তির) জন্য কোনো পথ পাবেন না।'[১]

আল্লাহ্‌র কিতাব সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছে যে, একদল লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কথা কান দিয়ে শুনত, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরসমূহে মোহর মেরে দেন। কারণ, তারা তাদের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার পিছনে লেগে ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

﴿وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰٓ إِذَا خَرَجُوا۟ مِنْ عِندِكَ قَالُوا۟ لِلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُمْ﴾

"আর তাদের (মুনাফিকদের মধ্যে) এমন লোকেরা আছে যারা (বাহ্যত) আপনার কথা শ্রবণ করে, কিন্তু আপনার সামনে থেকে বেরিয়ে যাবার পর, যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদেরকে বলে : 'এইমাত্র কী বলল?' এরা হচ্ছে এমন লোক আল্লাহ্ যাদের অন্তরসমূহে মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে।"[২]

তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা একদল লোককে সুস্পষ্ট ভাষায় লা'নত্ করেছেন। কারণ, তাদের অন্তরসমূহ ব্যাধিগ্রস্ত এবং তারা ধরণীর বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করছে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

১. সূরা আন্-নিসা' : ১৪২-১৪৩।
২. সূরা মুহাম্মাদ : ১৬।

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ ۝ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا۟ أَرْحَامَكُمْ ۝ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰٓ أَبْصَٰرَهُمْ ۝ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ﴾

'এরা হচ্ছে সেই লোক যাদেরকে আল্লাহ্ লা'নত্ করেছেন এবং তাদের (অন্তরের) কর্ণসমূহকে বধির ও (অন্তরের) চক্ষুসমূহকে অন্ধ করে দিয়েছেন। অতঃপর তারা কি কোরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে না? তাহলে তাদের অন্তরসমূহ কি তালাবদ্ধ হয়েছে?'[১]

প্রশ্ন হচ্ছে, হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর ওফাতের পরে এই লোকগুলো কোথায় গেল? যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে অনবরত দুঃখ-কষ্ট দিয়েছে এবং তাঁর জন্য জীবনকে সঙ্কীর্ণ ও কঠিন করে তোলার চেষ্টা করেছে তাঁর ওফাতের পর পরই কি তাদের নেফাক ঈমানে পরিণত হয়ে গিয়েছিল এবং তারা ফিত্না-ফ্যাসাদ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছিল ও নেক বান্দায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল? অতঃপর তারা কি সেই সাহাবিগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল যারা তাকওয়া, পবিত্রতা, নৈতিকতা, জ্ঞান, ভদ্রতা-নম্রতা ও ন্যায়পরায়ণতায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্র রাস্তায় ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন? তারা কি সেই ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল যাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন :

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ﴾

'নিঃসন্দেহে মু'মিন হচ্ছে তারা যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর (এ ব্যাপারে) কোনোরূপ সংশয়ে নিপতিত হয় নি এবং স্বীয় ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্র পথে চেষ্টাসাধনা করেছে। এরাই হচ্ছে (স্বীয় ঈমানের দাবির ব্যাপারে) সত্যবাদী।'[২]

অতএব, আমরা আমাদের এতদ্সংক্রান্ত 'আক্বীদা পরিত্যাগ করব না এবং সত্য ও প্রকৃত অবস্থার বিরোধিতা করব না। যেসব সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি নিষ্ঠাবান ও অনুগত ছিলেন, স্বীয় দাবির ব্যাপারে সত্যবাদী ছিলেন ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন–যেসব গুণ সহকারে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল তাঁদের কথা উল্লেখ করেছেন–আমরা কেবল তাঁদেরই অনুসরণ করি এবং যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সেই মুনাফিকদের ওপর আস্থা রাখি না; কারণ, আমরা যদি এর

১. সূরা মুহাম্মাদ্ : ২৩-২৪।
২. সূরা আল্-হুজুরাত্ : ১৫।

অন্যথা করতাম তাহলে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হতো। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে দুশমনী করেছিল তাদেরকে আমরা পছন্দ করি না এবং তাদের প্রতি সম্মান ও মহব্বত প্রকাশ করি না, আর তাদের ওপর আস্থাও রাখি না। এটাই হচ্ছে সঠিক কথা এবং এটাই অনুসরণের উপযোগী।

সাহাবী কে?

সাহাবীর সংজ্ঞার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, যে কোনো মুসলমান রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহচর্য পেয়েছেন অথবা তাঁকে দেখেছেন তিনিই সাহাবী। বুখারী তাঁর *সহীহ* গ্রন্থে এ মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর আগে তাঁর ওস্তাদ আলী বিন্ আল্-মাদীনী-ও এ সংজ্ঞায় আস্থা পোষণ করতেন। তিনি বলেন : 'যে কেউ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে ছিলেন এবং তাঁকে কোনো একদিন কেবল সামান্য সময়ের জন্য দেখেছেন তিনিই সাহাবী।'[১]

এ সংজ্ঞা তাদের বেলায়ও প্রযোজ্য যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে বা তার পরে মুরতাদ্ হয়ে গিয়েছিল। তেমনি যে কেউ তাঁকে দেখেছে, যদিও কিছু বুঝতে পারে নি, তার বেলায়ও এটি প্রযোজ্য। কিন্তু বিচারবুদ্ধি ('আকল্) ও বিবেক এ সংজ্ঞা গ্রহণ করে না। কেউ মুরতাদ হলে তার সমস্ত নেক আমল বরবাদ হয়ে যায় এবং এরপর আর তাকে সাহাবী বলে গণ্য করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। এ ব্যাপারে আবূ হানীফা সতর্কতার নীতি অনুসরণ করেছেন[২] এবং শাফে'ঈ তাঁর *আল্-উম্ম্* গ্রন্থে এটি সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন।[৩]

যায়নুল্ 'ইরাক্বী বলেন : 'সাহাবী হচ্ছেন এমন মুসলমান, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে যার সাক্ষাৎ হয়েছে এবং এরপর মুসলমান অবস্থায়ই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।' সা'ঈদ্ বিন্ মুসাইয়্যেব্ বলেন : 'যে কেউ এক বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহচর্যে ছিলেন বা তাঁর সাথে থেকে একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তিনিই সাহাবী।'[৪]

এ (শেষোক্ত) সংজ্ঞাটি গ্রহণযোগ্য হয় নি। কারণ, এ সংজ্ঞা বহু লোককে সাহাবীর কাতার থেকে বহির্ভূত করে। কারণ, এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা ঐ পরিমাণ সময়ের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহচর্যে ছিলেন না বা তাঁর সাথে থেকে যুদ্ধ করেন নি। ইব্নে হাজার্ বলেন : 'এ উক্তিটির কোনো আমলী ভিত্তি নেই।'[৫]

---

১. *আয্ওয়া' 'আলা সুন্নাতিল্ মুহাম্মাদীয়াহ্*,পৃ. ৩৪১।
২. *শার্হুল্ ক্বোব্বাতিল্ 'ইরাক্বী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪।
৩. *আল্-উম্ম্*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৫-২১৬; *শার্হুল্ ক্বোব্বাতিল্ 'ইরাক্বী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪।
৪. *শার্হুল্ ক্বোব্বাতিল্ 'ইরাক্বী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮।
৫. *আল্-মাওয়াহেব*, শার্হে যার্ক্বানী, পৃ. ৮-২৬।

অন্যদিকে ইব্নে হাজেব্ 'আম্র্ বিন্ ইয়াহ্ইয়া থেকে একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন যাতে বলা হয়েছে যে, সাহাবী হওয়ার শর্ত হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুদীর্ঘ সাহচর্য ও তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ।[১]

কেউ কেউ এমন ব্যক্তিদেরকেও সাহাবী হিসেবে গণ্য করেছেন যাঁরা তাঁদের মুসলমানিত্বের যুগে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে মোটেই দেখেন নি বা দেখলেও খুবই কম সময়ের জন্য দেখেছেন।

সংজ্ঞা ও উক্তির বিভিন্নতা সত্ত্বেও সাহাবী বলতে সেই মুসলমানকে বুঝায় যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে কোনো কথা শুনেছেন বা তাঁকে দেখেছেন। আহ্লে সুন্নাতের দৃষ্টিতে তাঁদের সকলেই 'আদেল্ এবং তাঁদের যে কেউ যে কাজই করেছেন তা-ই জায়েয ছিল, কারণ, তা তিনি ইজ্তিহাদের[২] ভিত্তিতেই করেছিলেন।

এটাই হচ্ছে মতপার্থক্যের মূল বিষয়। কারণ, আহলে বাইতের অনুসারীরা এ দাবি গ্রহণ করে না। আমরা কেবল তাঁদেরকেই 'আদেল্ বলে মনে করি যাদের আমল 'আদালাত্ (সুবিচার, ন্যায়নীতি ও ভারসাম্য)-এর মানদণ্ডে উৎরে যায়; দলিল-প্রমাণ ছাড়া যে কোনো সাহাবীকে 'আদেল্ বলে প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

---

১. *শার্হুল্ ক্বোব্বাতিল্ 'ইরাক্বী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২।

২. সাহাবীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ যে কোরআন্-সুন্নাহ্র বরখেলাফে কোনো কোনো কাজ করেছেন তাকে 'ইজ্তিহাদ্' বলে বৈধতা দেয়ার বিষয়টি ইতিপূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে।
এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, পারিভাষিকভাবে ইজ্তিহাদ্ বলতে যা বুঝায় তার সাথে এ ধরনের কথিত ইজ্তিহাদের কোনো সম্পর্কই নেই। কারণ, পারিভাষিকভাবে ইজ্তিহাদ্ মানে কোনো প্রশ্নের জবাব কোরআন-সুন্নায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান এবং সুস্পষ্ট জবাবের অনুপস্থিতিতে অস্পষ্ট বা পরোক্ষ জবাবকে সুস্পষ্টকরণ তথা এ সম্পর্কে বিধানদাতার রায়ে উপনীত হওয়া; এমনকি আহ্লে সুন্নাতের সংজ্ঞা (যাতে কোরআন-সুন্নাহয় সব প্রশ্নের জবাব নেই ধরে নেয়ার কারণে ক্বিয়াসের আশ্রয় নেয়া হয়) অনুযায়ীও কোরআন-সুন্নাহ্র বহির্ভূত অন্যান্য পন্থার আশ্রয় নেয়া হবে কেবল কোরআন-সুন্নাহয় গভীরভাবে অনুসন্ধানের পরে; এরূপ অনুসন্ধান ব্যতিরেকে বা কোরআন-সুন্নায় সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হুকুমের বরখেলাফে কোনো কাজই ইজ্তিহাদ বলে গণ্য হতে পারে না। অথচ অনেক সাহাবী যেখানে কোরআন-সুন্নাহ্র জ্ঞানে যথাযথ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, অন্যদিকে কেউ কেউ বিতর্কাতীত বিধানের বরখেলাফেও কাজ করেছেন। যেমন : বিনা অনুমতিতে দেয়াল টপকে কারো গৃহে প্রবেশ করেছেন, অপরাধীকে শারী'আত্ নির্ধারিত শাস্তির চেয়ে বেশি শাস্তি দিয়েছেন, খলীফার অনুকূলে কৃত বাই'আত্ ভঙ্গ করেছেন ইত্যাদি। এমনকি তাঁদের কারো কারো সিদ্ধান্ত হাজার হাজার সাহাবীর নিহত হওয়ার কারণ হয়েছে। কোরআন-সুন্নাহ্র যথেষ্ট জ্ঞান ও তাতে যথেষ্ট অনুসন্ধান ব্যতীত কোনো বিষয়ে রায় দেয়া বা কোরআন-সুন্নাহ্র অকাট্য বিধানের বরখেলাফে রায় দেয়াকে যদি ইজ্তিহাদ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং তাকে জায়েয বলে স্বীকার করা হয় তাহলে এমন কোনো মুসলমান পাওয়া যাবে না যে মুজ্তাহিদ নয় এবং এর ফলে ইসলামের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।– অনুবাদক

সুতরাং এ ব্যক্তিদের মধ্যে যারা বিকৃত পথ অবলম্বন করেছিল ও হেদায়াত থেকে বিচ্যুত হয়েছিল আহলে বাইতের অনুসারীরা কোনোরূপ অন্ধ বিদ্বেষ ব্যতীত সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে তাদের আমল ও আচরণের সমালোচনা করে থাকে এবং তাদের প্রত্যেকের কর্ম ও আচরণের মানদণ্ডে তাকে মূল্যায়ন করে থাকে। এ কারণেই যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করেছিল এবং ইসলামকে কেবল জীবন বাঁচাবার জন্য ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিল আহলে বাইতের অনুসারীরা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট।

আহলে বাইতের অনুসারীরা এ 'আক্বীদা গ্রহণ করে সাহাবীদেরকে চেনার ক্ষেত্রে আল্লাহ্র কিতাব, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নাত ও সাল্ফে সালেহীনের মোটেই বিরোধিতা করে নি। প্রকৃতপক্ষে ঐ সাহাবীই যথার্থভাবে সাহাবী নামের উপযুক্ত যাঁর ভিতর ও বাহির ছিল একই রকম এবং কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল। এ ধরনের ব্যক্তির ঈমান জাহেলী চিন্তা-চেতনার মোকাবিলায় এক অভেদ্য প্রাচীরস্বরূপ এবং তিনি সব সময়ই নিষ্ঠার সাথে স্বীয় ঈমান-'আক্বীদার অনুসরণ করেন। আহলে বাইতের অনুসারীরা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ফয়সালার ক্ষেত্রে ও তাঁদের মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে মানবিক প্রকৃতির বিধিবিধানকে প্রভাববিহীন বলে মনে করে না।

এর ভিত্তিতেই আহলে বাইতের অনুসারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ ও দাবি উত্থাপন করা হয়। কিন্তু সামান্য পরিমাণেও যদি ন্যায়নীতির ভিত্তিতে চিন্তা করা হতো তাহলে কখনোই এ ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হতো না এবং বিতর্কের সমাধান হয়ে যেত।

আহলে বাইতের অনুসারীদের সম্বন্ধে অপর যে অলীক ধারণাটি প্রচার করা হয়েছে তা এই যে, তারা সাহাবীদের অবমাননা করে ও তাঁদের দোষারোপ করে। অথচ আহলে বাইতের অনুসারীদের বীজ বপনই হয়েছিল সাহাবীদের মধ্যে এবং এ মাযহাবের বীর নায়কগণ ও এর প্রতি প্রথম দাও'আত্কারিগণ সুদৃঢ় ঈমানের জন্য খ্যাত মহান সাহাবিগণ– যাঁরা হযরত আলী ইব্নে আবী তালেব (আ.)-এর বেলায়াত স্বীকার করেছিলেন এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। (পরবর্তীতে তাঁদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।)

আহলে বাইতের অনুসারীরা ঈমানের মানদণ্ড ও আধ্যাত্মিক পন্থার বিরোধিতা করে বলে যে অভিযোগ করা হয় এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার। কারণ, আহলে বাইতের অনুসারীরা সব সময়ই সাহাবীদের মর্যাদার হেফাযত করার জন্য এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহচর্যের মর্যাদা যাতে বিনষ্ট না হয় সে জন্য চেষ্টা চালিয়ে আসছে। আহলে বাইতের অনুসারী-বিরোধী আলেমরা যদি তাঁদের অন্ধ মাযহাবী বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে বিচারবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তার আলোকে দেখার চেষ্টা করেন তাহলে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবেন যে, এ ক্ষেত্রে আহলে বাইতের অনুসারীরা এমন একটি আদর্শ উপস্থাপন করেছে আহ্লে সুন্নাতের অনেক মনীষী আলেম যা গ্রহণ করে নিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, ইব্নে 'উইয়াইনাহ্ বলেন : 'আমি সাহাবিগণ ও ইব্নে মুবারাকের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিলাম।

আমি তাঁদের মধ্যে একমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহচর্য ও তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ ব্যতীত ইব্নে মুবারাকের তুলনায় আর কোনো ফযীলত্ দেখতে পাই নি।'[১]

সাহাবীদের প্রতি আহলে বাইতের অনুসারীদের ভালোবাসা

হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর সাহাবিগণ– যাঁরা দ্বীনের সহায়তার লক্ষ্যে ইখলাসের সাথে চেষ্টাসাধনা করেছেন এবং এ পথে স্বীয় জান ও মাল উৎসর্গ করেছেন, আহলে বাইতের অনুসারীরা তাঁদের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা পোষণ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীদের জন্য তারা যে দো'আ করে থাকে তা অকাট্যভাবে সাহাবীদের প্রতি তাদের সীমাহীন আন্তরিক ভালোবাসারই প্রমাণ বহন করে।

বস্তুত আহলে বাইতের অনুসারীরা সমস্ত নবী-রাসূলের অনুসারীদের জন্য, বিশেষ করে হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর সাহাবীদের জন্য দো'আ করে থাকে, আর তারা এ দো'আগুলো তাদের ইমামগণের (আ.) কাছ থেকে শিক্ষা করেছে। এ সব দো'আর মধ্যে সবচেয়ে মশ্হূর্ হচ্ছে 'যাবূরে আলে মুহাম্মাদ' নামে বিখ্যাত *সহীফায়ে সাজ্জাদীয়াহ্* গ্রন্থে সন্নিবেশিত হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর দো'আসমূহ। যেমন, এর মধ্যকার একটি দো'আয় বলা হয়েছে :

'হে আল্লাহ্! নবী-রাসূলগণের অনুসারিগণ এবং যারা তাঁদেরকে না দেখেও সত্য বলে স্বীকার করেছেন–যে সময়ে একগুঁয়ে লোকেরা তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে–তাঁরা যে কোনো যুগেই অত্যন্ত আগ্রহ-উদ্দীপনা সহকারে এবং সত্যিকারের ঈমান সহকারে নবী-রাসূলগণের দিকে ছুটে এসেছেন। আর তুমি একজন রাসূল পাঠিয়েছ এবং তাদের জন্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করেছ। আদমের যুগ থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত– যাঁরা ছিলেন হেদায়াতের ইমাম ও মুত্তাকীদের নেতা; তাঁদের সকলের প্রতি সালাম ও দরূদ বর্ষিত হোক এবং তুমি মাগ্ফেরাত ও সন্তুষ্টি সহকারে তাঁদেরকে স্মরণ করো।'

'হে আল্লাহ্! বিশেষ করে মুহাম্মাদ (সা.)-এর সাহাবিগণ– যাঁরা উত্তমরূপে তাঁর সাথে ছিলেন, তাঁর সাহায্যার্থে কঠিনভাবে চেষ্টাসাধনা করেছেন, তাঁকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন ও তাঁর দিকে ছুটে গিয়েছেন, তাঁর দাও'আত্ গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাগামী হয়েছেন, তাঁর রিসালাতের প্রমাণ পাওয়ার সাথে সাথেই তা গ্রহণ করে নিয়েছেন, তাঁর কথাকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে স্বীয় স্ত্রী ও সন্তানের সাথেও সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, তাঁর নবুওয়াতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে স্বীয় পিতা ও সন্তানের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছেন, তাঁকে সহায়তা করেছেন, ...আর যাঁদেরকে তাঁদের পরিবারবর্গ তাঁদের ঈমানের কারণে বিতাড়িত করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে ঘনিষ্ঠতার কারণে যাঁদের সাথে তাঁদের আত্মীয়-স্বজন সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। অতএব, হে আল্লাহ্! তাঁরা তোমার পথে ও তোমার জন্য যা পরিত্যাগ করেছেন তা উপেক্ষা করো না, তাঁদেরকে স্বীয় সন্তুষ্টি দ্বারা সন্তুষ্ট করো, কারণ, তাঁরা লোকদেরকে তোমার দিকে আহ্বান করেছেন এবং তোমার

১. *ছাফ্ওয়াতুছ্ ছাফওয়াহ্*, ইবনুল্ জাওযী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১২।

রাসূলের সাথে থেকে ইখলাসের সাথে তোমার দিকে (লোকদেরকে) আহ্বান করেছেন। যেহেতু তাঁরা এরপর তোমার কারণে স্বীয় জন্মভূমি থেকে হিজরত করেছেন এবং তোমারই কারণে আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করে কঠিন যিন্দেগী বেছে নিয়েছেন সেহেতু তুমি তাঁদের শুভ প্রতিদান প্রদান করো।'[১]

এরা হলেন হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর সেই সাহাবিগণ, আহলে বাইতের অনুসারীদের অনুসারিগণ যাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে, স্বীয় অন্তঃকরণে যাঁদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে এবং সঠিক পন্থায় তাঁদের কাছ থেকে ইসলামের শিক্ষা এসেছে; তারা তা আয়ত্ত করে থাকে।

বস্তুত রাজনৈতিক খেলা, মতানৈক্যের অগ্নিকে উত্তপ্ততর করা ও মাযহাবী দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছে; এ সবের নায়করা 'দলে দলে বিভক্ত করো ও শাসন করো' নীতির অনুসরণ করে ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতা স্থায়ীকরণ এবং হুকুমতে স্বীয় প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে অপচেষ্টা চালিয়ে এসেছে।

সেই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাবলির যুগের সমাপ্তি ঘটেছে। এখন আমরা এমন একটি যুগে বসবাস করছি যা চিন্তা-গবেষণা, বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ ও অগ্রগতির যুগ। প্রশ্ন হচ্ছে, এ যুগের অধিবাসী আমাদের জন্য কি অন্ধ বিদ্বেষের ঢোল পিটানো অব্যাহত রাখা শোভনীয়? আমাদের জন্য পুনরায় মাযহাবী যুদ্ধের সূচনা করা, প্রকৃত বিষয়গুলো থেকে দূরে সরে থাকা এবং ইসলামের যে দুশমনরা আমাদের দ্বীনের মধ্যে সংশয় সৃষ্টির ও এর ওপরে বিকৃত 'আক্বীদা-বিশ্বাস চাপিয়ে দিতে তৎপর তাদের মোকাবিলায় স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে গাফেল থাকা কি সঙ্গত? এটাই কি অধিকতর পছন্দনীয় নয় যে, আমরা জ্ঞানহীন লোকদের মতামত ও অন্তঃসারশূন্য অভিযোগসমূহ কাজে লাগাব না এবং আহলে বাইতের অনুসারীদের ব্যাপারে সত্যের প্রতি দৃষ্টি দেব?

এটি সন্দেহাতীত যে, আহলে বাইতের অনুসারীরা সমস্ত সাহাবীর অবমাননা করে ও তাঁদের সকলকে কাফের গণ্য করে বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন একটি অভিযোগ যার সপক্ষে কোনোই গ্রহণযোগ্য দলিল-প্রমাণ নেই। জাহেলী চিন্তা-চেতনার প্রভাব, অন্ধ মাযহাবী বিদ্বেষ ও স্রেফ কল্পকাহিনী রচনার প্রবণতা থেকে এ ধরনের অভিযোগ তৈরি করা হয়েছে।

কোরআন-সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে সাহাবিগণ

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আহলে বাইতের অনুসারীরা যে সাহাবীদেরকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে গণ্য করে না– এ ক্ষেত্রে কি তারা কোরআন ও সুন্নাহ্‌র সীমারেখা বহির্ভূত কোনো আচরণ করেছে? কোনো সাহাবী যদি শারী'আত্-বিরোধী কোনো কাজ করেন সে ক্ষেত্রে তাঁর সপক্ষে ছাফাই গাওয়া বা শার'ঈ বিধানের তা'ভীল্ করার কোনো সুযোগ আছে কি?

---

১. *সাহীফায়ে সাজ্জাদীয়াহ্*, পৃ. ২৩-২৪।

এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই যে, কোনো ব্যক্তির সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মানে এ নয় যে, শারী'আত্-বিরোধী যে কোনো কাজ করার জন্যই তিনি স্বাধীন। আর নাছ্ (কোরআন-সুন্নাহ্র সুস্পষ্ট বক্তব্য)-এর মোকাবিলায় ইজ্তিহাদ করা হলে তার পরিণতি হচ্ছে কোরআনের আহ্কামকে পাশে সরিয়ে রাখা।

বস্তুত অনেক সাহাবীই এমন ছিলেন যে, তাঁরা অল্প দিন আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তখনো তাঁদের মধ্যে অতীতের অভ্যাস, রীতিনীতি ও আচার-আচরণ রয়ে গিয়েছিল এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে সেসব থেকে মুক্ত হওয়া তাঁদের পক্ষে খুবই কঠিন ছিল। তাই তাঁদেরকে সেই সব সাহাবীর সমতুল্য গণ্য করা কোনোভাবেই যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়নীতিভিত্তিক কাজ হতে পারে না যেসব সাহাবী অনেক আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন– ঈমান যাঁদের অন্তরে গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছিল এবং যাঁরা ইসলামের প্রসার ঘটিয়েছিলেন, সুবিচারের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন, আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্র রাস্তায় জান-মাল বিনিয়োজিত করেছিলেন ও খালেস ঈমান সহকারে হিজরত করেছিলেন।

হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) এরশাদ করেন : 'আমল নিয়্যতের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রত্যেককে তার নিয়্যতের ভিত্তিতে পরিমাপ করা হবে। যার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে ছিল তার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে বলে গণ্য হবে এবং যার হিজরত কোনো পার্থিব উদ্দেশ্যে বা কোনো নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে ছিল তার হিজরত সে উদ্দেশ্যে বলে গণ্য হবে।'[১]

একদল সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে প্রশ্ন করেন : 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের জাহেলীয়্যাতের যুগের কতক কাজের জন্য কি আমাদেরকে পাকড়াও করা হবে?' তিনি জবাব দিলেন : 'যে কেউ তার ইসলামী যিন্দেগীতে ভালো আমল করবে তার সে আমলের কারণে জাহেলীয়্যাতের আমলের জন্য পাকড়াও করা থেকে তাকে রেহাই দেয়া হবে। আর যে কেউ তার ইসলামী যিন্দেগীতে অপছন্দনীয় কাজ করবে তাকে যেমন তার জাহেলীয়্যাত্ যুগের কাজের জন্য তেমনি তার ইসলামী যুগের কাজের জন্য পাকড়াও করা হবে।'[২]

সুহাইব থেকে মার্ফূ' রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরশাদ করেন : 'যে কেউ কোরআনের হারামকে হালাল গণ্য করে সে কোরআনে ঈমান পোষণ করে না।'[৩]

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার বলেন : "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মিম্বারে উঠে উচ্চৈঃস্বরে বলেন : 'হে লোকসকল! তোমরা যারা মুখে ঈমান এনেছ, কিন্তু ঈমান তোমাদের অন্তরসমূহে প্রবেশ

১. *ছ্বাহীহ্ মুস্লিম্*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৮।
২. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৭।
৩. *ছ্বাহীহ্ তির্মিযী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫১।

করে নি, তোমরা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিয়ো না, তাদেরকে তিরস্কার করো না এবং তাদের ত্রুটি খুঁজে বেড়িয়ো না। যে কেউ তার মুসলমান ভাইয়ের দোষ খুঁজে বেড়াবে আল্লাহ্ তার দোষ ধরবেন। আর আল্লাহ্ যার দোষ ধরবেন তাকে তিনি লাঞ্ছিত করবেন, তা (তার সে দোষ) যতই গোপন হোক না কেন।'"[১]

অতএব, হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর হাদীস ও কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে আমল ও আহ্কামের ক্ষেত্রে সকলেই সমান এবং কেউ 'আদেল কিনা তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আমলের দ্বারা প্রমাণিত হবে; এতদ্ব্যতীত আর কোনো কিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না। অন্যদিকে ইসলামী আহ্কামের ভিত্তিতে আমলের ক্ষেত্রে সাহাবিগণ অন্যদের তুলনায় অগ্রগণ্য হবেন এটাই স্বাভাবিক। তাই তাঁদের জন্য নিঃশর্তভাবে ইজ্তিহাদের অধিকার প্রমাণ করা যেমন অসম্ভব, তেমনি কোরআন-সুন্নাহ্র মোকাবিলায় তার কোনো কার্যকরতা থাকতে পারে না। নাছ্-এর মোকাবিলায় কারো কাজের সপক্ষে ছাফাই মানে ইসলামী আহ্কামকে পাশে ঠেলে রাখা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অতএব, আয়াত ও হাদীস থেকে তার বাহ্যিক তাৎপর্যের বরখেলাফে অর্থ গ্রহণ করা এবং তার ভিত্তিতে বাহ্যিক তাৎপর্যের বরখেলাফে আমল করার ক্ষেত্রে নিজেকে স্বাধীন মনে করা কোনোভাবেই জায়েয হতে পারে না। আহ্কাম সকল মানুষের জন্য দেয়া হয়েছে এবং তা এড়িয়ে যাওয়ার অধিকার কারোই নেই।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী ইবনে আবী ত্বালেব (আ.) প্রথম তিন খলীফার যুগে ও তাঁর নিজের খেলাফতের যুগে যে নীতি অনুসরণ করেন তা থেকে ও এসব যুগে তাঁর সীরাত থেকে আমাদের দাবি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

হযরত আলী (আ.) আল্লাহ্র দেয়া শাস্তির বিধান নির্বিশেষে সকল অপরাধীর জন্যই কার্যকর করতেন এবং প্রত্যেকের সাথে তার আচরণের ভিত্তিতে আচরণ করতেন। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে যার যতখানি মর্যাদা হযরত আলী (আ.) তাকে ততখানি সম্মান ও মূল্যায়ন করতেন।

এমন ঘটনাও বহু ঘটেছে যে, নিজেদের জন্য সাহাবী পরিচয় ব্যবহারকারী অনেক লোক আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নাতের বিরোধিতা করায় এবং তাঁর [হযরত আলী (আ.)-এর] বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করায় তিনি তাদের বিরুদ্ধে লা'নত্ বর্ষণ করতেন, আনুষ্ঠানিকভাবেই তাদের সাথে স্বীয় সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করতেন এবং মিম্বারে বসে তাদেরকে তিরস্কার করতেন। কারণ, তারা আল্লাহ্র ও আল্লাহ্র রাসূলের হুকুমের বিরোধিতা করত।

হযরত আলী (আ.) তাঁর সেনাপতিদের ও প্রাদেশিক আমীরদের উদ্দেশে যেসব নির্দেশনামা লিখেছিলেন তা থেকে অত্যন্ত ভালোভাবেই এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে,

১. *ছ্বাহীহ্ তির্মিযী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৫।

তিনি সামগ্রিকভাবে সমস্ত সাহাবীকে–গুনাহ্গার ও নাফরমানদের সহ–'আদেল গণ্য করার নীতি মানতেন না।

অত্র সীমিত পরিসরে হযরত আলী (আ.)-এর সীরাত সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমাদের এ আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যে, আল্লাহ্ যা কিছু হারাম করেছেন তা থেকে বিরত থাকা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হেদায়াত অনুযায়ী আচরণ করা এবং নিজেদের জন্য নাছ্-এর তা'ভীল্ করার ও ছাফাই তৈরি করার দরজা উন্মুক্ত না করা সমস্ত সাহাবীর জন্যই অপরিহার্য ছিল। কারণ, ইজতিহাদের বিভিন্ন শর্ত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুদামাহর ঘটনা আমাদের দাবির সপক্ষে সর্বোত্তম ও সবচেয়ে বড় প্রমাণ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

কুদামাহ্ বিন্ মায্'উন্

কুদামাহ্ বিন্ মায্'উন্ বিন্ হাবীব্ (ওফাত ৩৬ হিজরি) প্রথম যুগের মুসলমানদের অন্যতম ও দুই দফা হিজরতকারী। খলীফা উমর্ বিন্ খাত্ত্বাব তাঁকে বাহরাইনের আমীর নিয়োগ করেন।

কিছুদিন পর জারূদ্ সাইয়্যেদ আব্দুল্ ক্বায়স্ বাহরাইন থেকে মদীনায় আসেন এবং উমর বিন খাত্ত্বাব-এর কাছে গিয়ে এ মর্মে সাক্ষ্য দেন যে, কুদামাহ্ মদ পান করেছিলেন ও মাতাল হয়েছিলেন। উমর জিজ্ঞেস করলেন : 'তোমার সাথে আর কে সাক্ষ্য দেবে?' তিনি বললেন : 'আবূ হুরাইরাহ্।'

উমর আবূ হুরাইরাহকে জিজ্ঞেস করলেন : 'তুমি কিসের সাক্ষ্য দিচ্ছ?' আবূ হুরাইরাহ্ বললেন : 'আমি তাকে মদ পান করতে দেখি নি, তবে আমি তাকে মাতাল অবস্থায় বমি করতে দেখেছি।' উমর বললেন : 'তুমি সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সতর্ক।'

এরপর উমর বাহরাইন থেকে মদীনায় ফিরে আসার জন্য কুদামাহ্কে পত্র লিখলেন। কুদামাহ্ মদীনায় এলেন এবং উমরের কাছে গেলেন। জারূদ 'উমরকে বললেন : 'তার ওপর শার'ঈ শাস্তি প্রয়োগ করুন।' জবাবে উমর বললেন : 'তুমি তার দুশমন, নাকি সাক্ষী?' তিনি জবাব দিলেন : 'আমি শুধু সাক্ষী।' উমর তাঁকে বললেন : 'ব্যস, তুমি তোমার সাক্ষ্য দিয়েছ।'

জারূদ পরদিন পুনরায় উমরের কাছে এলেন এবং বললেন : 'তার ওপরে ঐশী শাস্তি প্রয়োগ করুন।' উমর তাঁকে বললেন : 'বাহ্যত মনে হচ্ছে তুমি তার দুশমন। কিন্তু তোমার সাথে মাত্র একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছে।' জারূদ বললেন : 'আপনাকে আল্লাহ্র কসম দিচ্ছি।' উমর তাঁকে বললেন : 'তোমার যবানকে নিয়ন্ত্রণ করো, নচেৎ তোমাকে শাস্তি দেব।' জবাবে তিনি বললেন : 'হে উমর! এটা ন্যায়সঙ্গত নয় যে, আপনার চাচাতো ভাই মদ পান করে, অথচ আপনি আমাকে শাস্তি দেবেন।' তখন আবূ হুরাইরাহ্ বললেন : 'হে উমর! আপনি যদি আমাদের সাক্ষ্যে সন্দেহ পোষণ করেন তাহলে কুদামাহ্র স্ত্রী বিন্তে ওয়ালীদকে জিজ্ঞেস করুন।'

তখন উমর হিন্দ বিনতে ওয়ালীদকে ডেকে আনার জন্য একজনকে পাঠালেন। তিনি আসার পর তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন। তখন উমর কুদামাহ্‌কে বললেন : 'আমি তোমার বিরুদ্ধে শার'ঈ শাস্তি কার্যকর করব।'

জবাবে কুদামাহ্ বললেন : 'তোমার বক্তব্য অনুযায়ী আমি যদি মদ পান করে থাকি তাহলে সে জন্য তুমি আমাকে শার'ঈ শাস্তি দিতে পার না।' উমর জিজ্ঞেস করলেন : 'কেন?' কুদামাহ্ বললেন : "আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনে বলেন :

لَيْسَعَلَىٱلَّذِينَءَامَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَّٰلِحَٰتِجُنَاحٌفِيمَاطَعِمُوٓاْ

'যারা ঈমান এনেছে ও যথাযথ কার্য সম্পাদন করেছে তারা যা খেয়েছে সে জন্য কোনো গুনাহ্ নেই।'[১]/[২]

উমর তাঁর দিকে ফিরে বললেন : '(কোরআনের আয়াতের) ভুল তা'ভীল করেছ। তুমি যদি আল্লাহ্‌কে ভয় করতে তাহলে আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা থেকে দূরে থাকতে।'

এরপর উমর বিন খাত্ত্বাব উপস্থিত জনতার কাছে জিজ্ঞেস করলেন : 'কুদামাহ্‌কে চাবুক মারা সম্পর্কে তোমাদের মত কী?' সেখানে উপস্থিত সবাই বললেন : 'আমাদের মত হচ্ছে এই যে, তিনি যতক্ষণ অসুস্থ আছেন ততক্ষণ তাঁকে চাবুক মারা স্থগিত রাখুন।'

উমর বিরত থাকলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে পুনরায় একই প্রশ্ন করলেন। সবাই বললেন : 'যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর ব্যথা আছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে চাবুক মারা থেকে বিরত থাকুন।'

উমর বললেন : 'আমার ঘাড়ে এ দায়িত্ব থেকে যাওয়া অবস্থায় আমার মৃত্যু আসার তুলনায় চাবুকের আঘাতে তার মৃত্যু ঘটা আমার কাছে অধিকতর পছন্দনীয়। পুরো মাপের চাবুক নিয়ে এসো।' এরপর তিনি কুদামাহ্‌কে চাবুক মারার নির্দেশ জারি করলেন।[৩]

এই হলো কুদামাহ্‌র ঘটনা যাতে তিনি কোরআনের আয়াতের ভ্রান্ত তা'ভীল করেন এবং এরপর তাঁর ওপরে শার'ঈ শাস্তি কার্যকর করা হয়।

এ ঘটনা উল্লেখের পেছনে আমাদের উদ্দেশ্য এ নয় যে, তাঁর দ্বীনদারীর মধ্যে ত্রুটি নির্দেশ করব। তিনি হিজরত করার এবং ইসলামের আওতায় দীর্ঘকাল জীবনযাপনের অধিকারী হওয়ার ন্যায় ফযীলতের অধিকারী ছিলেন। এ ঘটনা উল্লেখের উদ্দেশ্য হচ্ছে কতক লোকের দাবির ভ্রান্তি প্রমাণ করা যারা মনে করে যে, ইজ্‌মা ও সুস্পষ্ট তাৎপর্যের বিপরীতে কোরআনের আয়াতের তা'ভীল করা সত্ত্বেও কিছু লোককে পাকড়াও করা হবে না।

---

১. সূরা আল্-মাাএদাহ্ : ৯৩।
২. এটা সুস্পষ্ট যে, এ আয়াতে ঈমান আনার পূর্বে যা খেয়েছে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে।– অনুবাদক
৩. *আল্-ইছ্বাবাতু ফী তামীযিছ্ব ছ্বাহাবাহ্*, ইব্‌নে হাজার্ 'আস্‌ক্বালাানী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২৮।

আবীল্ গ্বাদীয়াহ্র ঘটনাটিও অনুরূপ– যে আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে হত্যা করেছিল এবং পরে স্বীকার করেছিল যে, এ কাজের কারণে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

কতক সাহাবী কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতের তা'ভীল করে তাঁদের ওপরে শার'ঈ শাস্তির কার্যকরতা এড়ানোর জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয় নি। আবূ জান্দাল, যার্রার বিন খাত্ত্বাব ও আবূল আযওয়ার এদের অন্যতম। তাঁরা মদ পান করে মাতাল হয়েছিলেন এবং এ অবস্থায় আবূ 'উবায়দাহ্ তাঁদেরকে দেখতে পান ও তাঁদের এ কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। তখন আবূ জান্দাল এ আয়াতটি পাঠ করেন :

لَيْسَعَلَىالَّذِينَاٰمَنُواوَعَمِلُواالصَّالِحَاتِجُنَاحٌفِيمَاطَعِمُوا

'যারা ঈমান এনেছে ও যথাযথ কার্য সম্পাদন করেছে তারা যা খেয়েছে সে জন্য কোনো গুনাহ্ নেই।'[১] কিন্তু এ তা'ভীলে কোনো লাভ হয় নি; তাঁদের ওপর শার'ঈ শাস্তি কার্যকর করা হয়।[২]

সকল সাহাবীর 'আদেল হওয়া আর কতক সাহাবীর ওপর শার'ঈ শাস্তি কার্যকর হওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়!?

এছাড়া মিসরে আবদুর রাহ্মান বিন উমর বিন খাত্ত্বাব মদ পান করেন এবং সেখানকার আমীর আম্র বিন আল-'আস তাঁর ওপরে শার'ঈ শাস্তি কার্যকর করেন।[৩]

এ ধরনের ঘটনার সংখ্যা অনেক।

সাহাবীদের ব্যাপারে খলীফা উমরের নীতি

খলিফা উমর বিন খাত্ত্বাব আবূ হুরাইরাহকে 'আদেল হিসেবে গণ্য করেন নি।

উমার তাঁকে বাহরাইনের প্রশাসক নিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু তিনি যখন প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে ফিরে আসেন তখন উমর তাঁকে বলেন : 'এ সম্পদ নিজের জন্য জমা করেছ, হে আল্লাহ্র দুশমন! কোরআনের দুশমন!!' আবূ হুরাইরাহ বললেন : 'আমি না আল্লাহ্র দুশমন, না কোরআনের দুশমন। বরং আমি তাঁর দ্বীনের দুশমনদের দুশমন।' তখন উমর তাঁর দিকে মুখ করে বললেন : 'তাহলে এই ধনসম্পদ কোত্থেকে এনেছ?' জবাবে আবূ হুরাইরাহ বললেন : 'পালের মেষসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, গম-যবও বৃদ্ধি পেয়েছে, ...আর আমার কাছে নিয়মিত উপহারাদি আসত।'[৪]

ইব্নে 'আব্দে রাব্বিহ্ কর্তৃক উদ্ধৃত রেওয়ায়াত অনুযায়ী উমর আবূ হুরাইরাহ্কে বলেন : 'আমি জানি যে, আমি যখন তোমাকে বাহরাইনের প্রশাসক করে পাঠাই তখন তোমার

---

১. সূরা আল্-মাএদাহ্ : ৯৩।
২. *তারীখে দামেশ্ক্*, ২৫তম খণ্ড, পৃ. ৩০৩/৩০৩০।
৩. *উস্দুল্ গ্বাবাহ্*, ইব্নে আছীর্, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৩/৩৩৬৫।
৪. *তারীখে ইব্নে কাছীর্*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১১৩।

জুতাও ছিল না। এরপর আমার কাছে সংবাদ এসে পৌঁছল যে, তুমি এমন কতগুলো ঘোড়া ক্রয় করেছ যার মূল্য এক হাজার ছয়শ' দীনার।' আবূ হুরাইরাহ্ বললেন : 'আমার কয়েকটি ঘোড়া ছিল যেগুলো বাচ্চা দিয়েছে এবং আমার জন্য বিভিন্ন উপহার পাঠানো হয়েছে।' উমর বললেন : 'আমি তোমার প্রয়োজন হিসাব করেছি এবং এগুলো তোমার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি। যা বেশি তা ফিরিয়ে দাও।' আবূ হুরাইরাহ্ বললেন : 'আপনি এ কাজ করতে পারেন না।' জবাবে উমর বললেন : 'অবশ্যই পারি। আল্লাহ্র শপথ, আমি তোমার পিঠ চাবুকের আঘাতে জর্জরিত করব।'

এরপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁকে (আবূ হুরাইরাহ্কে) এত বেশি প্রহার করলেন যে, তাঁর শরীর রক্তাক্ত হলো। এরপর তাঁকে বললেন : 'ঐ সব সম্পদ ফিরিয়ে দাও।' আবূ হুরাইরাহ বললেন : 'আমি আল্লাহ্র সামনে সেগুলোর হিসাব দেব।' উমর বললেন : 'সেটা কেবল সে ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হতো যদি তুমি এ সব সম্পদ হালাল পথে হস্তগত করে থাকতে এবং তার হক আদায় করতে (যাকাত্ দিতে)। তুমি কি বাহরাইনের ঐ দূর প্রান্ত থেকে এ উদ্দেশ্যে এসেছ যে, লোকদের কাছ থেকে নিয়ে নিজের জন্য ধনসম্পদ সংগ্রহ করবে, আল্লাহ্ ও মুসলমানদের জন্য নয়? উমাইমাহ্[১] তোমাকে গাধা চরানোর জন্য প্রসব করেছিল।'

উমর এভাবে আবূ হুরাইরাহ্র মোকাবিলায় অত্যন্ত কঠোরভাবে রুখে দাঁড়ান এবং তাঁকে মুসলিম জনগণের ধনসম্পদ আত্মসাতের অভিযোগে অভিযুক্ত করেন, তাঁকে আল্লাহ্ ও কোরআনের দুশমন হিসেবে অভিহিত করেন, আর তাঁর দাবি মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি যদি আবূ হুরাইরাহকে 'আদেল বলে গণ্য করতেন তাহলে তাঁর বক্তব্য গ্রহণ করতেন এবং তাঁকে বলতেন : 'তুমি একজন 'আদেল ব্যক্তি' অথবা বলতেন : 'তুমি মুজতাহিদ, তবে ভুল করেছ।'

তেমনি খালেদ বিন ওয়ালীদ মালেক বিন নুওয়াইরাহ্র বিরুদ্ধে বিরাট নৃশংস অপরাধের আশ্রয় নিলে সে ক্ষেত্রেও উমর যে আচরণ করেন তা আমাদের মতকেই সমর্থন করে।[২]

তেমনি বালাযুরী উদ্ধৃত করেছেন : আবূ মুখতার ইয়াযীদ বিন ক্বায়স উমর বিন খাত্ত্বাব বরাবরে একটি পত্র প্রেরণ করেন এবং তাতে আহ্ওয়াযে তাঁর (উমরের) নিয়োজিত কতক কর্মকর্তা ও অপর কতক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তিনি তাঁর পত্রে উদ্ধৃত

১. আবূ হুরাইরাহ্র মাতা।

২. মালেক্ যুদ্ধ না করে ঈমানের ঘোষণা পুনর্ব্যক্ত করে খালেদের পেছনে নামায আদায় করা এবং তাঁকে খলীফাহ্র কাছে পাঠিয়ে দেয়ার অনুরোধ করা সত্ত্বেও খালেদ তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদের হত্যা করেন এবং সাথে সাথেই তাঁর মুসলিমা স্ত্রীকে নিজের কাছে নিয়ে তাঁকে শয্যাসঙ্গিনী করেন। এ অপরাধে তাঁকে শার'ঈ শাস্তি প্রদানের জন্য হযরত উমর খলীফা আবূ বাক্রের কাছে বার বার পীড়াপীড়ি করেন, যদিও খলীফা 'আল্লাহ্র তলোয়ার'কে কোষবদ্ধ করাকে কল্যাণকর মনে করেন নি বিধায় খালেদকে শাস্তিদানে বিরত থাকেন। কিন্তু এ ঘটনা থেকে সাহাবীদের 'আদেল হওয়া বা না হওয়া সম্পর্কে উমরের 'আক্বীদা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।– অনুবাদক

একটি কবিতায় বলেন : 'আমীরুল মু'মিনীন-এর কাছে পত্রটি পৌঁছে দাও এবং (বল) যে, তুমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদেশ-নিষেধের আমানতদার এবং আমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমানতদার। যে কেউ 'আর্‌শের রবের আমানতদার আমি তাঁর কাছে আত্মসমর্পিত। অতএব, কাউকে হাজ্জাজের কাছে পাঠিয়ে দাও যে তার হিসাব-নিকাশ পর্যালোচনা করবে। আর জুয্' ও বাশীরের কাছেও কাউকে পাঠিয়ে দাও। দুই নাফে' এবং ইব্‌নে গ্বাল্লাব্‌-এর কথাও ভুলে যেয়ো না।'[১]

আবূ মুখতার এ পত্রে উমরের নিয়োজিত কয়েক জন কর্মকর্তার নাম উল্লেখ করেন যাঁরা জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করেছিলেন এবং লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন সাহাবী। আর উমরও তাঁদের সকলকেই আমানতের খেয়ানত করার অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত করে শাস্তি প্রদান করেন। প্রশ্ন হচ্ছে, আমানতের খেয়ানত করা আর 'আদেল হওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কি?

প্রত্যেক সাহাবীকেই 'আদেল গণ্য করার 'আক্বীদা এবং তাঁদের ভুলগুলোকে তা'ভীল্‌ বলে গণ্য করে সে সম্পর্কে নীরব থাকার নীতি সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

বস্তুত এটা বুঝতে পারা কারো পক্ষেই অসম্ভব নয় যে, এসব তা'ভীল্‌ ও ছাফাই-এর মানে দাঁড়ায় দ্বীনী বিধিবিধান ও শারী'আতের পবিত্র বিষয়াদিকে সীমিতকরণ এবং এটি এক ধরনের বাতিল কূটতর্ক– মূলত যার উদ্দেশ্য ছিল মু'আবিয়া ও তাঁর সমর্থকদের সম্মান ও মর্যাদার হেফাযতকরণ।

﴿هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ جَٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَٰدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾

'ওহে! তোমরা তো তারাই যারা দুনিয়ার জীবনে তাদের সমর্থনে বিতর্ক করেছিলে; অতঃপর ক্বিয়ামতের দিনে আল্লাহ্‌র সামনে কে তাদের সমর্থনে বিতর্ক করবে? অথবা কে তাদের সহায়ক হতে পারবে?'[২]

সাহাবীদের বর্ণিত হাদীস

ওপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, আহলে বাইতের অনুসারীরা সাহাবী নামে পরিচিত যে কাউকেই 'আদেল গণ্য করে না, বরং এ 'আক্বীদা পোষণ করে যে, 'আদেল্‌ হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আমলের ওপর নির্ভরশীল, আর হাদীসের রাভীকে এ জন্য সুনির্ধারিত বৈশিষ্ট্যাবলির অধিকারী হতে হবে। বস্তুত ঢালাওভাবে সাহাবীদের সকলকে

১. *ফুতূহুল্‌ বুল্‌দান্‌*, বালাযুরী, পৃ. ৩৭৭।
২. সূরা আন্‌-নিসা' : ১০৯।

'আদেল গণ্য করার মূলনীতির কোনো ভিত্তি নেই এবং এ মূলনীতি প্রমাণ করা সম্ভব নয়; তা প্রমাণের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হতে বাধ্য।

আহ্‌লে সুন্নাত্ সকল সাহাবীর 'আদেল হওয়ার বিষয়টি একটি প্রমাণিত বিষয় বলে মনে করে এবং এ জন্য তাঁরা যে যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করেন তা যথাস্থানে উদ্ধৃত করা হয়েছে। তবে এতদসত্ত্বেও এ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

একদল মনে করেন যে, সাহাবিগণ ব্যতিক্রমহীনভাবে সকলেই 'আদেল। আরেক দল কেবল সেই সাহাবীদেরকে 'আদেল বলে গণ্য করেন যারা ফিত্‌নায় অংশগ্রহণ করেন নি এবং এ গোষ্ঠীটি এ প্রসঙ্গে ফিত্‌না বলতে উসমান-হত্যাকে বুঝিয়ে থাকেন। মু'তাযিলাগণ মনে করেন যে, যেসব সাহাবি হযরত আলী (আ.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন তাঁরা 'আদেল নন। ইব্‌নে সালাহ্‌র মতে, যারা ফিত্‌নায় অংশগ্রগহণ করেন নি তাঁদের 'আদেল হওয়ার ব্যাপারে ইজ্‌মা'এ উম্মাহ্ রয়েছে। আমেদী ও ইব্‌নে হাজেব্ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের 'আদেল হওয়ার বিষয়টি পর্যালোচনাসাপেক্ষ। তেমনি এ ব্যাপারে আরো অনেক মত রয়েছে।[১]

আহলে বাইতের অনুসারীরা সকল সাহাবীর 'আদেল হওয়ার 'আক্বীদা গ্রহণ করে না এবং কেবল নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করে থাকে, আর তা-ও বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষ। বস্তুত হাদীস হচ্ছে ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধানের উৎস এবং মুসলমানদের দ্বীনী ও পার্থিব যিন্দেগীর দিকনির্দেশক। এ কারণে মুসলমানগণ সনদ ও তাৎপর্যের দিক থেকে হাদীস পর্যালোচনার পেছনে বিরাট চিন্তা ও প্রচেষ্টা বিনিয়োজিত করেছেন।

আহলে বাইতের অনুসারীদের বিরুদ্ধে যেসব ভিত্তিহীন ও অন্তঃসারশূন্য অভিযোগ করা হয়েছে, যেমন, দাবি করা হয়েছে যে, আহলে বাইতের অনুসারীরা সাহাবীদের বর্ণিত হাদীস প্রত্যাখ্যান করে এবং এভাবে তারা সাহাবীদের অবমাননা করে, আমরা এসব অভিযোগ শুনেছি। আবার কেউ বলেছে যে, আহলে বাইতের অনুসারীরা ইসলামের নিয়মনীতি ও আদর্শ অনুযায়ী আমল করে না, কারণ, তারা সাহাবীদের বর্ণিত হাদীস পাশে সরিয়ে রাখে। আহলে বাইতের অনুসারীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের আরো অনেক দাবি ও অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে।

এটা সুস্পষ্ট যে, তাদের এসব অভিযোগ ও দাবি প্রকৃত অবস্থার সাথে মোটেই সঙ্গতিশীল নয়। বিশেষ যুগের বিশেষ পরিস্থিতির প্রভাবে এসব দাবি ও অভিযোগ তৈরি করা হয়েছিল।

---

১. *শার্‌হে আল্‌ফীয়াতুল্ 'ইরাক্বী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫; *আল্-কিফাইয়াহ্*, খাত্বীব্ বাগ্বদাদী, পৃ. ৮১-৮৩।

প্রশ্ন হচ্ছে, আহলে বাইতের অনুসারীরা হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে চিন্তাভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার আশ্রয় নেয়ার কারণে তাদেরকে দোষারোপ করা কি ন্যায়নীতিসম্মত আচরণ? যেসব লোকের প্রবৃত্তির অনুসরণকারী ও ফ্যাসাদকারী হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত তাদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণ না করা কি অপছন্দনীয় কাজ? প্রকৃত ব্যাপার কি এরূপ নয় যে, এ ধরনের লোকদের বর্ণিত হাদীস প্রত্যাখ্যান করাই বাঞ্ছনীয়? বস্তুত এ ক্ষেত্রে এমন অনেক সমস্যা রয়েছে যে কারণে সনদ ও তাৎপর্যের বিচারে কতক রেওয়ায়াত গ্রহণ করা হতে বিরত থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মোট কথা, আহলে বাইতের অনুসারীদের দৃষ্টিতে সাহাবীদের বর্ণিত হাদীস ও তা গ্রহণ করার শর্তাবলিকে যে অনেকে তাঁদের ওপরে অনাস্থা বলে গণ্য করে থাকেন এ অনাস্থা নিরঙ্কুশ বা নিঃশর্ত নয়।

বস্তুত যাঁরা দ্বীনী বিষয়াদিতে সতর্কতার নীতি অনুসরণ করেন এবং কোনো সূত্র থেকে আল্লাহ্‌র বিধান গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সূত্রটি সম্বন্ধে চিন্তা-গবেষণার ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তাঁদের এ আচরণকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীদের অবমাননা ও তাঁদের দোষারোপ হিসেবে গণ্য করা মোটেই ন্যায়সঙ্গত কাজ নয়।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি আবূ হুরাইরাহ্ বর্ণিত হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করতে চাই এবং প্রকৃত অবস্থা সুস্পষ্টভাবে অবগত হওয়ার লক্ষ্যে চিন্তা-গবেষণা করি তখন বলা হয় যে, এ কাজের মানে সাহাবীদের অবমাননা করা। প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি অন্যান্য সাহাবীর তুলনায় অনেক দেরীতে ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাঁর থেকে যে বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে সে পরিপ্রেক্ষিতে একমাত্র তাঁর মধ্যে প্রাপ্ত এ বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করা ও তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহের প্রতি সমালোচনার দৃষ্টিতে তাকানো কি অনুচিত হবে?

আবূ হুরাইরাহ্ হিজরি সপ্তম সালে খায়বার্ বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হিজরি অষ্টম সালে 'আল্লাবাহ্‌র সাথে বাহরাইন গমন করেন, অতঃপর হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর ওফাত পর্যন্ত সেখানেই থাকেন।

অতএব, তিনি দু'বছরেরও কম সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন। তাহলে কী করে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে এ বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করতে সক্ষম হলেন? অথচ যাঁরা তাঁর তুলনায় অনেক আগে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর তুলনায় অনেক বেশি সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন, তেমনি তাঁর কথা শোনার জন্য অধিকতর প্রস্তুতির অধিকারী ছিলেন তাঁদের কাছ থেকে এত বেশি হাদীস বর্ণিত হয় নি।

আবূ হুরাইরাহ্ সব সময়ই স্বীয় ক্ষুধা নিবৃত্তির চেষ্টায় ব্যস্ত থাকতেন এবং কোনো কোনো সময় ক্ষুধার যন্ত্রণার তীব্রতায় বেহুঁশ হয়ে যেতেন। তিনি লোকদের কাছে যেতেন এবং তাদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য চাইতেন। তাঁর প্রতি দয়া করার ও তাঁর ক্ষুণ্নিবৃত্তির জন্য তাঁকে কিছু দেয়ার জন্য তিনি লোকদের কাছে আবেদন জানাতেন।

প্রশ্ন হচ্ছে, তাঁর এ অবস্থা সত্ত্বেও কী করে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে এমন বিপুল সংখ্যক– তথা প্রায় অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করলেন? তিনি এত বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করায় স্বভাবতঃই লোকদের মনে প্রশ্ন ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব জাগ্রত হয়। তিনি হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) থেকে ৫ হাজার ৩৭৪টি হাদীস বর্ণনা করেন[১]– যা সাহাবীদের দ্বারা উপেক্ষিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। অবশ্য এ দুর্বোধ্যতার অবসানের লক্ষ্যে তিনি যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, অন্য সাহাবিগণ ব্যবসা-বাণিজ্যে মশগুল ছিলেন।[২]

আ'রাজ্ আবূ হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (আবূ হুরাইরাহ্) বলেন : 'তোমরা বলছ যে, মুহাজিরগণ কেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে এসব হাদীস বর্ণনা করেন নি? বাজারের লেনদেন মুহাজিরদের সময় নিয়ে নিত এবং আনসারগণও তাঁদের যমীনের খোঁজখবরে ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু আমি [রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে] থেকে যেতাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সবচেয়ে বেশি সাহচর্য গ্রহণ করেছিলাম; তাঁরা যখন ছিলেন না তখনো আমি উপস্থিত থাকতাম, আর তাঁরা যা ভুলে যেতেন আমি তা মুখস্ত করে রাখতাম।'[৩]

এ যুক্তি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং অন্য সাহাবিগণও এটি গ্রহণ করেন নি। হযরত আয়েশা ও আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর তাঁর এ দাবির প্রতিবাদ করেন এবং উমর বিন খাত্ত্বাব তাঁকে হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ করেন।

আবূ হুরাইরাহ্ দাবি করেছেন যে, তিনি [রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে] থেকে যেতেন এবং কোনো কিছুই তাঁকে হাদীস মুখস্ত করা থেকে ফিরিয়ে রাখত না। তিনিও আহ্লে সুফ্ফাহ্ বা আসহাবে সুফ্ফাহ্র অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[৪] তিনি তাঁর ক্ষুণ্নিবৃত্তির জন্য যে সময় ব্যয় করতেন এবং অনেক সময় যে, ক্ষুধার যন্ত্রণায় বেহুঁশ হয়ে যেতেন এ বিষয়টি উপেক্ষা করলেও প্রশ্ন জাগে, কী করে কেবল একা তিনিই এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেন এবং তাঁর সাথে আরো যাঁরা সেখানে অবস্থান করতেন এবং তাঁর তুলনায় অনেক আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কেন এ বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেল না?

উদাহরণস্বরূপ, আমরা এখানে আসহাবে সুফ্ফাহ্র অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সাহাবীর হাদীস বর্ণনার দৃষ্টান্ত তুলে ধরব।

আহ্লে সুফ্ফাহ্র হাদী

আহ্লে সুফ্ফাহ্ বা আসহাবে সুফ্ফাহ্র অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সাহাবীর বর্ণিত হাদীস সংখ্যার অবস্থা নিম্নরূপ :

---

১. দ্রষ্টব্য : *আস্-সুন্নাতু ওয়া রাওয়াাতুহা*, ডক্টর নাাছের আল্-ক্বাফ্ফারী।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩।

৩. *আল্-ফুতূহাতুল্ ওয়াহীয়্যাহ্*, পৃ. ১৩৬।

৪. আসহাবে সুফ্ফাহ্ সেই সব সাহাবীকে বলা হতো দারিদ্র্যের কারণে যাদেরকে মসজিদে নববীর এক কোণে থাকতে দেয়া হয়েছিল।

হাজ্জাজ বিন উমর মাযেনী আনসারী সিফ্ফীন্ যুদ্ধে হযরত আলী (আ.)-এর সাথে ছিলেন। *ছ্বাহীহ্* শীর্ষক সবগুলো হাদীস গ্রন্থে তাঁর বর্ণিত মাত্র একটি হাদীস রয়েছে। হাযেম বিন হার্‌মালাহ্ আস্‌লামী থেকেও মাত্র একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা আবূ যায়নাব্ সূত্রে *ইব্নে মাজাহ্* গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। যায়দ্ বিন্ খাত্ত্বাব 'আদাভী ইয়ামামাহ্র যুদ্ধে নিহত হন; তাঁর থেকেও মাত্র একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে– যা আব্দুল্লাহ্ ইব্নে উমর তাঁর থেকে উদ্ধৃত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাওয়ালী সাফীনাহ্ বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা চৌদ্দটি– যার মধ্য থেকে মুসলিম মাত্র একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আরেক জন মাওয়ালী শুক্বরান থেকে *তির্‌মিযী*তে মাত্র একটি হাদীস রয়েছে। ত্বিন্‌খাফাহ্ ইব্নে ক্বায়স্ গ্বিফারী– যাঁর নামের ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে; তাঁর থেকে মাত্র একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা *ছ্বাহীহ্* শীর্ষক গ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত হয়েছে। আবদুল্লাহ্ বিন আনীস– যাঁর ডাকনাম আবূ ইয়াহ্ইয়া (ওফাত ৮০ হিজরি); তাঁর থেকে বর্ণিত ২৪টি হাদীসের মধ্য থেকে মুসলিম মাত্র একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

আবদুল্লাহ্ বিন হার্‌ছ্ বিন্ জায্' যুবায়দী (ওফাত ৮০ হিজরি) ছিলেন মিসরে ইন্তেকালকারী সর্বশেষ সাহাবী। তিনি খুব কমসংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন যা আবূ দাঊদ্, তিরমিযী ও ইব্নে মাজাহ্ কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে।

আবদুল্লাহ্ বিন কুর্‌তুবী ছুমালী (ওফাত ৫৬ হিজরি) থেকে মাত্র একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা আবূ দাঊদ ও নাসায়ী কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে; সম্ভবত এটি সেই মি'রাজ সংক্রান্ত হাদীস।

'আক্বাবাহ্ বিন্ 'আমের্ জাহ্নী (ওফাত ৫৮ হিজরি) ৫৫টি হাদীস বর্ণনা করেন– যা থেকে বুখারী মাত্র একটি এবং মুসলিম নয়টি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তিনি হচ্ছেন সিফ্ফীনে মু'আবিয়ার পক্ষে যুদ্ধকারীদের অন্যতম।

উমর বিন তাগ্বলিব্ জা'দী মাত্র দু'টি হাদীস বর্ণনা করেন– যা বুখারী কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে।

উমর বিন 'আম্বাসাহ্ সিল্‌মী ৪৮টি হাদীস বর্ণনা করেন যা থেকে মুসলিম মাত্র একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। 'আত্ত্বাবাহ্ বিন 'আবদুস্ সিল্‌মী (ওফাত ৮৭ হিজরি) ২৮টি হাদীস বর্ণনা করেন। 'আত্ত্বাবাহ্ বিন নুদ্দার্ দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন যা ইব্নে মাজাহ্ কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে। 'আইয়ায বিন হাম্মাদ্ মুজাশে'ঈ বাসরী ত্রিশটি হাদীস বর্ণনা করেন যা থেকে মুসলিম মাত্র একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

ফুযালাহ্ বিন 'উবাইদ্ আনসারী (ওফাত ৫৩ হিজরি)– যিনি উহুদ্ যুদ্ধে ও বাই'আতে রিয্‌ওয়ানে উপস্থিত ছিলেন– পঞ্চাশটি হাদীস বর্ণনা করেন যা থেকে মুসলিম মাত্র দু'টি হাদীস গ্রহণ করেছেন।

মু'আবিয়ার গুপ্তচর ও সহযোগী ফুরাত্ বিন্ হাইয়ান্ 'আজালী– রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যাকে হত্যার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন; তার থেকে মাত্র একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা আবূ দাঊদ্ কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে। সে একদল আনসারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেছিল : 'আমি মুসলমান।' তাঁদের মধ্য থেকে একজন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলেন : 'সে বলছে যে, সে মুসলমান।' তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরশাদ করেন : 'তোমাদের মধ্যে এমন কতক লোক আছে যাদেরকে তাদের নিজেদের ঈমানের কাছে (নিজেদের নিরাপত্তায়) সোপর্দ করছি। ফুরাত বিন হাইয়ান্ এদের অন্যতম।'

সাএব্ বিন খাল্লাদ বিন সুওয়াইদ্ বিন ছা'লাবাহ্ বিন উমর খাযরাজী (ওফাত ৭১ হিজরি) পাঁচটি হাদীস বর্ণনা করেন। আহ্লে সুফ্ফাহ্র অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সাহাবীও এ সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেন।[১]

আবূ হুরাইরাহ্র হাদীস

উপরিউক্ত সাহাবিগণ আবূ হুরাইরাহ্র সাথে ছিলেন এবং তিনি একা যে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন বলে দাবি করেছেন তাঁদের সকলেই তাতে শরীক ছিলেন।[২] কিন্তু তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্যের বিচারে সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন এবং সাহাবীদের মধ্যে প্রথম স্থান দখল করেছেন। অথচ তিনি নিরক্ষর ছিলেন; লেখাপড়া জানতেন না।

তিনি নিজেই তাঁর নিরক্ষরতার কথা এবং তাঁর এতদ্জনিত অসুবিধা কীভাবে দূর হলো সে সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন– যা *মুস্নাদে আহ্মাদ্*-এ এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে : "আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি এরশাদ করলেন : 'যে কেউ স্বীয় 'আবা' প্রসারিত করবে এবং আমি আমার বক্তব্য পেশ করব, অতঃপর তা গুটিয়ে নেবে, সে আমার কাছ থেকে যা কিছু শুনবে তা কখনোই ভুলে যাবে না।' তখন আমি আমার 'আবা' প্রসারিত করে দিলাম, অতঃপর তিনি তাঁর বক্তব্য বললেন এবং এরপর আমি সেটি গুটিয়ে নিলাম। যে আল্লাহ্র হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, অতঃপর আমি তাঁর কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি তা ভুলে যাই নি।"[৩]

আমরা তাঁকে প্রশ্ন করতে চাই যে, কী কারণে অন্য সাহাবিগণ এ কারামত্ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং কী কারণে এ ফযীলতের অধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলেন না? তাঁরা কি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এ ওয়াদা বাস্তবে পরিণত হবার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতেন? নিঃসন্দেহে তা নয়। নাকি তাঁদের 'আবা' ছিল না– যা তাঁরা আবূ হুরাইরাহ্র ন্যায় প্রসারিত করে দিতে পারতেন?

---

১. *উস্দুল্ গ্বাবাহ্*, ইব্নে আছীর্, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯১/১৯০৯; দ্রষ্টব্য ঃ *আস্মাউছ ছাহাবাতির্ রাওয়াহ্*, পৃ. ৩১০-৩১১, ক্রমিক ৪৭২।

২. স্মর্তব্য, তিনি মাত্র দুই বছরেরও কম সময়ের জন্য আহ্লে ছোফ্ফাহ্ ছিলেন। – অনুবাদক

৩. *তারীখে ইব্নে কাছীর্*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১০৫।

আমরা কি এ দুর্বোধ্যতার বিষয়টি উপস্থাপন করতে পারি, নাকি তা জায়েয হবে না এবং আমরা অতীতের দিনগুলোতে ফিরে যাব– যিন্দীক্ব হিসেবে অভিযুক্ত হওয়া ও তার পরিণতিতে নিহত হওয়ার ভয়ে নীরবতা অবলম্বন করব?

খাত্বীব বাগ্বদাদী উদ্ধৃত করেছেন : হারূনুর রাশীদের কাছে আবূ হুরাইরাহ্ বর্ণিত এ হাদীস পড়ে শুনানো হলো যে, মূসা আদমের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং এরশাদ করলেন : 'হে আদম! তুমি আমাদেরকে বেহেশত থেকে বহির্গত করেছ।' জনৈক ক্বোরাইশী ব্যক্তি প্রশ্ন করল : 'মূসা কোথায় আদমের সাথে সাক্ষাৎ করলেন?' এতে হারূন রেগে গিয়ে বলল : 'ওর শিরশ্ছেদ করো। এই যিন্দীক্ব লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে দ্বিধা করছে!'[১]

এ ঘটনা থেকে আমরা সে যুগে আচরণের কঠোরতা ও পরিস্থিতি কতখানি বিপজ্জনক ছিল তা বুঝতে পারি।

ঐ লোকটি কেবল সাক্ষাতের জায়গা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিল যাতে ঘটনাটি তার কাছে অধিকতর সুস্পষ্ট হয়। কিন্তু এর ফলে তাকে এমন এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় যে, তার অস্তিত্বই বরবাদ হয়ে যায়– তাকে যিন্দীক্ব হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। কোন্ অপরাধে? তার অপরাধ ছিল এই যে, আবূ হুরাইরাহ্র হাদীসে যে অস্পষ্টতা ছিল সে সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। কিন্তু এ কারণে তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীসের বিরোধিতা ও অবমাননার অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়।

কিন্তু সে যদি মুসলিম ও বুখারী কর্তৃক উদ্ধৃত আবূ হুরাইরাহ্ বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি সম্বন্ধে প্রশ্ন করত তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াত!? হাদীসটি হচ্ছে : 'জাহান্নাম পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না আল্লাহ্ তার ওপরে স্বীয় পা রাখবেন এবং জাহান্নাম বলবে : যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।'[২]

যে মুসলমান আল্লাহ্ তা'আলাকে এ ধরনের[৩] বৈশিষ্ট্য থেকে পবিত্র ও প্রমুক্ত বলে জানে তার কি এ হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকার নেই? কারণ, এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন করলে এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে এ ধরনের বৈশিষ্ট্য থেকে প্রমুক্ত গণ্য করলে তাতে আবূ হুরাইরাহ্র ত্রুটি নির্দেশ করা হবে, আর তাঁর ত্রুটি নির্দেশ করা হলে তা হবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ত্রুটি নির্দেশের সমার্থক। (!!)

যখন বলা হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাতের এক তৃতীয়াংশে পৃথিবীর আসমানে নেমে আসেন, তখন যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন্ জায়গা থেকে নেমে আসেন, তাহলে সে লোকটির ভাগ্যে কী লিপিবদ্ধ করে দেয়া হবে? এটা হচ্ছে আবূ হুরাইরাহ্ বর্ণিত একটি হাদীসের বক্তব্য যা বুখারী ও মুসলিম উদ্ধৃত করেছেন।

---

১. *তারীখে বাগ্বদাদ্*, খাত্বীব্ বাগ্বদাদী, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৭।
২. আহ্মাদ্ ইব্নে হাম্বাল্-ও এ হাদীসটি তাঁর *মুস্নাদ্*-এ (৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৪) উল্লেখ করেছেন।
৩. পা থাকার তথা শরীরী হওয়ার মতো।– অনুবাদক

এ ধরনের হাদীসের সংখ্যা অনেক– যে সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আলোচনা অনেক বেশি দীর্ঘ হয়ে যাবে।

এখানে এ সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণা করার পেছনে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ বিষয়টি দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরা যে, আবূ হুরাইরাহ্ যে বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন তার যথার্থতায় সন্দেহ রয়েছে। কারণ, তিনি লেখাপড়া জানতেন না, অন্যদের তুলনায় অনেক দেরীতে মুসলমান হয়েছিলেন এবং অন্য অনেক সাহাবীর তুলনায় খুবই কম সময়ের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া তিনি এমন অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন যেগুলোতে তিনি উপস্থিত ছিলেন না এবং এমন অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন তিনি যে সেগুলো দেখেন নি সে ব্যাপারে মতৈক্য রয়েছে।

তিনি যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলোর অন্যতম হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক নামাযের মধ্যে ভুলে যাওয়া। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ভুলে যাওয়া ও ভুল করা থেকে মুক্ত ছিলেন।

আবূ হুরাইরাহ্ বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে যোহরের বা 'আছরের নামায আদায় করছিলাম। তিনি দ্বিতীয় রাক্'আতে সালাম দিলেন। যূল্ ইয়াদাইন্ তাঁকে বললেন : 'নামায কি সংক্ষিপ্ত হয়েছে, নাকি আপনি ভুলে গিয়েছিলেন?'

মুস্লিম্ এ হাদীসটি সামান্য পরিবর্তিত রূপে উদ্ধৃত করেছেন যার শুরু হয়েছে এভাবে যে, আবূ হুরাইরাহ্ বলেন : 'আমি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে নামায আদায় করছিলাম...।'

এ ধরনের ঘটনা যে আদৌ ঘটে নি তার প্রমাণ এই যে, আবূ হুরাইরাহ্ খায়বার্ বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন, অন্যদিকে যূল্ ইয়াদাইন্ হিজরি দ্বিতীয় সালে বদর যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। অবশ্য এ অসামঞ্জস্যের ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য বহু চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু ইবনে 'আবেদাইন্ যেমন বলেছেন, (ব্যাখ্যা প্রদানকারিগণ) কোনো সঠিক জবাব দিতে পারেন নি।[১]

আবূ হুরাইরাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কন্যা রুক্বাইয়াহ্ থেকে উদ্ধৃত করেন যে, তিনি (রুক্বাইয়াহ্) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খেদমতে হাযির হলেন এবং তাঁকে 'উসমানের ফাযায়েল সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। অথচ রুক্বাইয়াহ্ হিজরি তৃতীয় সালে আবূ হুরাইরাহ্র ইসলাম গ্রহণের আগে ইন্তেকাল করেন।

এছাড়া আবূ হুরাইরাহ্ মদীনাহ্র এমন ঘটনাও বর্ণনা করেছেন যে ঘটনার সময় তিনি মদীনায় উপস্থিত ছিলেন না। উদাহরণস্বরূপ, তিনি বলেন : 'রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন আলীকে বারা'আতের (মুশরিকদের সাথে নিঃসম্পর্কতার) ঘোষণা প্রদানের জন্য (মক্কায়)

১. *দুর্‌রুল্ মুখ্‌তার্*-এর ইব্নে 'আাবেদাইন্ লিখিত পার্শ্বটীকা, পৃ. ১-৬৪৩।

পাঠান তখন আমি তাঁর সাথে ছিলাম।'[১] এ ঘটনা প্রসঙ্গে অন্যত্র তিনি বলেন : 'আমি আবূ বকরের সাথে ছিলাম।' অথচ ইতিহাস ঐ সময় তাঁর মদীনায় উপস্থিতির দাবি প্রত্যাখ্যান করে। কারণ, তিনি তখন বাহ্‌রাইনে মুয়ায্‌যিন্ ছিলেন।

আবূ হুরাইরাহ্ বর্ণিত বিভিন্ন রেওয়ায়াতে যে স্ববিরোধিতা রয়েছে তা তুলে ধরার লক্ষ্যে এ দৃষ্টান্তগুলো উল্লেখ করা হলো। বস্তুত আমরা যদি কোনো রেওয়ায়াত গ্রহণ বা বর্জনের প্রশ্নে চিন্তা ও গবেষণা করে থাকি এবং যে রেওয়ায়াত সহীহ্ নয় তা গ্রহণ না করি তাহলে সে ক্ষেত্রে আমরা ইসলামের হুকুম ও বিচারবুদ্ধির দাবি অনুযায়ী কাজ করেছি।

মোট কথা, বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণনার বিচারে আবূ হুরাইরাহ্ প্রথম কাতারে অবস্থান করছেন।[২] আবূ হুরাইরাহ্ বর্ণিত হাদীসসমূহের এ সংখ্যাধিক্যের প্রতি সংশয় পোষণের মানে কিছুতেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীসসমূহে ত্রুটিনির্দেশ নয় এবং এর ভিত্তিতে কিছুতেই আহলে বাইতের অনুসারীদেরকে সাহাবীদের বর্ণিত হাদীসের প্রতি অনাস্থা পোষণের অভিযোগে অভিযুক্ত করা যেতে পারে না।

আমরা এখানে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর বর্ণিত হাদীসসমূহ নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি আবূ হুরাইরাহর পরে দ্বিতীয় অবস্থানের অধিকারী। তিনি ২৬৩টি (?) হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩]

কিন্তু যেসব সাহাবী একদিকে যেমন বয়সে তাঁর চেয়ে বড় তেমনি তাঁর তুলনায় দীর্ঘ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন তাঁদের কারো কাছ থেকেই এত বেশি সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয় নি। অথচ তিনি ছিলেন তরুণ মাত্র এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওফাতের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র বিশ বছর। তাই তাঁর কাছ থেকে এত বেশি সংখ্যক হাদীস বর্ণনা বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। অধিকন্তু তাঁর রেওয়ায়াত্‌সমূহে এমন কতক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার ফলে তাঁর বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। তাই তাঁর বর্ণিত হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্ব মানে সাহাবীদের ত্রুটিনির্দেশ নয়।

তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জানলে এবং তাঁর জীবনচরিত নিয়ে গবেষণা করলে প্রকৃত অবস্থা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। ফলে তাঁর হাদীস গ্রহণ না করার জন্য অন্য কোনো ওযরের প্রয়োজন হয় না। আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে এ আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করছি।

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সম্পর্কে আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনচরিত নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করতে চাই না। বরং আমরা কেবল তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই। অবশ্য ইসলামী সমাজে তাঁর অবস্থান এবং ইসলামী আইন-বিধানের ওপর তাঁর প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অন্যান্য স্ত্রীর তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর বর্ণিত

---

১. *আস্-সুনানুল্ কুব্‌রা*, নাসায়ী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৭।
২. দ্রষ্টব্য : *মা'আদ্ দুকতূর্ নায়েফের আল্-ক্বাফ্‌ফারী, আস্-সুন্নাতু ওয়া রাওয়ায়াতুহা*, পৃ. ৪২৩।
৩. দ্রষ্টব্য : *আস্‌মাউছ ছাহাবাতির্ রাওয়ায়াহ্*,পৃ. ৩৮, ক্রমিক ২।

হাদীসসমষ্টি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অন্যান্য স্ত্রী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমষ্টির সাথে তুলনীয় নয়। এ কারণে এখানে আমরা তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহের ওপর কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করছি।

রাসূলুল্লাহ্র (সা.) স্ত্রীগণ বর্ণিত হাদীসসমূহ

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর স্ত্রী যায়নাব্ বিন্তে জাহ্শ্ (ওফাত ২০ হিজরি) ১৯টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ছাফীয়াহ্ বিন্তে হাইয়ী বিন্ আখ্ত্বাব্ (ওফাত ৫০ হিজরি) থেকে মাত্র একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা মুস্লিম্ ও বুখারী নিজ নিজ সংকলনে স্থান দিয়েছেন। সাওদাহ্ বিন্তে যাম্'আহ্– যিনি উমরের খেলাফত্কালে ইন্তেকাল করেন, তাঁর থেকে মাত্র একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে– যা বুখারী কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে।

হিন্দ্ বিন্তে উমাইয়াহ্ মাখ্যূমী রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিবিগণের মধ্যে সবশেষে ইন্তেকাল করেন; তিনি ৩৭৮টি হাদীস বর্ণনা করেন। হাফ্ছাহ্ বিন্তে উমর বিন খাত্ত্বাব (ওফাত ৪১ হিজরি) ৬০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। জুওয়াইরাহ্ বিন্তে হার্ছ্ (ওফাত ৫৬ হিজরি) কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন; বুখারী তাঁর থেকে মাত্র দু'টি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। রাম্লাহ্ বিন্তে আবী সুফীয়ান্ (ওফাত ৫১ হিজরি) চল্লিশটি হাদীস বর্ণনা করেন।

কিন্তু আয়েশা বিন্তে আবী বকর (ওফাত ৫৭ হিজরি) ২ হাজার ২১০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অন্যান্য স্ত্রী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসংখ্যার তুলনায় হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহের এ বিরাট সংখ্যাধিক্য বিস্ময়ের সৃষ্টি করে যে কারণে তাঁর বর্ণিত হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি চিন্তা ও গবেষণার প্রয়োজন।

স্বাধীন চিন্তাচেতনার অধিকারী কোনো চিন্তাবিদ যদি এ ব্যাপারে কতক অস্পষ্টতা ও সংশয়ের প্রতি দৃষ্টি দেন তাহলে তিনি স্বীকার করবেন যে, হযরত আয়েশার যে ধরনের ব্যস্ততা ছিল, তেমনি তাঁর কম বয়স, শিশুসুলভ খেলা ও বান্ধবীদের সাথে বন্ধুত্ব[১] এবং সেই সাথে গার্হস্থ্য কাজকর্ম– এসবের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর পক্ষে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে এত বিপুল সংখ্যক হাদীস লাভ করা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রকৃত ব্যাপার সুস্পষ্ট হওয়ার লক্ষ্যে এসব হাদীস বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণের পরিবর্তে এগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলেই বলা উচিত হবে না যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিবিগণের অবমাননা করা হয়েছে এবং এ কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কাফের হয়ে যেতে বা দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে যেতে পারেন না।

অধিকন্তু এ ক্ষেত্রে এমন কতক সমস্যা রয়েছে যা আমাদেরকে অনেক বেশি চিন্তা-গবেষণায় বাধ্য করে। যেমন, তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁরা বনি

১. *আল্-আদাবুল্ মুফ্রাদ্*, বুখারী, পৃ. ৫৪।

উমাইয়াহ্‌র সাথে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ কাজ করেছেন এবং হিশাম্ বিন্ 'উর্‌ওয়াহ্‌র ন্যায় ব্যক্তিরা বনি উমাইয়াহ্‌র স্বার্থে বিভিন্ন মিথ্যা হাদীস রচনা করেছে।

হযরত আয়েশা বর্ণিত এমন কতক হাদীস রয়েছে যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মর্যাদার সাথে সাংঘর্ষিক অথবা ইসলামী চেতনার সাথে সামঞ্জস্যহীন এবং এসব কারণে সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যেতে পারে, যদিও এ ক্ষেত্রে আমরা দীর্ঘ আলোচনায় যেতে আগ্রহী নই।

উদাহরণস্বরূপ, বুখারী তাঁর *আল্-আদাবুল্ মুফ্‌রাদ্* গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত আয়েশা বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে হাইস্[১] খাচ্ছিলাম। তখন উমর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে দাও'আত্ করলেন। উমর খাওয়ায় মশগুল হলেন। এ অবস্থায় তাঁর হাত আমার আঙ্গুলে লেগে গেল এবং তিনি বললেন : 'আফ্‌সোস্! আপনি যদি আমার কথা শুনতেন তাহলে কোনো চক্ষুই আপনাকে দেখত না।'[২]

প্রশ্ন হচ্ছে, রেওয়ায়াতটিতে কি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি অসম্মান করা হয় নি? রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর গৃহ যেখানে উন্নত চরিত্র-আচরণ ও পূর্ণ মানবের সমুন্নত আদর্শ ছিল সে গৃহ কি পাশ দিয়ে যাতায়াতকারী যে কোনো পথচারীর প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত ছিল? নাকি তিনি ও তাঁর স্ত্রী পথের মাঝখানে বসে খাবার খাচ্ছিলেন? উমর কি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি সম্মান রক্ষা করতেন না এবং কোনোরূপ পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই হঠাৎ করেই যখন তখন তঁর গৃহে প্রবেশ করতেন?

আমরা এসব প্রশ্নের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করছি, তবে তা আয়েশার প্রতি অবমাননার ভিত্তিহীন অভিযোগের ও ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়ার ফত্‌ওয়ার ভয়ে নয়, বরং এ কারণে যে, এখানে আমাদের সীমিত পরিসর আমাদেরকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ দিচ্ছে না।

আমরা কি হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত রেওয়ায়াতের প্রতি সন্দেহ পোষণের অধকার রাখি না?

আয়েশা বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করল : 'এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করল এবং এরপর অসুস্থতা বোধ করল। এমতাবস্থায় তাদের উভয়ের

১. উটের দুধ থেকে তৈরি এক ধরনের উপকরণ ও খেজুর সহযোগে তৈরি এক ধরনের খাবার বিশেষ।– ফারসি অনুবাদক

২. *আল্-আদাবুল্ মুফ্‌রাদ*, বুখারী, পৃ. ১৫২।

ওপরই কি গোসল ফরয হবে?' রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরশাদ করলেন : 'আমি এবং ও (সেখানে বসা আয়েশার প্রতি ইঙ্গিত করে) এ কাজ করি এবং এরপর গোসল করি।'[১]

এ হাদীসটি সহীহ্ হওয়ার কথা কী করে বিশ্বাস করা সম্ভব হতে পারে? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যেখানে আত্মসম্মানবোধের মূর্ত প্রতীক এবং সমস্ত ফযীলতের অধিকারী ও পূর্ণ মানবের আদর্শ ছিলেন সেখানে তাঁর পক্ষ থেকে এ ধরনের জবাব দানের কথা কল্পনাও করা সম্ভব কী?

বিচারবুদ্ধি এ হাদীসটি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ঐশী মর্যাদা এবং ওহীর সাথে তাঁর সদা সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে আমরা যদি কেবল তাঁর ব্যক্তিত্ব ও আত্মিক-নৈতিক গুণাবলির দিক থেকে তাঁর মর্যাদা ও অবস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহলে নিশ্চিতভাবে দেখতে পাই যে, তাঁর এসব বৈশিষ্ট্য তাঁকে এ ধরনের অশোভন আচরণ থেকে অনেক দূরে থাকতে বাধ্য করে।

তেমনি মুসলিম হিশাম বিন 'উর্ওয়াহ্ কর্তৃক তাঁর পিতার সূত্রে হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন আমাদের কি সেটি সম্পর্কে সংশয় পোষণ করা উচিত নয়? এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আয়েশা বলেন : 'রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জাদুগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তিনি যে কাজ করেন নি তা-ও করেছেন বলে মনে করতেন।'[২]

আপনারা যদি কাফের ও যিন্দীক্ব হওয়ার ফত্ওয়ার ভয়ে ভীত না হন তাহলে আসুন মুসলিম এবং 'উর্ওয়াহ্ ও তার পুত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করুন অথবা পর্যালোচনার দায়িত্ব এমন লোকদের ওপর সোপর্দ করুন যারা অমূলক ধারণা-কল্পনার বন্দিত্ব থেকে মুক্ত এবং কোনোরূপ অযৌক্তিক ভাবাবেগকে গুরুত্ব না দিয়ে কেবল হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কথা চিন্তা করেন।

নিঃসন্দেহে তাঁরা কখনো এ ধরনের উক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি প্রযোজ্য বলে মেনে নেবেন না, যদিও এর ফলে হাজার হাজার 'সহীহ্' হাদীস প্রত্যাখ্যাত হয় এবং হাজার হাজার সাহাবীর ব্যাপারে ক্রটিনির্দেশ হয়ে পড়ে। কারণ, এটা কি সম্ভব যে, সমগ্র মানবতার মুক্তিদাতা ইনসানে কামেল্ নবীকুল শিরোমণি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কোনো কাজ না করেও তা করেছেন বলে মনে করবেন? সমগ্র বিশ্বের জন্য যিনি সংস্কারক তাঁর জন্য এ ধরনের বৈশিষ্ট্য কি শোভনীয়? কক্ষনো নয়। কারণ, নবী হচ্ছেন এমন ব্যক্তি যাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ۝٤

১. *ছ্বাহীহ্ বুখারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৫১; *ছ্বাহীহ্ মুস্লিম্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৭; *সুনানে বায়হাক্বী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৪।

২. *ছ্বাহীহ্ মুস্লিম্*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪।

'আর তিনি তাঁর প্রবৃত্তি থেকে কোনো কথা বলেন না; (তিনি যা কিছু বলেন) তা তো ওহী ব্যতীত কিছু নয়– যা তাঁর কাছে ওহী করা হয়।'[১]

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনার পেছনে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাহাবাদের সম্পর্কে সঠিক দষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা। আর এ দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সাহাবাদের মধ্য থেকে কেবল সত্যবাদীদের উক্তিই গ্রহণ এবং এর বহির্ভূতদের বর্ণিত রেওয়ায়াতসমূহ গ্রহণের ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

অনুবাদ : নূর হোসেন মজিদী

১. সূরা আন্-নাজ্ম্ : ৩-৪।

শিশু-কিশোর ও যুবকদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর আচরণ

মুহাম্মাদ আলী চানারানী

শিশুদের স্নেহ করা

শিশুর যেমন খাবার ও পানির প্রয়োজন রয়েছে তেমনি তার যত্ন ও আদরেরও প্রয়োজন রয়েছে এবং তার সাথে স্নেহ ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করা উচিত– যা শিশুর মনের জন্য সর্বোত্তম খাবারস্বরূপ। শিশুরা চুম্বন পেতে এবং তাদেরকে জড়িয়ে ধরাকে ভালোবাসে। যেসব শিশু শৈশবকাল থেকেই তাদের পিতা-মাতার নিকট হতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভালোবাসা পেয়েছে তারা সাধারণত হাসি-খুশি স্বভাবের হয়ে থাকে।

আমাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের অনেক বক্তব্যে শিশুদের প্রতি স্নেহের দিকটি আলোচিত হয়েছে এবং বিভিন্নভাবে তাদেরকে স্নেহের উপদেশও দেওয়া হয়েছে। এখানে তার মধ্য থেকে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

'খুতবায়ে শা'বানীয়া' নামে প্রসিদ্ধ বক্তব্যে মহানবী (সা.) যখন বিভিন্ন দায়িত্ব সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিচ্ছিলেন সেখানে তিনি উপদেশ দেন : 'তোমরা বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান কর এবং ছোটদের প্রতি দয়াশীল হও।'[১]

মহানবী (সা.) অন্যত্র বলেন : 'যে শিশুদের প্রতি স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।'[২]

একটি বর্ণনা মোতাবেক মহানবী (সা.) আরও বলেছেন : 'তোমরা শিশুদেরকে ভালোবাসো ও তাদের প্রতি দয়াশীল হও।'[৩]

শহীদ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে হযরত আলী (আ.) উপদেশ দিয়ে বলেন : 'তোমাদের পরিবারে শিশুদের প্রতি দয়াশীল হও এবং বড়দের শ্রদ্ধা কর।'[১]

---

১. উয়ুনু আখবারির রিযা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৫; বিহারুল আনওয়ার, ৯৬তম খণ্ড, পৃ. ৩৫৬; ওয়াসায়েলুশ শিয়া, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২৬

২. মাজমাউল ওয়াররাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪; আল মাহাজ্জাতুল বাইদা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৫

৩. ওয়াসায়েলুশ শিয়া, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২৬; মান লা ইয়াহদুরুহুল ফাকীহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১১; ফুরুউল কাফী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৯; বিহারুল আনওয়ার, ৯৩তম খণ্ড, পৃ. ১০৪

অন্যত্র তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে বলেন : 'শিশুরা আচরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই বয়োজ্যেষ্ঠদের অনুসরণ করবে এবং বয়োজ্যেষ্ঠরা অবশ্যই শিশুদের প্রতি দয়াশীল হবে। সতর্ক থেক যাতে জাহেলি যুগের অত্যাচারীদের মতো আচরণ না কর।'[২]

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : 'যে ব্যক্তির তার সন্তানের প্রতি যথেষ্ট ভালোবাসা রয়েছে সে আল্লাহর বিশেষ ক্ষমা ও মনোযোগ লাভ করবে।'[৩]

শিশুদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসা

হযরত আলী (আ.) বলেন : 'যখন আমি শিশু ছিলাম তখন মহানবী (সা.) আমাকে তাঁর কোলে বসাতেন, বুকে জড়িয়ে ধরতেন এবং কখনও কখনও তাঁর বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে দিতেন। তিনি পরম মমতায় তাঁর মুখমণ্ডল আমার মুখের ওপর রাখতেন এবং তাঁর শরীরের সুঘ্রাণ নেওয়াতেন।'[৪]

নিশ্চয়ই একটি শিশুর যত্নের প্রয়োজন রয়েছে। মৃদুভাবে এবং ভালোবাসার সাথে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়া উচিত। তার দিকে স্নেহের দৃষ্টিতে তাকানো উচিত। শিশুর দিকে ভালোবাসা ও মমতাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকানো তাকে আনন্দিত করে।[৫]

মহানবী (সা.) শিশুদের প্রতি এতই মেহেরবান ছিলেন যে, বলা হয়ে থাকে, তায়েফ সফরে যেসব শিশু তাঁর দিকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল তিনি তাদের প্রতি কোনো প্রতিক্রিয়া দেখান নি; বরং হযরত আলী (আ.) তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন।'[৬]

যখন মহানবী (সা.) আনসার সাহাবীদের শিশুদেরকে দেখতেন তখন তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন, তাদেরকে সালাম দিতেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন।'[৭] আনাস ইবনে মালিক বলেন : 'আমি মহানবী (সা.) ছাড়া আর কাউকে নিজ পরিবারের প্রতি এত বেশি দয়াশীল দেখি নি।[৮] প্রতিদিন তিনি তাঁর সন্তান-সন্ততি ও

১. বিহারুল আনওয়ার, ৪২তম খণ্ড, পৃ. ২০৩; আমালী মুফিদ, পৃ. ১২৯
২. নাহজুল বালাগা, ফায়েদ, পৃ. ৫৩১
৩. মাকারিমুল আখলাক, তাবারসী, পৃ. ১১৫
৪. নাহজুল বালাগা, মোল্লা ফাতহুল্লাহ সংস্করণ, পৃ. ৪০৬
৫. মুসতাদরাকুল ওয়াসায়েল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৬; মাকারিমুল আখলাক, পৃ. ১১৩
৬. বিহারুল আনওয়ার, ২০তম খণ্ড, পৃ. ৫২ ও ৬৭; তাফসীরে কুম্মী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৫
৭. শারাফুন্নবী, খারগুশী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৫
৮. সীরাতু দাহলান, সীরাতে হালাভীয়্যাহর পার্শ্বটীকায়, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫২; সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ, ইবনে কাসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬১২

নাতি-নাতনিদের মাথায় চুম্বন করতেন।[১] শিশুদের প্রতি মমতা ও ভালোবাসা মহানবীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল।[২]

একদিন মহানবী (সা.) এবং তার সাহাবীরা এমন একটি স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে শিশুরা খেলা করছিল। তিনি তাদের মধ্যকার একজনের পাশে বসলেন ও তার কপালে চুম্বন করলেন এবং তার সাথে সদয় আচরণ করলেন। সাহাবীদের কেউ একজন মহানবীকে এমন আচরণ করার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। মহানবী (সা.) জবাব দিলেন : 'একদিন আমি এই বালকটিকে আমার সন্তান (নাতি) হুসাইনের সঙ্গে খেলা করতে দেখেছিলাম। সে হুসাইনের পায়ের নিচ থেকে মাটি তুলে নিয়ে তার মুখে মেখেছিল। যেহেতু সে হুসাইনের বন্ধু সেজন্য আমিও তাকে পছন্দ করি। জিব্রাইল আমাকে বলেছেন যে, এই শিশুটি কারবালায় হুসাইনের সাথিদের মধ্যকার একজন হবে।[৩]

ইমাম সাদিক (আ.) বলেন : "মূসা ইবনে ইমরান তাঁর মোনাজাতে জিজ্ঞেস করেছিলেন : 'হে আল্লাহ! তোমার কাছে কোন্ কাজগুলো সবচেয়ে উত্তম?' তাঁর নিকট প্রত্যাদেশ করা হয়েছিল : 'শিশুদের সাথে বন্ধুত্ব করা আমার কাছে সকল কাজের মধ্যে উত্তম। যেহেতু শিশুরা প্রকৃতিগতভাবেই খোদাভীরু এবং আমাকে ভালোবাসে। যখন কোন শিশু মারা যায় তখন আমি ক্ষমাশীল হয়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাই।'"[৪]

কিন্তু শিশুদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসা প্রদর্শন ক্ষতিকর। অনেক বর্ণনাতেই অতিরিক্ত ভালোবাসা প্রদর্শনের বিষয়টিকে নিষেধ করা হয়েছে।

ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনের প্রতি মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসা

ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনের প্রতি মহানবীর প্রচণ্ড ভালোবাসা ছিল। এ সংক্রান্ত কিছু অকাট্য বর্ণনা নিচে উল্লেখ করা হলো :

সুন্নি গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে উমরের উদ্ধৃতি এভাবে দেয়া হয়েছে যে, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন : 'হাসান এবং হুসাইন এ দুনিয়াতে আমার সুগন্ধময় ফুল।'"[৫]

---

১. বিহারুল আনওয়ার, ১০৪তম খণ্ড, পৃ. ৯৯; ইদ্দাহ আদ্দাঈ, পৃ. ৬১
২. আল মাহাজ্জাতুল বাইদা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৬
৩. বিহারুল আনওয়ার, ৯৭তম খণ্ড, পৃ. ১০৪ ও ১০৫
৪. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ. ২৪২, হা. ৩৬
৫. ইহকাকুল হক, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৫

আনাস ইবনে মালিক বর্ণনা করেন : 'মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো : 'আপনার পরিবারের মধ্য থেকে কোন্ ব্যক্তিকে আপনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন।' মহানবী জবাব দেন : 'আমি হাসান ও হুসাইনকে অন্যদের চেয়ে বেশি ভালোবাসি।'[১]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, সাঈদ ইবনে রাশিদ বলেন : "ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন মহানবীর দিকে দৌড়ে আসলেন। তিনি তাদেরকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন : 'এই দুইজন দুনিয়াতে আমার সুগন্ধী ফুল।'"[২]

ইমাম হাসান (আ.) বলেন : "মহানবী (সা.) আমাকে বলেন : 'হে আমার সন্তান! তুমি আমার শরীরের অংশসদৃশ, তাদের ভালো হোক যারা তোমাকে এবং তোমার সন্তানদেরকে ভালোবাসবে এবং তাদের জন্য আফসোস যারা তোমাকে হত্যা করবে।'"[৩]

ইমাম হুসাইনের প্রতি মহানবীর ভালোবাসা এত বেশি ছিল যে, তিনি তাঁর ক্রন্দন সহ্য করতে পারতেন না।

ইয়াযীদ বিন আবি যিয়াদ বলেন : 'মহানবী (সা.) হযরত আয়েশার ঘর থেকে বের হয়ে হযরত ফাতিমার ঘর অতিক্রম করছিলেন। তিনি হুসাইনের ক্রন্দনধ্বনি শুনলেন এবং ফাতিমাকে বললেন : 'তুমি কি জান না, হুসাইনের ক্রন্দন আমাকে ব্যথিত করে?'[৪]

শিশুদের জন্য মহানবীর দোয়া

মুসলমানরা তাদের শিশুদেরকে মহানবীর কাছে নিয়ে আসত আর মহানবীও তাদের জন্য দোয়া করতেন।

জামারাহ বিনতে আবদুল্লাহ একটি বালিকা থেকে উদ্ধৃত করেন : 'আমার পিতা আমাকে মহানবী (সা.)-এর নিকট নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে আমার জন্য দোয়া করতে অনুরোধ করলেন। মহানবী আমাকে তাঁর কোলে বসালেন, তাঁর হাত আমার মাথার ওপরে রাখলেন এবং আমার জন্য দোয়া করলেন।'[৫]

শিশুদেরকে সহ্য করা

হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের স্ত্রী উম্মে ফযল, যিনি ইমাম হুসাইনের লালন-পালন করতেন, তিনি বলেন : "যখন ইমাম হুসাইন একজন দুগ্ধপোষ্য শিশু

১. প্রাগুক্ত
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৯, ৬১৯, ৬২১, ৬২৩।
৩. ইহকাকুল হাক এর পরিশিষ্ট, ১১তম খণ্ড, পৃ. ৩১১-৩১৪
৪. ইহকাকুল হক এর পরিশিষ্ট, ১১তম খণ্ড, পৃ. ৩১১-৩১৪
৫. মাজমাউল জাওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৬৬

তখন একদিন মহানবী তাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে কোলে নেন এবং তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। ইমাম হুসাইন তাঁর কোলে প্রস্রাব করে দিলে আমি তাকে মহানবীর কোল থেকে দ্রুত নিয়ে নিলাম আর সে ক্রন্দন করা শুরু করল। মহানবী আমাকে বললেন : 'তাড়াহুড়া করো না। আমার কাপড় তো পানি দিয়ে পরিষ্কার করা যাবে, কিন্তু আমার সন্তান হুসাইনের মন থেকে এই ব্যথার স্মৃতি কী করে দূর হবে?'"[১]

এটি বর্ণিত হয়েছে যে, যখনই কোন শিশুকে মহানবীর কাছে নিয়ে যাওয়া হতো– সেটা দোয়ার জন্যই হোক অথবা নামকরণের জন্যই হোক– মহানবী দুই হাতে সেই শিশুকে গ্রহণ করতেন এবং তাঁর কোলে বসাতেন। কখনও কখনও শিশুরা তাঁর কাপড় ভিজিয়ে ফেলত এবং যারা সেখানে উপস্থিত থাকত তারা শিশুটিকে বকাঝকা করত অথবা দ্রুত তাকে সরানোর জন্য চেষ্টা করত। মহানবী (সা.) তাদেরকে থামিয়ে দিতেন এবং বলতেন : 'রুক্ষতা প্রদর্শন করে শিশুকে প্রস্রাব করা থেকে বিরত রেখ না।' এরপর তিনি প্রস্রাব করা শেষ হতে দিতেন।

যখন দোয়া এবং নামকরণ অনুষ্ঠান শেষ হতো, তখন শিশুটির আত্মীয়-স্বজনরা খুশিমনে তাদেরকে নিয়ে যেত এবং মহানবী (সা.) কখনই শিশুদের প্রস্রাব করার কারণে বিন্দুমাত্র বিরক্ত হতেন না। যখন আত্মীয়-স্বজনরা চলে যেত তখন তিনি তাঁর পোশাক ধুয়ে ফেলতেন।[২]

শিশুদের জন্য মহানবী (সা.)-এর উপহার

শিশুদের ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর অন্যতম বিষয় ছিল তাদেরকে উপহার দেয়া।

হযরত আয়েশা বর্ণনা করেন : 'আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী একটি স্বর্ণের আংটি মহানবী (সা.)-এর কাছে উপহার হিসেবে পাঠান, যেটি আবিসিনিয়ায় তৈরি করা। মহানবী (সা.) আবিল আসের মেয়ে উমামাকে ডাকলেন এবং বললেন : 'হে আমার ছোট্ট কন্যা! নিজেকে এই উপহার দ্বারা সজ্জিত কর।'[৩]

হযরত আয়েশা থেকে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন : "একটি স্বর্ণের হার মহানবী (সা.)-এর কাছে উপহার হিসেবে আনা হলো। মহানবীর সকল স্ত্রী সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং আবিল আসের মেয়ে উমামা সেখানে খেলা করছিল। মহানবী (সা.) সেই হার সকলকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : 'তোমরা এটি সম্পর্কে কী মনে কর?' সকলেই সেটি দেখলেন এবং বললেন : 'আমরা এত সুন্দর জিনিস এর আগে

১. বিহারুল আনওয়ার, ৮০তম খণ্ড, পৃ. ১৮০; আল লুহুফ, ইবনে তাউস, পৃ. ১২; হাদীয়াহ আল আহবাব, পৃ. ১৭৬

২. মাআনিউল আখবার, পৃ. ২১১; মাকারিমুল আখলাক, পৃ. ১১৫; বিহারুল আনওয়ার, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ২৪০

৩. সুনানে ইবনে মাজাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩০৩

কখনও দেখি নি।' মহানবী (সা.) বললেন : 'এটি আমাকে দাও।' আমার মনে হলো আমার চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। আমি খুবই ভীত হলাম যে, তিনি হয়তো অন্য কারো গলায় এটি পরিয়ে দেবেন, অন্যরাও এমনই মনে করছিল। আমরা সকলেই নিশ্চুপ হয়ে ছিলাম যতক্ষণ না উমামা এলো এবং মহানবী (সা.) তার গলায় এটি পরিয়ে দিলেন।'[১]

বর্ণিত হয়েছে যে, একজন আরব মহানবী কাছে এসে বলল : 'হে মহানবী! আমি একটি হরিণশাবক ধরেছি যা আমি আপনার সন্তান হাসান ও হুসাইনের জন্য উপহার দিচ্ছি।' মহানবী সেই উপহার গ্রহণ করলেন এবং সেই শিকারির জন্য দোয়া করলেন। এরপর তিনি সেই হরিণশাবকটিকে ইমাম হাসানকে দিলেন। তিনি এটি নিয়ে তাঁর মা হযরত ফাতিমাকে দেখালেন। ইমাম হাসান খুব খুশি হলেন এবং তিনি এটি নিয়ে খেলতেন।[২]

শহীদদের শিশুদের সাথে মহানবীর আচরণ

আকরিয়া বিন যাহনীর ছেলে বাশির বলেন : "উহুদের যুদ্ধের দিন আমি মহানবীকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমার পিতা কীভাবে শহীদ হয়েছেন?' মহানবী (সা.) বললেন : 'সে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে, আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তার ওপর!' আমি কেঁদে ফেললাম। মহানবী (সা.) আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং আমাকে তাঁর ঘোড়ার ওপর বসিয়ে বললেন : 'তুমি কি আমাকে তোমার পিতার মতো হওয়া পছন্দ করো না?'[৩]

সপ্তম হিজরির জমাদিউল আউয়াল মাসে মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যে যুদ্ধে ইসলামের তিনজন সেনাপতি যায়েদ ইবনে হারিসাহ, জাফর ইবনে আবি তালিব এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা শহীদ হন। সেনাদল মদিনায় ফিরে আসল।[৪] মহানবী (সা.) ও অন্যান্য সাহাবী তাঁদেরকে এগিয়ে নেয়ার জন্য গেলেন। মহানবী (সা.) একটি সওয়ারীর পিঠে ছিলেন। তিনি বললেন : 'শিশুদেরকে আরোহণ করাও। জাফরের ছেলেকে আমার কাছে দাও।' তারা উবায়দুল্লাহ ইবনে জাফরকে নিয়ে আসল। মহানবী (সা.) তাকে নিয়ে তাঁর সওয়ারীর সামনের দিকে বসালেন।'[৫]

---

১. মাজমাউল জাওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৫৪
২. বিহারুল আনওয়ার, ৪৩তম খণ্ড, পৃ. ৩১২
৩. মাজমাউল জাওয়ায়িদ, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৬১
৪. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮১
৫. মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৪; সিরাতে মুসলিম, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ১৯৬; আস সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৯

ইবনে হিশাম লিখেছেন : আবুদল্লাহ ইবনে জাফরের স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস বলেন : "যেদিন মুতার যুদ্ধে জাফর শহীদ হন, সেদিন মহানবী (সা.) আমাদের বাড়িতে আসেন। আমি সবেমাত্র ঘরের কাজগুলো শেষ করে ছেলেমেয়েদেরকে পরিপাটি করছিলাম। মহানবী (সা.) আমাকে বললেন : 'জাফরের সন্তানদেরকে আমার কাছে নিয়ে আস।' আমি সন্তানদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে আসলাম। তিনি তাদেরকে বুকে টেনে নিলেন এবং আদর করতে থাকলেন, তখন তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল।"

"আমি জিজ্ঞেস করলাম : 'হে নবী! আপনি কাঁদছেন কেন? জাফর ও তাঁর সঙ্গী-সাথিদের কোনো খবর এসেছে কি?' তখন মহানবী বললেন : 'তারা আজকে শহীদ হয়েছে।'"[১]

অন্য শিশুরাও মহানবীর এমন দয়া ও পিতৃসুলভ ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত ছিল না। বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) শিশুদেরকে জড়িয়ে ধরতেন এবং কাউকে কাউকে তাঁর ঘাড়ে ও পিঠে উঠাতেন। (তিনি তাঁর সাথিদের বলতেন, শিশুদেরকে জড়িয়ে ধর এবং তাদেরকে তোমাদের কাঁধে নাও।) শিশুরা তাঁর এমন আচরণকে খুবই পছন্দ করত, এতে তারা অপরিসীম আনন্দ পেত এবং কখনই এরকম মধুর মুহূর্তগুলোকে ভুলে যেত না। কেউ কেউ গর্ব করে বলত : 'মহানবী (সা.) আমাকে তাঁর পিঠে নিয়েছেন।' আবার কেউ বলত : 'মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তোমাকে পিঠে নেয়ার জন্য।'[২]

নামাযের সময় শিশুদের সাথে মহানবীর আচরণ

শাদ্দাদ ইবনে হাদ বলেন : মহানবীর নামাযের সময় তাঁর দুই সন্তানের একজন– হয় হাসান অথবা হুসাইনকে নিয়ে দাঁড়াতেন। তিনি কাতারের সামনে দাঁড়াতেন এবং তাঁর নাতিকে তাঁর ডানপাশে দাঁড় করাতেন। তিনি তাঁর সিজদা দীর্ঘায়িত করতেন।

বর্ণনাকারী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন : "আমি আমার মাথা তুললাম এবং মহানবীকে দেখলাম যে, তাঁর নাতি তাঁর পিঠে বসে আছে। আমি আবার সিজদায় গেলাম। যখন নামায শেষ হলো তখন সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন : 'আজকের নামাযের সিজদা অনেক দীর্ঘ ছিল। এ বিষয়ে কি আপনার কাছে কোনো নির্দেশ এসেছিল অথবা ওহী নাযিল হচ্ছিল?' মহানবী (সা.) বললেন : 'কোনোটিই নয়; বরং

১. সিরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫২
২. আল মাহাজ্জাতুল বাইদা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৬

আমার সন্তান আমার পিঠে বসেছিল এবং আমি তাকে বিরক্ত করতে চাই নি। সে যা চেয়েছিল আমি তাকে তা-ই করতে দিয়েছি।'"[১]

হযরত আবু বকর থেকে একটি বর্ণনা এসেছে। তিনি বলেন : 'আমি হাসান ও হুসাইনকে দেখেছি যখন মহানবী নামাযরত ছিলেন। তারা তাঁর পিঠে লাফিয়ে উঠল। যখন তিনি দাঁড়ালেন তখন তিনি তাদেরকে ধরে রাখলেন যাতে তারা অনায়াসে মাটিতে নামতে পারে। তিনি তাদেরকে তাঁর কোলে বসাতেন, তাদের মাথায় চুম্বন করতেন এবং বলতেন : 'এই দুইজন এই পৃথিবীতে আমার সুগন্ধযুক্ত ফুল।'" অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, মহানবী বলতেন : 'একটি শিশু হলো সুগন্ধী ফুল এবং আমার সুগন্ধী ফুল হলো হাসান আর হুসাইন।'[২]

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, একদিন মহানবী (সা.) একদল মুসলমানের সাথে নামায আদায় করছিলেন। যখন মহানবী (সা.) সিজদায় গেলেন তখন শিশু ইমাম হুসাইন মহানবীর পিঠে উঠলেন এবং তাঁর পা এমনভাবে নড়াচড়া করতে লাগলেন যেন তাঁর ঘোড়াকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন। যখন মহানবী সিজদা থেকে উঠতে চাইতেন তখন তিনি হুসাইনকে ধরে তাঁর পাশে রাখতেন। নামাযের শেষ পর্যন্ত এভাবেই ঘটনাটি ঘটেছিল।

একজন ইহুদি এই ঘটনাটি দেখেছিল। নামায শেষ হওয়ার পর সে মহানবী (সা.)-কে বলে : 'আপনি আপনার সন্তানের সাথে এমন আচরণ করেছেন যা আমরা কখনই করি নি।' মহানবী (সা.) বলেন : 'যদি তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস করতে তাহলে তুমি নিজের সন্তানদের প্রতি মমতাময় হতে।' মহানবীর দয়া সেই ইহুদিকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে এবং সে ইসলাম গ্রহণ করে।[৩]

শিশুদের চুমু দেয়া

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেন : 'একটি শিশু একটি সুগন্ধীময় ফুলের মতো।'

যখন কোনো পিতা বা মাতা তার সন্তানকে চুমু দেয় তখন এরূপ ব্যবহার শিশু ও তার পিতা-মাতার মধ্যকার ভালোবাসা বৃদ্ধি করে এবং এটিই শিশুর ভালোবাসার তৃষ্ণা মেটানোর সবচেয়ে কার্যকরী উপায়। চুমুর মাধ্যমে এটি প্রকাশ পায় যে, পিতামাতা তাদের সন্তানের প্রতি স্নেহশীল। এটি শিশুমনের ভালোবাসার চারা গাছের খাদ্যের মতো, যেখানে এটি শিশুকে তার প্রতি পিতামাতার ভালোবাসা সম্পর্কে সচেতন করে এবং শিশুর মধ্যে নতুন শক্তির উদ্দীপনা যোগায়।

---

১. মুসতাদরাকে হাকেম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৫; মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৯৩
২. মাকতালুল হুসাইন, খারেজমী, পৃ. ১৩০; আল ইরশাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫; ইহকাকুল হাক এর পরিশিষ্ট, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৬১৫ ও ১১তম খণ্ড, পৃ. ৫০
৩. বিহারুল আনওয়ার, ৪৩তম খণ্ড, পৃ. ২৯৪-২৯৬

মহানবী (সা.) নিজেও শিশুদের চুমু দিতেন। মজার বিষয় হচ্ছে, শিশুদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা জনসম্মুখে দেখা যেত। এর দুটি উপকারিতা রয়েছে :

প্রথমত, জনসম্মুখে সম্মান দেখানোর ফলে শিশুর ব্যক্তিত্ব ভীষণভাবে চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, মহানবী (সা.) এইভাবে জনগণকে শিক্ষা দিয়েছেন কীভাবে তাদের শিশুদেরকে শক্তিশালী ও উৎসাহিত করতে হবে।

ইসলাম প্রায়শই শিশুদেরকে চুমু দেয়ার ব্যাপারে জোর দিয়েছে।

মহানবী (সা.) বলেন : 'যে কেউ তার সন্তানকে চুমু দেয় সে একটি সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং যে কেউ তার সন্তানকে খুশি করে আল্লাহ পুনরুত্থান দিবসে তাকে খুশি করবেন।'[১]

হযরত আয়েশা বলেন : "এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর নিকট আসলেন এবং বললেন : 'আপনি কি শিশুদেরকে চুম্বন করেন? আমি কখনও তা করি নি।' মহানবী (সা.) জবাব দিলেন : 'যখন আল্লাহ তোমার হৃদয় থেকে তাঁর মায়া-মমতা উঠিয়ে নিয়েছেন তখন আমি কী করতে পারি।'"[২]

এটিও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর নিকট আসল এবং বলল : 'আমি কখনও কোনো শিশুকে চুম্বন করি নি।' পরবর্তীকালে মহানবী (সা.) বলেন : 'আমি মনে করি এই ব্যক্তিটি জাহান্নামের আগুনের শিকার হবে।'[৩]

অন্যত্র বলা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) হাসান ও হুসাইনকে চুম্বন করেছেন। আকরা বিন হাকিম বলেন : 'আমার দশটি সন্তান রয়েছে, আমি কাউকে চুম্বন করি নি।' মহানবী (সা.) তার দিকে ফিরলেন এবং বললেন : 'আমি কী করতে পারি যখন আল্লাহ তোমার নিকট হতে তাঁর দয়া উঠিয়ে নিয়েছেন।'[৪]

হযরত আলী (আ.) বলেন : 'তোমাদের সন্তানদেরকে চুম্বন কর। কারণ, তোমার প্রতিটি চুম্বনের ফলেই তোমার জন্য মর্যাদা ও অবস্থান রয়েছে।'[৫]

ইমাম সাদিক (আ.) বলেন : 'তোমাদের সন্তানদেরকে প্রায়শই চুম্বন কর। কারণ, যখনই তুমি তাদেরকে চুম্বন কর, আল্লাহ তোমাকে একটি মর্যাদা দান করেন।'[১]

---

১. কাফি, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৯; মাকারিমুল আখলাক, পৃ. ১১৩; বিহারুল আনওয়ার, ২৩তম খণ্ড, পৃ. ১১৩
২. সহীহ বুখারী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৯
৩. বিহারুল আনওয়ার, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৪; ওয়াসায়েলুশ শিয়া, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ২০২; কাফি, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫০
৪. বিহারুল আনওয়ার, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৯৩
৫. ওয়াসায়েলুশ শিয়া, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ১২৬

ইবনে আব্বাস বলেন : 'আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম। তাঁর পুত্রসন্তান ইবরাহীম তাঁর বাম হাঁটুতে এবং ইমাম হুসাইন ডান হাঁটুর ওপর ছিল। মহানবী (সা.) কোনো সময় ইবরাহীমকে আবার কোনো সময় হুসাইনকে চুম্বন করছিলেন।'[২]

শিশুদের জন্য ন্যায়পরায়ণতা

পিতামাতাকে তাদের সন্তানদের ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে আর তা হলো তাদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা করা। সন্তানদেরকে প্রথম থেকেই ন্যায়পরায়ণতার স্বাদ আস্বাদন ও ন্যায়বিচারের সাথে পরিচিত করানো উচিত যাতে তারা এটিকে সমাজ ও তাদের জীবনের জন্য একটি প্রয়োজনীয় বিষয় বলে বিবেচনা করতে পারে। অন্যদিকে তাদের মধ্যে অবিচার ও নিপীড়ন করা থেকে বিরত থাকার অনুভূতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। অতএব, অতি ক্ষুদ্র বিষয়ও গুরুত্ব ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে সম্পাদন করা উচিত।

হযরত আলী (আ.) বলেন : "মহানবী (সা.) এক ব্যক্তিকে তার দুই সন্তানের সঙ্গে দেখলেন, যাদের একজনকে সে চুম্বন করল এবং অপরজনকে চুম্বন করল না। মহানবী (সা.) বললেন : 'তুমি তাদের সঙ্গে কেন ন্যায়বিচার করছ না?'"[৩]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী বলেন : 'একদিন মহানবী (সা.) তাঁর কন্যার বাড়িতে গেলেন। আলী (আ.) বিছানায় ঘুমাচ্ছিলেন এবং তাঁর সন্তানদ্বয় হাসান এবং হুসাইন তাঁর পাশে ছিল। তারা পানি চাইল। মহানবী (সা.) তাদের জন্য পানি আনলেন। হুসাইন প্রথমে সামনে এলো। মহানবী (সা.) বললেন : "হাসান প্রথমে পানি চেয়েছিল।' হযরত ফাতিমা (আ.) জিজ্ঞেস করলেন : 'আপনি কি হাসানকে বেশি ভালোবাসেন?' মহানবী (সা.) জবাব দিলেন : 'দুজনই আমার নিকট সমান। [কিন্তু ন্যায়পরায়ণতা এটাই দাবি করে যে, প্রত্যেকে পর্যায়ক্রমে পানি পান করবে।]'"[৪]

হযরত আনাস বলেন : 'এক ব্যক্তি মহানবীর সাথে বসেছিল। ঘরটির ভেতরে লোকটির ছেলে প্রবেশ করল। ছেলেটির বাবা তাকে চুম্বন করল এবং তাকে তার কোলে বসালো। এরপর সেই ব্যক্তির কন্যা আসল এবং ব্যক্তিটি তাকে চুম্বন করা ছাড়াই তার পাশে বসালো। মহানবী (সা.) বললেন : 'কেন তুমি তাদের সাথে ন্যায়বিচার করলে না?'[৫]

---

১. প্রাগুক্ত
২. ওয়াসায়েলুশ শিয়া, ৪৩তম খণ্ড, পৃ. ১৬১ এবং ২২তম খণ্ড, পৃ. ১৫৩; মানাকিবে ইবনে শাহর আ'শুব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪
৩. বিহারুল আনওয়ার, ১০৪তম খণ্ড, পৃ. ৯৭; নাওয়াদির রাভান্দি, পৃ. ৬
৪. মাজমাউল জাওয়ায়িদ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৭১
৫. মাজমাউল জাওয়ায়িদ, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮; মাকারিমুল আখলাক, পৃ. ১১৩

হযরত আলী (আ.) বলেন : 'তোমাদের সন্তানদের সাথে ন্যায়বিচার কর যেভাবে তোমরা নিজেদের সঙ্গে ন্যায়বিচারমূলক আচরণ প্রত্যাশা কর।'[১]

মহানবী (সা.) ফাতিমা (আ.)-কে চুম্বন করতেন

মহানবী (সা.) তাঁর কন্যা ফাতিমাকে ভালোবাসতেন এবং তাঁর স্বামী ও সন্তান থাকার পরও তাঁকে চুম্বন করতেন।

আবান ইবনে তাগলিব বলেন : 'মহানবী (সা.) প্রায়ই তাঁর কন্যা ফাতিমাকে চুম্বন করতেন।'[২]

ইমাম বাকির এবং ইমাম সাদিক (আ.) বলেন : 'মহানবী (সা.) ফাতিমাকে রাত্রিতে যখন ঘুমিয়ে থাকতেন তখন তাঁকে চুম্বন করতেন এবং তাঁর (রাসূলের) মুখমণ্ডল তাঁর (ফাতিমার) বুকে রেখে তাঁর জন্য দোআ করতেন।'[৩]

হযরত আয়েশা বলেন : "একবার মহানবী (সা.) ফাতিমা ঘাড়ে চুম্বন করলেন। আমি তাঁকে বললাম : 'হে নবী! আপনি ফাতিমার সঙ্গে এমন আচরণ করেন যা আপনি অন্য কারও সাথে করেন না।' মহানবী (সা.) বলেন : 'হে আয়েশা! যখনই আমি জান্নাতের দিকে আগ্রহ পোষণ করি তখনই আমি ফাতিমার ঘাড়ে চুম্বন করি।'"[৪]

কখন শিশুদেরকে চুমু দেয়া বন্ধ করা উচিত?

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারে, কত বছর বয়স থেকে শিশুদেরকে চুমু দেয়া বন্ধ করা উচিত? এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য আমরা ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের শরণাপন্ন হব।

ইসলাম সন্তানদের লালন-পালনের ক্ষেত্রে ৬ থেকে ১০ বছরের শিশুদের প্রতি বেশি মনোযোগ দেয় এবং আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ম-কানুন ও সন্তানদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে এর অনুসারীদেরকে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করে। অতএব, প্রায়োগিকভাবে এটি শিশুদের যৌন উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ করেছে যাতে তাদের মাঝে অনৈতিক চর্চার বিকাশ না ঘটে।

ইসলাম ছয় বছর বা তার অধিক বয়সের শিশুদেরকে যে কোন ধরনের যৌন উত্তেজনা থেকে দূরে রাখে এবং শিশুদের যৌন প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য পিতামাতাকে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার নির্দেশ দান করে।

---

১. বিহারুল আনওয়ার, ১০৪তম খণ্ড, পৃ. ৯২, হা. ১৬
২. প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৪২
৩. প্রাগুক্ত, ৪৩তম খণ্ড, পৃ. ৪২-৫৫
৪. যাখায়েরুল উকবা, পৃ. ৩৬; ইয়া নাবীউল মাওয়াদ্দাহ, পৃ. ২৬০

মহানবী (সা.) বলেন : 'একজন ছয় বছর বয়সী ছেলে কর্তৃক একজন ছয় বছর বয়সী মেয়ের চুমু গ্রহণ করা উচিত নয় এবং নারীদেরকে ছয় থেকে সাত বছর বয়সী ছেলেদের চুমু দেয়া থেকে বিরত থাকা উচিত।'[১]

মহানবী (সা.) ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইনকে চুম্বন করতেন

মহানবী (সা.) তাঁর কন্যা ফাতিমাকে চুমু দেয়ার সাথে সাথে ফাতিমার সন্তান হাসান ও হুসাইনকেও ভালোবাসতেন এবং তাঁদেরকেও চুমু দিতেন।

আবু হুরাইরা বলেন : "যখন মহানবী (সা.) হাসান ও হুসাইনকে চুম্বন করছিলেন তখন একজন আনসার তাঁকে বলল : 'আমার দশজন সন্তান আছে যাদের কাউকে আমি কখনও চুম্বন করি নি।' মহানবী (সা.) জবাব দিলেন : 'যে করুণা প্রদর্শন করে না তাকেও করুণা প্রদর্শন করা হবে না।'[২]

হযরত সালমান ফারসি বলেন : 'আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে আসলাম এবং দেখতে পেলাম যে, তিনি হাসানকে তাঁর কোলের ওপর নিয়েছেন এবং তার কপাল ও ঠোঁটে চুম্বন করছেন।'[৩]

ইবনে আবি আদ-দানিয়া বলেন : 'যায়েদ ইবনে আরকাম, উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের দরবারে দেখেন যে, সে ইমাম হুসাইনের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন মাথার ঠোঁটে তার বেত দিয়ে আঘাত করছে। যায়েদ ইবনে আরকাম বলেন : 'উবায়দুল্লাহ! তোমার ছড়িটি সরিয়ে নাও। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যে, আমি মহানবী (সা.)-কে এই ঠোঁট দুটিতে বহুবার চুম্বন করতে দেখেছি।' তিনি এটি বলে কান্না শুরু করেন। উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ বলে : 'আল্লাহ যেন তোমাকে কাঁদায়। তুমি যদি একটি জীর্ণ বৃদ্ধ না হতে তবে আমি তোমার শিরোশ্ছেদের হুকুম জারি করতাম।'"[৪]

জামাখশারী বলেন : "মহানবী (সা.) হাসানকে জড়িয়ে ধরেন এবং চুম্বন করেন। এরপর তিনি তাঁকে তাঁর উরুতে বসান এবং বলেন : 'আমার নম্রতা, ধৈর্য এবং মর্যাদা আমি তাকে দিয়েছি।' অতঃপর তিনি হুসাইনকে জড়িয়ে ধরেন এবং চুম্বন করে তাঁকে তাঁর বাম উরুতে বসান এবং বলেন : 'আমি তাকে আমার সাহস, মহত্ত্ব এবং উদারতা দিয়েছি।'"[৫]

---

১. মাকারিমুল আখলাক, পৃ. ১১৫
২. মুসতাদরাকুল হাকীম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭০; আল আদাবুল মুফরাদ, বুখারী, পৃ. ৩৪
৩. বিহারুল আনওয়ার, ৩৬তম খণ্ড, পৃ. ২৪১; কামালুদ্দীন ও তামামুন নিআমাহ, পৃ. ১৫২; আল-খিসাল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬; কিফায়াউল আতহার, পৃ. ৭
৪. আসসাওয়ায়িকুল মুহরিকাহ, পৃ. ৫১৩
৫. রাবিউল আবরার, পৃ. ৫১৩

শিশুদের সাথে খেলাধুলা

শিশুদের ব্যক্তিত্বে প্রভাব বিস্তারকারী আরেকটি বিষয় হলো তাদের খেলাধুলায় বড়দের অংশগ্রহণ। শিশুরা বড়দের আচরণকে অনুকরণ করতে চায়। কারণ, প্রথমত, তার শারীরিক দুর্বলতার জন্য এবং দ্বিতীয়ত, সে যে শক্তি ও ক্ষমতা বড়দের মধ্যে দেখে এবং তার নিজের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য তার যে সহজাত প্রবণতা রয়েছে সে কারণে।

যখন পিতামাত তাদের সন্তানদের পর্যায়ে নেমে আসে এবং তাদের খেলাধুলায় অংশ নেয়, তখন শিশুরা নিশ্চিতভাবেই খুশি হয়, উদ্দীপ্ত হয় এবং নিজেদের মধ্যে অনুভব করে যে, সে যে কাজটি করছে সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং, শিশুদের লালন-পালনের অংশ হিসেবে তাদের সাথে খেলাধুলায় অংশ নেয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মনস্তত্ত্ববিদগণ কর্তৃক এটি পিতামাতার দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত।

টি এম মরিস তাঁর 'পিতামাতার জন্য শিক্ষা' গ্রন্থে বলেন : 'আপনাদের শিশুদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হোন এবং তাদের সাথে খেলা করুন। তাদেরকে গল্প শোনান এবং তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ কথাবার্তা বলুন। পিতামাতার বিশেষ করে জানা উচিত যে, তাদেরকে তাদের সন্তানদের পর্যায়ে নেমে আসতে হবে এবং তারা যে ভাষা বোঝে সেই ভাষায় কথা বলতে হবে।'[১]

আরেকজন মনস্তত্ত্ববিদ বলেন : 'পিতার জন্য দরকার হলো তার সন্তানের বিনোদন ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করা। এই পারস্পরিক বোঝাপড়াটা প্রয়োজন। নিঃসন্দেহে জীবনের নানা সময়, স্থান ও পর্যায় রয়েছে। যে পিতা তার সন্তানের খেলাধুলায় অংশ নেয় নিশ্চয় সে এর জন্য খুব বেশি সময় ব্যয় করে না, কিন্তু সে তার সন্তানের ক্ষেত্রে এ বাস্তবতার ব্যাপক গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতেন যে, সে তার সন্তানের সাথে খেলার সময় তার পর্যায়ে নেমে আসে, তাই যত কম সময়ই হোক না কেন, যা পিতা এজন্য ব্যয় করে।[২]

শিশুদের খেলাধুলা করার প্রবণতা

অন্যতম যে প্রবণতা মহান আল্লাহ একজন শিশুর মধ্যে দিয়েছেন তা হলো খেলাধুলার প্রতি ঝোঁক। শিশুরা দৌড়ায়, লাফালাফি করে, কখনো খেলনার মাধ্যমে আমোদিত হয় এবং সেগুলোকে চারিদিকে নড়াচড়া করার মাধ্যমে আনন্দ লাভ করে। যদি

১. উই অ্যান্ড আওয়ার চিলড্রেন, পৃ. ৪৫
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

শুরুতে এমন কাজকর্ম অনর্থক মনে হতে পারে, কিন্তু এগুলো তাদের কোমল শরীর ও অন্তরের বিকাশের জন্য এবং তাদের চিন্তাশক্তি ও উদ্ভাবনী শক্তিকে উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয়। সম্ভবত এ কারণেই হাদীসে শিশুদের সাথে খেলাধুলা করার উপদেশ দেয়া হয়েছে।

শিশুদের সাথে খেলা একটি অনুশীলন যা তাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বিকাশ এবং তাদের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে জাগ্রত করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যখন একজন শিশু তার খেলনা উপকরণ দিয়ে একটি কাঠামো তৈরি করে তখন তার চিন্তাপ্রক্রিয়া একজন কনস্ট্রাকশান ইঞ্জিনিয়ারের মতো কাজ করে এবং সে তার সফলতায় আনন্দিত হয়। যখন সে তার কাজে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন সে তার সমাধানের পথ খোঁজে। ফলে তার সকল কর্মকাণ্ড তার ব্যক্তিত্বকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করে।

মহানবী (সা.) বলেন : 'এমন ব্যক্তি যার সাথে একটি সন্তান আছে তার সাথে শিশুর মতো আচরণ করো।'[১]

মহানবী (সা.) আরো বলেন : 'সেই পিতার ওপর আল্লাহর কৃপা বর্ষিত হোক যে উত্তম নিয়তে তার সন্তানকে সাহায্য করে, তার সাথে সদাচরণ করে, তার বন্ধু এবং তাকে ভালোভাবে শিক্ষিত করে।'[২]

আলী (আ.) বলেন : 'সাত বছর বয়স পর্যন্ত তোমার সন্তানকে খেলাধুলার জন্য মুক্তভাবে ছেড়ে দাও।'[৩]

ইমাম সাদিক (আ.) বলেন : 'শিশু তার জীবনের প্রথম সাত বছর খেলাধুলা করে, পরবর্তী সাত বছর শিক্ষায় ব্যয় করে এবং পরবর্তী সাত বছর ধর্মীয় হালাল ও হারাম শিক্ষা করে।'[৪]

আলী (আ.) আরো বলেন : 'যার একজন শিশুসন্তান রয়েছে তাকে তার সন্তানকে প্রশিক্ষণ দেয়ার সময় শিশুসুলভ আচরণ করতে হবে।'[৫]

মহানবী (সা.) শিশুদের সাথে খেলা করেছেন

---

১. ওয়াসায়েলুশ শিয়া, ৫তম খণ্ড, পৃ. ২০৩; মান লা ইয়াহদুরুহুল ফাকীহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১২; কানযুল উম্মাল, বক্তব্য ৪৫৪১৩
২. মুসতাদরাকুল ওয়াসায়েল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৬
৩. আল-কাফি, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৭
৪. প্রাগুক্ত
৫. ওয়াসায়েলুশ শিয়া, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২৬

মহানবী (সা.) তাঁর সন্তান ইমাম হাসান ও হুসাইনের সাথে খেলা করেছেন। এ সম্পর্কিত অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যার কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো :

বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) প্রতিদিন সকালে তাঁর সন্তান ও নাতিদের মাথায় চুমু দিতেন এবং ইমাম হুসাইনের সাথে খেলা করতেন।[১]

ইয়ালা বিন মুররা বলেন : "মহানবী (সা.) দুপুরের খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। আমরা তাঁর সাথে ছিলাম, হঠাৎ আমরা হাসানকে গলিপথে খেলতে দেখলাম। মহানবী তাকে দেখলেন এবং তাকে ধরার জন্য দুই হাত প্রসারিত করে দৌড়ে গেলেন। হাসান তার থেকে পালানোর জন্য এদিক-ওদিক দৌড়াতে লাগল যা মহানবীর হাসির উদ্রেক করল। মহানবী (সা.) হাসানকে ধরে ফেললেন। তিনি তার একটি হাত তার চিবুকের নিচে এবং অন্য হাত তার মাথার ওপর রাখলেন। তিনি তাঁর মুখ শিশুটির কাছে নিলেন এবং তাকে এই বলে চুম্বন করলেন : 'হাসান আমার একটি অংশ এবং আমি তার অংশ। যারা তাকে ভালোবাসে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসবেন।'[২]

অনেক বর্ণনায় এসেছে যে, এটি ইমাম হুসাইনের সাথে সম্পর্কিত একটি ঘটনা (ইমাম হাসানের সাথে সম্পর্কিত নয়)।[৩]

ইমাম সাদিক (আ.) বলেন : "একদিন ইমাম হুসাইন মহানবীর কোলে বসেছিলেন এবং মহানবী তাঁর সাথে খেলা করছিলেন ও হাসছিলেন। আয়েশা বললেন : ' হে নবী! আপনি এই শিশুর সাথে অনেক বেশি খেলা করেন।' মহানবী (সা.) বলেন : 'কেন নয়, কী করে আমি তাকে ভালো না বেসে থাকতে পারি যখন সে আমার অন্তরের ফল এবং আমার চোখের মণি?!'"[৪]

জাবির বিন আবদুল্লাহ বলেন : 'মহানবী (সা.) তাঁর সঙ্গী ও সহচরদের সন্তানদের সাথে খেলা করতেন এবং তাদেরকে তাঁর পেছনে বসতে দিতেন।'[৫]

আনাস বিন মালিক বলেন : 'লোকজনের মাঝে মহানবী (সা.) ছিলেন সর্বোত্তম আচরণের অধিকারী। আমার একটি দুগ্ধপোষ্য ছোট ভাই ছিল এবং আমি তার

---

১. সুনান আননাবী, রাহমাতে আলামীন, ৬৫৮তম খণ্ড; বিহারুল আনওয়ার, ৪৩তম খণ্ড, পৃ. ২৮৫
২. বিহারুল আনওয়ার, ৪৩তম খণ্ড, পৃ, ৩০৬
৩. মুসতাদরাকুল ওয়াসায়েল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৬; সহীহ তিরমিযী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬১৫; মুসতাদরাকুল হাকেম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৭
৪. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ. ২৬০; কামিলুয যিয়ারাহ, পৃ. ৬৮; হায়াতুল হায়াওয়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১১
৫. শারাফুন্নবী, খারগুশী, পৃ. ১০২; নিহায়াহ আল মাসুল ফি রিওয়াইয়াহ আর রাসূল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪০

দেখভাল করতাম। তার ডাকনাম ছিল আবু উমাইর। যখন মহানবী (সা.) তাকে দেখলেন, তিনি বললেন : 'দেখ এই দুগ্ধপোষ্য শিশুটি তোমার কী অবস্থা করেছে!' এরপর তিনি তার সাথে খেলা করতে শুরু করলেন।"[১]

একটি বর্ণনায় এসেছে যে, মহানবী (সা.) আব্বাসের সন্তানদেরকে ডাকতেন। তারা যুবক ছিল এবং তখনও খেলাধুলা করতে ভালোবাসত। তিনি তাদেরকে বলতেন : 'যে আমার কাছে সবচেয়ে দ্রুত আসতে পারবে সে পুরস্কৃত হবে।' তারা মহানবীর কাছে আসার জন্য দৌড় প্রতিযোগিতা করত। তিনি তাদেরকে জড়িয়ে ধরতেন এবং চুমু খেতেন।[২] কখনো কখনো তিনি তাদেরকে তার পিছনে আরোহণ করাতেন এবং তাদের মাথায় চুমু খেতেন।[৩]

বাহনে আরোহণ করানো

মহানবী (সা.) যখন বাহনে আরোহিত অবস্থায় থাকতেন তখন শিশুদেরকে কখনো তাঁর বাহনের সামনে, আবার কখনো তাঁর বাহনের পিছনে আরোহণ করাতেন। এটি শিশুদের ওপর বিরাট ইতিবাচক মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ফেলত, যেহেতু তারা এটাকে খুব মূল্যবান ও অবিস্মরণীয় বিষয় বলে বিবেচনা করত।

মহানবী (সা.) কখনো তাঁর পিঠে এবং কখনো তাঁর কাঁধে শিশুদেরকে বহন করতেন। এখানে তার কিছু তুলে ধরা হলো।

মহানবীর সাহাবী জাবির বলেন : "আমি মহানবীর কাছে এসেছিলাম যখন হাসান ও হুসাইন তাঁর পিঠে ছিল। মহানবী (সা.) হামাগুড়ি দিয়ে চলছিলেন এবং বলছিলেন : 'তোমাদের একটি উত্তম বাহন রয়েছে আর তোমরাও উত্তম আরোহী।'"[৪]

ইবনে মাসউদ বলেন : "মহানবী (সা.) হাসান ও হুসাইনকে তাঁর পিঠে বহন করছিলেন; হাসান ছিল ডান দিকে আর হুসাইন ছিল বাম দিকে; তিনি বলছিলেন :

১. সহীহ বুখারী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৭ ও ৫৫; দালায়েলন নুবুওওয়াহ্, বায়হাকী, পৃ. ১৫৪
২. আসসীরাতুলা হালাভীয়্যাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪০; উসদুল গাবাহ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১০; মাজমাউল জাওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫
৩. মাজমাউল জাওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫; মুসনাদে আহমাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৭
৪. ইহকাকুল হাক, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৭১৪; বিহারুল আনওয়ার, ৪৩তম খণ্ড,পৃ. ২৮৫; সুনানে নাসাঈ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৯; মুসতাদরাকুল হাকেম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৬; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৮২

'তোমাদের একটি উত্তম বাহন রয়েছে আর তোমরা উত্তম আরোহী। তোমাদের পিতা তোমাদের চেয়ে উত্তম।'"[১]

মহানবী (সা.) শিশুদেরকে তাঁর বাহনে চড়তে দিতেন

মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের সন্তানদের সাথে নিজের সন্তানদের মতো আচরণ করতেন এবং তিনি তাঁর বাহনে তাদেরকে চড়তে দিতেন। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা হলো :

আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আবি তালিব বলেন : 'একদিন মহানবী (সা.) আমাকে তাঁর পিছনে আরোহণ করালেন এবং আমাকে এমন কিছু বললেন যা আমি কাউকে বলব না।'[২]

বর্ণিত হয়েছে যে, যখনই মহানবী (সা.) কোন সফর থেকে ফিরতেন এবং শিশুদেরকে দেখতেন, তখনই তিনি থামতেন এবং অন্যদেরকে নির্দেশ দিতেন শিশুদেরকে তাঁদের বাহনে তুলে নিতে এবং তিনি নিজে একজনকে সামনে ও একজনকে পেছনে নিতেন। কিছুক্ষণ পরই তারা পরস্পরকে বলত : 'মহানবী আমাকে তাঁর সামনে বসিয়েছেন আর তুমি পেছনে বসেছিলে।' কেউ কেউ বলত : 'মহানবী (সা.) তাঁর সঙ্গীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন তোমাকে তাঁদের পেছনে আরোহণ করানোর জন্য।'[৩]

ফুযাইল ইবনে ইয়াসার বলেন : "আমি ইমাম বাকের (আ.)- কে বলতে শুনেছি : 'মহানবী (সা.) কোথাও যাওয়ার সময় ফুযাইল ইবনে আব্বাসকে দেখেন। তিনি তাঁর সাথিদেরকে বলেন : 'এই শিশুটিকে আমার পেছনে আরোহন করাও।' তাঁরা শিশুটিকে তাঁর পেছনে বসালেন এবং তিনি তার ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিলেন।"[৪]

আবদুল্লাহ ইবনে জাফর বলেন : "আমি আব্বাসের সন্তানদ্বয় কুশাম ও উবায়দুল্লাহর সাথে ছিলাম এবং আমরা খেলছিলাম। মহানবী (সা.) আমাদের পাশ দিয়ে গেলেন এবং বললেন : 'এই শিশুটিকে তোল এবং আরোহন করাও।' তাঁরা আবদুল্লাহকে উঠিয়ে মহানবীর সামনে বসালেন। তখন মহানবী (সা.) বললেন : 'এই শিশুটিকেও আন।' তাঁরা কুশামকেও আনলেন এবং মহানবীর পিছনে বসালেন।"[৫]

---

১. বিহারুল আনওয়ার, ৪৩তম খণ্ড, পৃ. ২৮৬
২. মসুনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৫; সহীহ মুসলিম, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ১৯৭
৩. আলমুহাজ্জাতুল বাইদা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৬
৪. বিহারুল আনওয়ার, ৭৭তম খণ্ড, পৃ. ১৩৫; আমালী আসসাদুক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৭
৫. মাজমাউল জাওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫; মুসনাদে আহমাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৭

মহানবী (সা.) শিশুদেরকে তাঁর কাঁধে যেভাবে বহন করতেন তার কয়েকটি সম্পর্কে বলা হয়েছে :

১. তিনি তাঁর কাঁধে শিশুদের এমনভাবে বসাতেন যে, তাঁরা পরস্পরের মুখোমুখী হতেন।

২. কখনও এমনভাবে বসাতেন যে, শিশুর পিঠ তাঁর মুখের দিকে থাকত।

৩. তিনি একজনকে তাঁর ডান কাঁধে ও অপরজনকে তাঁর বাম কাঁধে বসাতেন।

৪. কখনও কোন শিশুকে তাঁর ডান কাঁধে বসাতেন যার মুখ তাঁর মুখের দিকে থাকত এবং যাকে বাম কাঁধে বসাতেন তার পিঠ তাঁর মুখের দিকে থাকত।[১]

শিশুদের খাওয়ানো

শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যতম বড় বিষয় হলো তাদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখা। সুতরাং, একের অধিক শিশুর পিতামাতার উচিত তাদের সাথে ন্যায়পরায়ণতা, স্বচ্ছতা ও সমতার ভিত্তিতে আচরণ করা এবং অনুশীলনে সকলকে শামিল করা যাতে কেউ নিজেকে অপমানিত মনে না করে। এভাবেই মহানবী (সা.) তাঁর সন্তানদের সাথে আচরণ করতেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত ঘটনাগুলো বর্ণিত হয়েছে।

আলী (আ.) বলেন : "মহানবী (সা.) আমাদের বাড়িতে আসলেন যখন আমি, হাসান ও হুসাইন একটি কম্বলের নিচে ঘুমিয়ে ছিলাম। হাসান পানি চাইল। মহানবী (সা.) উঠে একটি পানির পাত্র আনলেন। একই সময়ে হুসাইন জেগে উঠল এবং পানি চাইল, কিন্তু মহানবী (সা.) প্রথমে তাকে পানি দিলেন না।

ফাতিমা বলল : 'মনে হয় আপনি হাসানকে হুসাইনের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন।' মহানবী (সা.) বললেন : 'হুসাইনের পানি চাওয়ার আগে হাসান পানি চেয়েছিল। তুমি, হাসান এবং হুসাইন আর যে ব্যক্তি ঘুমিয়ে আছে এবং আমি কিয়ামত দিবসে একই স্থানে থাকব।'"[২]

মহানবী (সা.) তাঁর সন্তানদেরকেও খাওয়াতেন। এগুলো প্রকাশ করে যে, তিনি তাঁর সন্তানদের প্রয়োজনের প্রতি কীভাবে পূর্ণ মনোযোগ দিতেন!

সালমান ফারসি বলেন : "আমি মহানবীর গৃহে প্রবেশ করলাম। হাসান ও হুসাইন তাঁর সাথে খাবার খাচ্ছিল। মহানবী (সা.) কিছু খাবার হাসানের মুখে দিচ্ছিলেন এবং

১. মানাকিবে ইবনে শাহরে আ'শুব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৭; বিহারুল আনওয়ার, ৪৩তম খণ্ড, পৃ. ২৮৫
২. মাজমাউল জাওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৬৯

কিছু খাবার হুসাইনের মুখে দিচ্ছিলেন। যখন তাঁরা খাওয়া শেষ করলেন তখন মহানবী হাসানকে তাঁর কাঁধে নিলেন এবং হুসাইনকে তাঁর কোলে বসালেন। এরপর তিনি আমার দিকে মুখ করলেন এবং বললেন : 'হে সালমান! তুমি কি তাদেরকে পছন্দ কর?' আমি বললাম : 'হে নবী! কীভাবে আমি তাদেরকে পছন্দ করব না যখন আমি আপনার নিকট তাদের অবস্থান ও মূল্য প্রত্যক্ষ করি।'"[১]

শিশুদেরকে সালাম দেয়া

মহানবী (সা.)-এর আরেকটি অভ্যাস ছিল শিশুদেরকে সালাম দেয়া। যদিও তারা ছোট, আমুদে এবং সকল ধরনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত, তবু তারা খুব চালাক এবং মমতা ও ভালোবাসার অর্থ তারা বেশ ভালোভাবেই বোঝে।

মহানবীর এই অভ্যাস কতিপয় অদূরদর্শী লোকের মতাদর্শের বিপরীত, যাদের কাছে শিশুদের কোন স্থান নেই এবং তারা শিশুদেরকে তাদের থেকে পৃথক ও গুরুত্বহীন বলে বিবেচনা করে। কিন্তু ইসলামে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা বড়দের মতোই সম্মান পাওয়ার যোগ্য। হ্যাঁ, মহানবী (সা.) শিশুদেরকে সম্মান করতেন এবং সমাজে তাদের উপস্থিতিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। শিশুদেরকে সালাম দেয়ার ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আনাস ইবনে মালিক বলেন : 'মহানবী কিছুসংখ্যক শিশুর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে সালাম দিলেন এবং তাদেরকে খাবার দিলেন।'[২]

তিনি আরেকটি বর্ণনায় বলেন : 'যখন আমরা শিশু ছিলাম, তখন মহানবী আমাদের নিকট আসতেন এবং আমাদেরকে সালাম দিতেন।'[৩]

ইমাম বাকির (আ.) বলেন : "মহানবী (সা.) বলেছেন : 'মৃত্যু পর্যন্ত আমি পাঁচটি জিনিস পরিত্যাগ করব না। এগুলোর অন্যতম হলো শিশুদেরকে সালাম দেয়া।'[৪]

১. বিহারুল আনওয়ার, ৩৬তম খণ্ড, পৃ. ৩০৪; কিফায়াহ আল-আতহার, পৃ. ৭
২. সুনানে ইবনে মাজাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২২০
৩. মাকারিমুল আখলাক, পৃ. ১৪ ও ৩১; বিহারুল আনওয়ার, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ২২৯
৪. মুসতাদরাকুল ওয়াসায়েল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৬; আমালী আসসাদুক, পৃ. ৪৪; উয়ুনু আখবারির রিযা (আ.), পৃ. ২৩৫; আল-খিসাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩০; ইলালুশ শারাঈ, পৃ. ৫৪; বিহারুল আনওয়ার, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ২১৫, হা. ২

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে যে, মহানবী (সা.) ছোট-বড় সকলকে সালাম দিতেন।[১] তিনিই প্রথমে অন্যদেরকে সালাম দিতেন, এমনকি শিশুদেরকেও।[২] তিনি যাকেই দেখতেন, তাকেই প্রথমে সালাম করতেন এবং মুসাফাহা করতেন।'[৩]

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, মহানবী (সা.) বলেন : 'আমি শিশুদেরকে সালাম দেয়ার ব্যাপারে খুবই সতর্ক যাতে তা মুসলমানদের মধ্যে একটি প্রথায় পরিণত হয় এবং সকলের জন্য তা অভ্যাসে পরিণত হয়।'[৪]

মহানবী (সা.) কি শিশুদের শাস্তি দিয়েছেন?

মহানবী (সা.) কি প্রশিক্ষণ দানের ক্ষেত্রে শিশুদেরকে শারীরিক শাস্তি দিয়েছেন?

মহনবীর অভ্যাস ও আচরণ নিয়ে সতর্ক অধ্যয়ন থেকে প্রকাশিত হয় যে, তিনি কখনোই শিশুদেরকে শারীরিকভাবে শাস্তি দেন নি। কতক শাস্তি প্রদান অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এমন কোন শিশুকে খুঁজে পাওয়া বিরল যে, তার লালন-পালনের ক্ষেত্রে শাস্তিপ্রাপ্ত হয় নি বা কঠোর আচরণের সম্মুখীন হয় নি। যা এখানে আলোচনা করা হবে তা হলো কেউ কি তার সন্তানকে শারীরিকভাবে শাস্তি প্রদান করতে পারে।

হাদীসসমূহ এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের আচরণের ওপর গবেষণা করে যা পাওয়া গিয়েছে তা হলো, কখনওই শিশুকে শারীরিকভাবে শাস্তি দেয়া উচিত নয়। বর্তমান বিশ্বে, আচরণগত সংশোধনের জন্য শিশুকে প্রহার করা বা তার ক্ষতি করা বৈজ্ঞানিক এবং শিক্ষাসংক্রান্ত দৃষ্টিতে বেঠিক এবং প্রায় সকল দেশ এমন প্রহার ও শারীরিক শাস্তিদানকে নিরোধ করেছে।

যদিও কতিপয় লোক যারা অজ্ঞ এবং ইসলাম ধর্মের নেতৃবৃন্দের রীতি সম্পর্কে অনবহিত তারা এ বিষয়ে অমনোযোগী থেকেছে এবং শিশুদের প্রহার সংক্রান্ত হাদীসসমূহের প্রতি মনোযোগ দেয় না।

ইমাম কাযিম (আ.) এক ব্যক্তিকে–যে তার সন্তানের ব্যাপারে অভিযোগ করছিল–স্পষ্টভাবে বলেছেন : 'তোমার সন্তানকে প্রহার করো না, তাকে শাস্তি দেয়ার

১. মুসতাদরাকুল ওয়াসায়েল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৯
২. রাহমাতে আলামীন, পৃ. ৬৬৩
৩. নিহায়াহ আল মাসুল ফি রিওয়ায়াহ্ আর রাসূল, ১/৩৪১; মাকারিমুল আখলাক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩
৪. ওয়াসায়েলুশ শিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৯

জন্য শুধু তার সাথে কথা বলতে অস্বীকার কর। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলা বন্ধ করার ব্যাপারে সতর্ক থেকে এবং যত দ্রুত সম্ভব তার সাথে পুনর্মিলিত হও।'[১]

মহানবী (সা.) তাঁর সন্তানদেরকে কখনই শারীরিকভাবে শাস্তি দেন নি এবং যারা তা করত তাদের প্রতি ভীষণভাবে বিরোধিতা করতেন। ইসলামের ইতিহাসে এর অনেক দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আবু মাসউদ আনসারী বলেন : "আমার একটি দাস ছিল যাকে আমি প্রহার করেছিলাম। আমি আমার পিছন থেকে একটি আওয়াজ শুনলাম : 'আবু মাসউদ! আল্লাহ তোমাকে তার ওপর ক্ষমতা দিয়েছেন [তাকে তোমার দাস বানিয়েছেন]।' আমি পিছনে ফিরলাম এবং মহানবী (সা.)-কে দেখলাম।"

"আমি মহানবীকে বললাম : 'আমি তাকে আল্লাহর জন্য মুক্ত করে দিলাম।' মহানবী জবাব দিলেন : 'যদি তুমি তা না করতে, তাহলে জাহান্নামের আগুন তোমাকে গ্রাস করত।'"[২]

ইমাম সাদিক (আ.) বলেন : "মহানবী (সা.) বনি ফাহাদের এক লোককে দেখলেন যে তার দাসকে প্রহার করছিল এবং দাসটি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে বলছিল : 'হে আল্লাহ! আমাকে সাহায্য কর।' কিন্তু লোকটি তাতে কর্ণপাত করছিল না। যখন সেই দাসটি মহানবীকে দেখল, সে নিজেকে বলল : 'আমি তাঁর [মহানবীর] কাছ থেকে সাহায্য পাব।' দাসের মালিক প্রহার করা থেকে নিবৃত্ত হলো।"

"মহানবী (সা.) মালিককে বললেন : 'আল্লাহকে ভয় করো। তাকে প্রহার করা বন্ধ করো। তাকে আল্লাহর জন্য ক্ষমা করে দাও।' এরপরও লোকটি তাকে মুক্ত করে দিতে অস্বীকার করল। মহানবী (সা.) বললেন : 'মুহাম্মাদের জন্য তাকে ছেড়ে দাও, কিন্তু কাউকে মুহাম্মাদের কারণে ছেড়ে দেয়ার চেয়ে আল্লাহর জন্য ছেড়ে দেয়া উত্তম।'"

"লোকটি বলল : 'আমি দাসটিকে আল্লাহর জন্য মুক্ত করে দিলাম।' মহানবী (সা.) বললেন : 'আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যিনি আমাকে নবী হিসেবে মনোনীত করেছেন যে, যদি তুমি তাকে মুক্ত করে দিতে অস্বীকার করতে তাহলে জাহান্নামের আগুন তোমাকে আলিঙ্গন করত।'"[৩]

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মহানবী (সা.) এমনকি অপকর্মকারী শিশুদেরকেও শাস্তি দেন নি এবং তাদের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল দয়ার্দ্র। বর্ণিত হয়েছে যে, যখন

১. বিহারুল আনওয়ার, ১০৪তম খণ্ড, পৃ. ৯৯, হা. ৭৪; ইদ্দাহ আর দাঈ, পৃ. ৬১
২. বিহারুল আনওয়ার, ৭৪তম খণ্ড, পৃ. ১৪৩, হা. ১৫
৩. প্রাগুক্ত, হা. ১৫

মুসলমান সৈন্যরা উহুদ যুদ্ধের জন্য বের হলেন তখন সেখানে কয়েকজন শিশু ছিল যারা যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে প্রচণ্ড আগ্রহী ছিল। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল রাফী বিন খাদীয। মহানবীকে বলা হলো যে, সে একজন ভালো তীরন্দায। মহানবী (সা.) তাকে সৈন্যদলে যোগ দেয়ার অনুমতি দিলেন।

আরেকজন শিশু ছিল যে চিৎকার করে উঠল যে, সে রাফীর চেয়ে শক্তিশালী। মহানবী (সা.) তাদের দুজনকে কুস্তি করার জন্য বললেন। রাফী পরাজিত হলো। এরপর মহানবী (সা.) তাদের উভয়কে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দিলেন।[১]

শারীরিক শাস্তিকে কখনই শিশুদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণের জন্য ফলাফল নির্ধারণী উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। বিশেষ করে, যদি এই রীতি দীর্ঘদিন চলতে থাকে তাহলে এটি ফলপ্রসূ হওয়ার পরিবর্তে শিশুর ব্যক্তিত্বের হানি ঘটায়। উপরন্তু শিশুরা এটিকে স্বাভাবিক রীতি বলে বিবেচনা করতে পারে, একে পরিহার করার জন্য কিছু করে না এবং যখন এর সম্মুখীন হয় তখন কোন কিছু মনে করে না।

ইমাম আলী (আ.) বলেন : 'জ্ঞানী ব্যক্তিরা উত্তম আচরণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ করে। পশুরাই প্রহারের মাধ্যমে সংশোধিত হয়।'[২]

শারীরিক শাস্তি দান থেকে বিরত থাকা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বে যারা আইন ভঙ্গ করে তাদের ক্ষেত্রে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রহার করা যাবে না; বরং তাদেরকে সংশোধন করতে হবে।[৩]

সুতরাং, ইসলামের নবী বা ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের ইতিহাসে শিশুদের প্রশিক্ষণ দানের ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রহার করার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁরা সবসময়ই দয়ালু বন্ধু এবং প্রেমময় নেতা ছিলেন– যাঁরা শিশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। আচরণের এই পদ্ধতি বিভিন্ন কাল ও স্থানের ইসলামের অনুসারীদের জন্য এ দিকটি উন্মোচন করে দেয় যে, ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট সময়, স্থান, বর্ণ বা দলের জন্য নয়; বরং এটি সকল কালের, সকল স্থানের এবং সকল মানুষের ধর্ম।

১. ইসলাম ওয়া তারবীয়াতে কুদেকা'ন (ইসলাম ও শিশুদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ), ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৪
২. শারহে গুরারুল হিকাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০, হা. ৮১
৩. মুসতাদরাকুল ওয়াসায়েল, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২৩

ইসলামি পরিবারে পুরুষ ও নারীর ভূমিকা

এ. কে. এম. আনোয়ারুল কবীর

পরিবার একটি সামাজিক ক্ষুদ্র একক যার সদস্যদের ভাল-মন্দ যে কোন আচরণ ও কর্মের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব সমাজের বৃহত্তর পরিসরে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। পরিবারের ভিত্তি পুরুষ ও নারীর বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে স্থাপিত হয়। এ বন্ধনের ফলে নারী ও পুরুষের ওপর অনেক দায়িত্বও আরোপিত হয়। আর এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালিত হলেই কেবল পরিবারে সুন্দর সম্পর্ক ও প্রশান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং নৈতিক শিক্ষায় বলীয়ান সুষ্ঠু সমাজের বিষয় নিশ্চিত হয়। যদি পরিবারে পুরুষ ও নারী পরস্পরকে ভালবাসে ও একে অপরের প্রতি দায়িত্ববান হয় তাহলে সন্তানদের বিকাশ ও শিক্ষার উপযোগী ক্ষেত্র তৈরি হয়। পারিবারিক দায়িত্বের গণ্ডি বেশ ব্যাপক ও তা পালন করাও বেশ কঠিন। পরিবারকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যে আচরণের ক্ষেত্রে ভারসাম্য থাকা আবশ্যক। এক্ষেত্রে কঠোরতা যেমন অশান্তি, অসন্তুষ্টি, গোঁয়ার্তুমি ও অন্যান্য জটিলতার জন্ম দেয় তেমনি অক্ষমতা, দুর্বলতা ও অবহেলা প্রদর্শন নৈতিক বিচ্যুতি ও পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞায় পর্যবসিত হয়। তাই ইসলামি পরিবারে নারী ও পুরুষের অবস্থান এবং তাদের আইন ও নীতিগত অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা সকলের জন্য আবশ্যক।

নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃতি ও স্বভাবগত পার্থক্য

নারী-পুরুষের মধ্যে সৃষ্টিগত পার্থক্য রয়েছে অর্থাৎ নারী ও পুরুষের দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক গঠন ও যোগ্যতার ক্ষেত্রগত ভিন্নতা অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃতি ও সৃষ্টিগতভাবে নির্ধারিত। এ পার্থক্যকে অবশ্যই ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতে হবে। কারণ, প্রকৃতিতে প্রত্যেক সৃষ্টি বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিশেষ বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হয়েছে। যদি তার বৈশিষ্ট্যগুলোকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার না করা হয় তবে তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলবে ও লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হবে। আর এটা তার প্রকৃতির ওপরও স্পষ্ট অবিচার। যেহেতু আইন এসেছে সামাজিক জীবনে প্রত্যেক সত্তার প্রয়োজন পূরণের অধিকারকে নিশ্চিত করতে, সেহেতু আইনকে অবশ্যই এই

প্রকৃতিগত পার্থক্যকে স্বীকার করেই অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে। ইসলামি আইনে কর্তব্য ও অধিকার এ প্রকৃতিগত চাহিদা ও যোগ্যতাকে সামনে রেখেই প্রবর্তিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলছেন :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نحنُ قَسَمْنَا بَيْنهم مَّعِيشَتهمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّ اوَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيرٌ مِّمَّا يجمَعُون

'তারা কি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ বণ্টন করে? (বরং) আমরাই তাদের মধ্যে তাদের পার্থিব জীবনে জীবনোপায় বণ্টন করি এবং কতককে কতকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করি যাতে একে অপরের থেকে সেবা গ্রহণ করতে পারে এবং তারা যা সঞ্চয় করে তা অপেক্ষা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উত্তম।'

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা যায়, যদি সকল মানুষ বুদ্ধি এবং দৈহিক ও আত্মিকভাবে একইরূপ শক্তি, ক্ষমতা ও যোগ্যতার অধিকারী হত তবে সমাজই তৈরি হত না। যেমনভাবে দেহে যদি বৈচিত্র্যময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ না থাকত ও সেগুলোর প্রতিটি স্বতন্ত্র ধরনের কাজ না করত তাহলে মানব দেহই গঠিত হত না। শরীরে মাংসপেশী, সুঠাম অস্থি, তরুণাস্থি, চোখ, কান, মস্তিষ্ক ও অন্যান্য অঙ্গ স্বতন্ত্র গঠন ও সত্তার অধিকারী এবং তারা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য সৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু তারা পরস্পরের পরিপূরক ও সেবক হিসেবে কাজ করে। ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, রক্ত সংবহনতন্ত্র, প্রজনন ও রেচনতন্ত্র, খাদ্যনালি ও পরিপাকতন্ত্র প্রত্যেকে মানবদেহে একে অপরের থেকে সেবা গ্রহণের জাজ্জ্বল্য উদাহরণ। মানব সমাজেও বিভিন্ন দক্ষতা, যোগ্যতা এবং শারীরিক গঠন ও আত্মিক দৃষ্টিতে মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা পুরুষ ও নারীর মধ্যে হোক অথবা ব্যক্তিবিশেষে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য হোক, তা কখনই বৈষম্য নয়; বরং তা সমাজ নামক দেহের জন্য প্রয়োজনীয় একেক অঙ্গস্বরূপ যাদের কার্যাবলির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্য ছাড়া সুশৃঙ্খল কোন সমাজ ও কোন সামাজিক ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই নারী বা পুরুষ কাউকেই অপূর্ণ বলা অযৌক্তিক। কারণ, তাদের দৈহিক, আত্মিক ও যোগ্যতার বৈচিত্র্য ও পার্থক্য–যা তাদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্মগত ভিন্নতা ঘটায়–যখন পরস্পর সমন্বিত হয় তখনই পরিবার ও সমাজ পরিপূর্ণতায় পৌঁছায়।

নারী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি মুখাপেক্ষিতা

মহান আল্লাহ নারী ও পুরুষকে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন :

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

স্ত্রীরা তোমাদের বসন এবং তোমরা তাদের বসন।[১]

পবিত্র কোরআন এ আয়াতে স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের পোশাক বলে অভিহিত করেছে। এ উপমাটি বিবাহের আবশ্যকতা, দর্শন, জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক উপযুক্ততা যাচাইসহ অনেকগুলো দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এখানে আমরা এ উপমার থেকে যেসব অর্থ আনুষঙ্গিকভাবে চিন্তার আয়নায় আসে তার উল্লেখ করছি: যেমন, তারা পরস্পরের বসন বা পোশাক হওয়ার অর্থ পোশাক মানানসই হওয়া যেমন আবশ্যক, তেমনি স্বামী-স্ত্রীও ব্যক্তিত্ব, চিন্তাধারা, আচরণ ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পরস্পরের উপযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়; পোশাক যেমন ব্যক্তিকে সৌন্দর্য দান করে, স্বামী-স্ত্রীও পরস্পরকে শোভামণ্ডিত করে; পোশাক যেমন মানুষের দৈহিক ত্রুটি ঢেকে রাখে, দম্পতিদেরও তাদের পরস্পরের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা উচিত; পোশাক মানুষকে শীত ও গ্রীষ্মের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে, দম্পতিদের দায়িত্বও তেমনি এক অপরকে বিভিন্ন ক্ষতিকর কর্ম ও আচরণ থেকে দূরে রাখা ও পরস্পরকে রক্ষা করা; গ্রীষ্ম ও শীতের তারতম্যের কারণে যেমন পোশাক ভিন্ন ও বিপরীত বৈশিষ্ট্যের হতে হয় তেমনি স্বামী-স্ত্রীর প্রকৃতি ও আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে অপরের প্রতি বিপরীত আচরণ করতে হবে, যেমন একের উত্তপ্ত আচরণের জবাবে অন্যে নরম ভাব প্রদর্শন করবে যাতে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। (এক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রীর উভয়কে ছাড় দেয়ার মনোভাব থাকতে হবে। তারা এটা ভাববে না যে, এতে তার আর মর্যাদা থাকবে না।) মানুষ যেমন তার পোশাক পরিচ্ছন্ন রাখাকে আবশ্যক মনে করে, স্বামী-স্ত্রীও তেমনি পরস্পরের বিষয়ে সতর্ক থাকবে যেন কলুষ ও বিচ্যুতির ময়লা তাদেরকে অপরিচ্ছন্ন না করে। পোশাক দেহের আকারের সাথে সামঞ্জস্যশীল না হলে অর্থাৎ বড় বা ছোট হলে তা যেমন অস্বস্তি ও বিড়ম্বনার কারণ হয়, তেমনি স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের উপযুক্ত না হলে অশান্তি ও অসদ্ভাবের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তির সাথে পোশাকের সবচেয়ে নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান, তাই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক। পোশাকের যত্ন নিলে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়, স্বামী-স্ত্রীরও দায়িত্ব হল পরস্পরের যত্ন নেয়া যাতে তাদের সম্পর্ক স্থায়ী হয়। পোশাক যেমন অব্যবহৃত থাকলে মূল্যহীন হয়ে পড়ে, স্বামী-স্ত্রীও পরস্পরের প্রতি অবহেলা দেখালে ও দায়িত্বহীন হলে তা সম্পর্কোচ্ছেদ ও তিক্ততায় পর্যবসিত হয় যা উভয়কে মূল্যহীন করে। মানসম্পন্ন আরামদায়ক কাপড়ের পোশাক যেমন ব্যক্তির দেহ ও মনে প্রশান্তির জন্ম দেয়, উপযুক্ত স্বামী ও স্ত্রী তেমনি পরস্পরের জন্য প্রশান্তি ও মনোতুষ্টির কারণ। নিজেকে প্রতিকূলতা থেকে রক্ষার জন্য যেমন মানুষ পোশাকের প্রতি মুখাপেক্ষী,

১. সূরা বাকারাহ : ১৮৭

স্বামী ও স্ত্রীও তেমনি তাদের দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজন পূরণের জন্য পরস্পরের প্রতি মুখাপেক্ষী। পোশাক যত দামী হবে, তার সুরক্ষা ও পরিচ্ছন্নতার জন্য তত বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক, স্বামী ও স্ত্রীরও পরস্পরের মর্যাদাকে মূল্যবান গণ্য করে তা রক্ষা করে চলা অপরিহার্য।

পুরুষ– পরিবারের কর্তা

পরিবার সমাজের একটি একক হিসেবে অন্যন্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মত–ছোট হোক বা বড়–তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য পরিচালক ও অভিভাবকের মুখাপেক্ষী। পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব ইসলাম পুরুষের ওপর ন্যস্ত করেছে। মহান আল্লাহ বলছেন :

الرِّجال قَوّامون عَلى النِّساء بِما فَضَّل اللهُ بَعضَهم عَلى بَعضٍ و بِما أنفقوا مِن أموالِهم

'পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক (ও পৃষ্ঠপোষক)। এজন্য যে, আল্লাহ তাদের কতককে কতকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা (পুরুষ) তাদের সম্পদ থেকে খরচ করে।'

আয়াতটিতে পরিবারে পুরুষের অভিভাবকত্বের সপক্ষে দুটি দর্শন বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমটি হল সৃষ্টিগত শ্রেষ্ঠত্ব যার কারণ হল শারীরিকভাবে পুরুষরা অধিক শক্তিশালী হওয়ায় পরিবারের সদস্যদেরকে অন্যদের আগ্রাসী তৎপরতা থেকে রক্ষায় অধিকতর সক্ষম এবং তারা বৃদ্ধিবৃত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিক দক্ষ ও আবেগের ওপর যুক্তিকে প্রাধান্য দান করে থাকে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো পরিবার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার আবশ্যক শর্ত। দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্যটি আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে তা হল পরিবারের অর্থনৈতিক দায়িত্বভার পুরুষের ওপর ন্যস্ত হয়েছে। তবে মনে রাখা আবশ্যক যে, এ অভিভাবকত্ব কখনই কর্তৃত্বপরায়ণতা ও স্বার্থপরতার ভিত্তিতে বাস্তবায়নযোগ্য নয়। কারণ, পরিবারকে কখনই শক্তি প্রয়োগ ও কঠোর আচরণের মাধ্যমে পরিচালনা করা সম্ভব নয়, তাহলে তা পরিবারকে জাহান্নামে পরিণত করবে। আর তাই এটা এমন এক নির্বাহী ক্ষমতা– যা পরামর্শভিত্তিক ও কল্যাণকামিতার ভিত্তিতে পরিচালিত ও পরিবারের সদস্যদের মন জয় ও ভালবাসা অর্জনের দ্বারা বাস্তবায়িত হয়। আর নারী এক্ষেত্রে পুরুষের উপদেষ্টা ও সহযোগীর ভূমিকা পালন করে থাকে।

তিনি অন্যত্র বলেছেন :

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

'স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র, তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যখন ও যেদিক দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ কর। এর মাধ্যমে তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য (উত্তম কিছু) প্রেরণ কর। আল্লাহর (শাস্তি) থেকে নিজেদের রক্ষা কর। জেনে রাখ, তোমরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। মুমিনদের (এ) সুসংবাদ দাও।'[১]

এ আয়াত থেকে তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয়। আর সেগুলো হল :

প্রথমত, স্ত্রীরা স্বামীর তত্ত্বাবধান ও নিরাপত্তায় রয়েছে। যেমনভাবে ক্ষেতের মালিক তার কৃষিভূমিকে আগলে রাখে, এটাকে অন্যের আগ্রাসনমুক্ত ও সকল প্রকার আপদ-বালাই থেকে দূরে রাখে তেমনি স্বামী তার স্ত্রীর নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত রাখে।

দ্বিতীয়ত, স্ত্রীর কর্তব্য হল ভবিষ্যতের ফসলের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখা ও এজন্য স্বামীর কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত থাকা। ভবিষ্যতের ফসল যেমন উত্তম সন্তান হতে পারে, তেমনি স্বামী-স্ত্রী একে অপরের পরিপূরক হিসেবে দ্বীনি দায়িত্ব পালনে পরস্পরকে সহায়তা দানের মাধ্যমে আখেরাতের জন্য উত্তম সঞ্চয় প্রেরণ করাও হতে পারে।

তৃতীয়ত, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কেবল তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়; বরং তারা উভয়ে আল্লাহর দাস হিসেবে তাদের পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্মের জন্য তাঁর নিকট জবাবদিহিতার সম্মুখীন হবে। এজন্যই আয়াতে আল্লাহকে ভয় করতে বলা হয়েছে। সুতরাং স্বামীর এ বিষয়ে যথেচ্চারের কোন অধিকার নেই; বরং তাকে তার ওপর আরোপিত পারিবারিক দায়িত্বসমূহকে যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

নারী পরিবারে প্রশান্তিদাতা

ইসলাম প্রশান্তি অর্জনকে পরিবার গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ পরিবার গঠনের মাধ্যমে পুরুষ ও নারী প্রশান্তিতে পৌঁছায়। পবিত্র কোরআনে নারী ও পুরুষকে পরস্পরের 'জোড়া' ও 'জুটি' বলা হয়েছে। এজন্য যে, তারা বিচ্ছিন্ন থাকলে সৃষ্টির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হয় না। যখন তারা যুক্ত হয় ও দৈহিক ও আত্মিকভাবে পরস্পরকে সাহায্য করে তখনই কেবল ঐ লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়। মহান

১. বাকারাহ : ২২৩

আল্লাহ দুটি আয়াতে[১] নারী ও পুরুষ সৃষ্টির দর্শন 'পরস্পরের নিকট প্রশান্তি অর্জন' বলে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, পরিবার গঠনের উদ্দেশ্যও হল এ প্রশান্তি অর্জন। তাই পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দায়িত্ব হলো শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। কিন্তু নারী তার প্রকৃতিগত কোমল স্বভাব ও স্নেহ-মমতার কারণে এক্ষেত্রে মূল পরিচালকের ভূমিকায় রয়েছে। তাকে কেন্দ্র করেই পরিবারে ভালবাসার বন্ধন সৃষ্টি হয় ও বজায় থাকে।

পরিবারে অন্তরঙ্গ ও ভালবাসাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা

পবিত্র কোরআনের আয়াত, মহানবি (সা.) ও নিষ্পাপ ইমামদের (আ.) থেকে বর্ণিত হাদিস এবং তাঁদের জীবনী থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, বিয়ে নারী-পুরুষের মধ্যে ভালবাসা ও মমতা সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। তাই পরিবার সম্প্রীতি, প্রশান্তি এবং স্নেহ, দয়া, ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শনের সর্বোত্তম স্থান। এখানেই এর সদস্যরা অন্যের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা ও উপেক্ষা করা, নিঃস্বার্থ হওয়া, পরস্পরের জন্য ত্যাগ, অন্যের অধিকারকে সম্মান দেখানো ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করে। আর যদি কোন পরিবারে অন্তরঙ্গ ও স্নেহ-মমতায় পূর্ণ পরিবেশ না থাকে তাহলে কখনই তা অর্জন করা সম্ভব হয় না। এ ভালবাসা ও মমতাই পরিবারে ইসলামি প্রশিক্ষণের ভিত্তি। এ কারণেই ইসলাম পরিবারে সকল প্রকার সহিংসতা, নির্যাতন ও নিপীড়নের বিরোধী। বিশ্ববাসীর আদর্শ মহানবি (সা.)-এর জীবনী ও কর্ম এ সত্যকে প্রমাণ করে। তিনি বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হল ঐ ব্যক্তি যে পরিবারের (স্ত্রী ও সন্তানদের) জন্য উত্তম। আর আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিজের পরিবারের জন্য উত্তম।' অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হল যে তার স্ত্রীর জন্য উত্তম, আর আমি আমার স্ত্রীদের জন্য সবচেয়ে উত্তম।'[২]

তিনি বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যে তার স্ত্রীকে দাসের মত প্রহার করে সে কি লজ্জা করে না? তোমাদের উত্তমরা কখনই তা করবে না।' তিনি আরো বলেছেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি থেকে আশ্চর্য বোধ করি যে তার স্ত্রীকে প্রহার করে, অথচ সে নিজেই প্রহৃত হওয়ার অধিক উপযুক্ত। তোমাদের স্ত্রীদের কখনই বেত দিয়ে প্রহার কর না। কারণ, এতে কিসাস (প্রতিশোধমূলক অনুরূপ শাস্তির বিধান) রয়েছে। বরং তারা গুরুতর কোন অপরাধ করলে ক্ষুধা ও বঞ্চনার দ্বারা শাস্তি দাও। তবেই তোমরা পৃথিবী ও পরকালে স্বস্তিতে থাকবে।' তিনি আরো বলেছেন, 'তোমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে আমার তাকিদপূর্ণ নির্দেশকে স্মরণ রাখ যাতে কঠিন শাস্তি থেকে

১. সূরা আ'রাফ : ১৮৯ ও সূরা রূম : ২১
২. ওয়াসায়িলুশ শিয়া, ১৪ম খণ্ড, পৃ. ১১৯

মুক্তি পেতে পার। আর কেউ যদি এ নির্দেশ পালন না করে তবে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার দিন তার অবস্থা খুবই শোচনীয় হবে।'[১] মহানবী (সা.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে : ঐ ব্যক্তি অভিশপ্ত, ঐ ব্যক্তি অভিশপ্ত যে তার স্ত্রীর অধিকার নষ্ট করে। ব্যক্তির ধ্বংসের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার স্ত্রীর অধিকার নষ্ট করে।'[২]

নারী সাহাবী হযরত হাওলা থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'জীবরাঈল (আ.) স্ত্রীদের ব্যাপারে আমার কাছে এতটা তাকিদপূর্ণ নির্দেশ এনেছেন যে, আমার মনে হয়েছে তার প্রতি অসন্তোষমূলক কিছুই বলা যাবে না।'[৩]

ইসলামের পারিবারিক নীতিমালা

ইসলাম এর অনুসারীদের এমন কিছু নীতিমালা শিক্ষা দেয় যা মেনে চললে পরিবারের সদস্যরা অনেক ধরনের বিপদ ও ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকে এবং তাদের সম্মান ও মর্যাদা ভালভাবে রক্ষিত হয়। যেমন : বেগানা পুরুষ ও নারীর মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে শরীয়তের সীমা রক্ষা।

নারী ও পুরুষের সম্পর্ক অবশ্যই শরীয়তের নির্ধারিত সীমার মধ্যে হতে হবে। একারণেই ইসলাম পর্দা ও হিজাবের বিষয়টি আবশ্যক করেছে। পরিবারের মানসিক সুস্থতা ও প্রশান্তি সৃষ্টিতে পর্দার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। পবিত্র কোরআনে এ বিষয়ের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে :

'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের, কন্যাদের এবং বিশ্বাসী নারীদেরকে বলে দিন যেন তারা তাদের চাদরগুলোর অবগুণ্ঠন ঝুলিয়ে[৪] রাখে; নিশ্চয়ই এটা তাদের (শালীন ও সম্ভ্রান্ত নারী হিসেবে) পরিচিতির নিকটতর; ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, অনন্ত করুণাময়।'[৫]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন : '(হে রাসূল!) বিশ্বাসী নারীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গকে সংরক্ষণ করে এবং তাদের শোভা প্রকাশ না করে; তবে যা আপনা হতেই প্রকাশিত তা স্বতন্ত্র; এবং তাদের ওড়না দিয়ে যেন গ্রীবা ও বক্ষদেশ ঢেকে রাখে এবং তাদের শোভা যেন...(মাহরাম ব্যতীত)

১. বিহারুল আনওয়ার, ১০৩তম খণ্ড, পৃ. ২৪৯, হাদিস ৩৮
২. মান লা ইয়াহদুরুহুল ফাকিহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৩, হাদিস ৪১৭
৩. ওয়াসায়িলুশ শিয়া, ১৪ম খণ্ড, পৃ. ২৫২, হাদিস নং ১৬৬২৬
৪. কোন কোন তাফসীরকারকের মতে, 'জালবাব' হল চাদর যা মাথা হতে পা অবধি আবৃত করে রাখে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, এটা বড় ওড়না যা মাথায় থাকে।
৫. সূরা আহযাব : ৫৯

কারও নিকট প্রকাশ না করে; এবং চলার সময় ভূমিতে এভাবে পদক্ষেপ না করে যাতে তাদের যে শোভা তারা গোপন করে তা প্রকাশ পেয়ে যায়।'[১]

ইসলামি শরীয়তে নারীর জন্য তার মুখমণ্ডল এবং আঙ্গুল থেকে কব্জি পর্যন্ত দুই হাত ব্যতীত সমগ্র শরীর ঢেকে রাখা আবশ্যক। আর এ নির্দেশ পুরুষ ও নারীর আত্মিক ও মানসিক সুস্থতা ও শান্তিকে নিশ্চিত করার জন্যই দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে ইসলাম বেগানা নারী ও পুরুষের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় ও কথোপকথনের ক্ষেত্রেও কিছু নীতিমালা মেনে চলতে বলেছে। যেমন রাসূল (সা.)-এর হাদিসে না মাহরাম অর্থাৎ বেগানা নারী ও পুরুষের দিকে দৃষ্টিদানকে শয়তানের পক্ষ থেকে নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত তীর বলা হয়েছে।[২] এবং নারীদের পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় (ভঙ্গী ও) কণ্ঠে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।[৩]

তেমনি ইসলামে নারী ও পুরুষের জন্য যেখানে অন্য মানুষের আনাগোনা নেই এমন স্থানে একান্ত ও নিভৃত আলোচনা থেকে বারণ করা হয়েছে।

বিবাহিত জীবনের প্রতি নিবেদিত থাকা

বৈবাহিক জীবনে পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা এ অর্থে যে, পরিবারের বাইরে অবৈধ কোন শারীরিক সম্পর্ক রাখবে না। মহান আল্লাহ বলেন :

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ...﴿٣١﴾

'(হে রাসূল!) বিশ্বাসীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের চক্ষুগুলোকে (হারাম দৃষ্টি থেকে) নত রাখে, তাদের যৌনাঙ্গকে সংরক্ষিত রাখে; এটা তাদের জন্য অধিক পবিত্রতার কারণ। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের বিষয় সম্বন্ধে সম্যক অবহিত। আর বিশ্বাসী

১. সূরা নূর : ৩১
২. বিহারুল আনওয়ার, ১০৪তম খণ্ড, পৃ. ৩৯
৩. সূরা আহযাব : ৩২

নারীদেরকেও বলে দিন, তারা যেন তাদের চক্ষুগুলোকে (নিষিদ্ধ দৃষ্টি থেকে) নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গকে সংরক্ষণ করে...।'[১]

সুতরাং পরিবারের বাইরে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন থেকে বিরত থাকা কেবল নৈতিক দায়িত্ব বলেই বিবেচিত নয়; বরং ধর্মীয় আইনে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, এ বিষয়টি লঙ্ঘিত হলে তাদের মধ্যে অনাস্থা সৃষ্টি হয় ও বিদ্যমান হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় যা পারিবারিক অশান্তির জন্ম দেয় ও সন্তানদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই ইসলামি দণ্ডবিধিতে ব্যভিচার ও অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য কঠোর বিধি রয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবারের ভিত্তি সুদৃঢ় রাখার জন্য অপর যে নীতিটি পালন করা অপরিহার্য তা হল বিয়ের পূর্বে ও পরে প্রকাশ্য ও গোপন প্রণয় থেকে বিরত থাকা। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর বিশ্বাসীদের মধ্য থেকে (স্বাধীন ও) সচ্চরিত্রা নারী এবং যাদেরকে তোমাদের পূর্বে গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্য থেকে সচ্চরিত্রা নারীরা তোমাদের জন্য বৈধ, যখন তোমরা তাদের দেনমোহর দাও পবিত্রতা রক্ষার (বিবাহের) উদ্দেশ্যে, ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে নয়; আর গোপন প্রণয়িনী গ্রহণকারী হিসেবেও নয়।'[২] অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যাদের বিশ্বাসী-স্বাধীন নারীদের বিয়ে করার মত অর্থনৈতিক সঙ্গতি নেই, তারা তোমাদের অধীনা বিশ্বাসী ক্রীতদাসীদের বিয়ে করবে... তবে যেন তারা সতীত্ব রক্ষাকারিণী হয়, ব্যভিচারিণী না হয় এবং তাদের গোপনে প্রণয়িনী হিসেবে গ্রহণ না করে... যারা প্রবৃত্তির কামনার অনুসরণ করে তারা চায় তোমরা ব্যাপকভাবে (গর্হিত কাজের দিকে) ঝুঁকে পড়।'[৩]

এ দু'টি আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, ইসলাম বিবাহ-বহির্ভূত যে কোন প্রণয়ের সম্পর্ককে অবৈধ বলে গণ্য করে। কেননা, তা নারী-পুরুষকে অবৈধ সম্পর্ক ও যৌন অনাচারের দিকে প্ররোচিত করে।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা

পারিবারিক অশান্তির অন্যতম বড় কারণ হল স্বামী ও স্ত্রীর অধিকার এবং পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সঠিকভাবে না জানা এবং পালন না করা। এজন্য পারিবারিক জীবনের শুরুতেই পরস্পরের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জানা অপরিহার্য। এ অবগতি তাদের পরস্পরের কাছে অযাচিত দাবি ও চাওয়াকে নিঃসন্দেহে সীমিত করবে। এ বিষয়ে পাঠকমণ্ডলীকে অবহিত করার জন্য এ পর্যায়ে

১. সূরা নূর : ৩০-৩১
২. সূরা মায়িদাহ : ৫
৩. সূরা নিসা : ২৫ ও ২৭

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হল। মহান আল্লাহ নারী ও পুরুষের পরস্পরের ওপর অধিকার সম্পর্কে বলেন :

(শরীয়ত অনুযায়ী) তাদের (নারী) জন্য (পুরুষের ওপর) ন্যায়সঙ্গত কিছু অধিকার আছে যেমন তাদের ওপর পুরুষের আছে। তবে নারীর ওপর পুরুষের (অধিকারগত) কিছুটা প্রাধান্য রয়েছে। এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[১]

ইসলামের অন্যতম অনন্য বৈশিষ্ট্য হল সকল উন্নত মানবীয় গুণ, নৈতিক কর্ম ও আচরণকে আল্লাহর ইবাদত বলে গণ্য করেছে। এ কারণেই স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব পালন করলেও তা ইবাদতের শামিল। যেমন রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে নারী সাতদিন তার স্বামীর সেবা করবে আল্লাহ তার জন্য আটটি বেহেশতের দ্বারই উন্মোচিত করবেন এবং জাহান্নামের সাতটি দ্বারই তার জন্য বন্ধ করা হবে।' তিনি অন্যত্র বলেছেন, 'কোন নারী যদি তার স্বামীকে এক চুমুক পানি খাওয়ায় তা তার এক বছরে রাত জেগে ইবাদত করা থেকে উত্তম।' এখানে আমরা পর্যায়ক্রমে স্বামী ও স্ত্রীর কয়েকটি অধিকারের উল্লেখ করছি।

স্বামীর অধিকারসমূহ

১. স্বামীর দৈহিক ও মানসিক চাহিদা পূরণ : স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের এ চাহিদা পূরণের প্রয়োজন রয়েছে। হাদিসে তাদের এ পারস্পরিক চাহিদা পূরণকে আল্লাহর পথে সংগ্রামের সমতুল্য জ্ঞান করে তার সমান পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। স্বামীর যৌন চাহিদা পূরণের জন্য নারীকে তার সৌন্দর্য ও আকর্ষণের সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটানো বাঞ্ছনীয় যাতে স্বামী এ ক্ষেত্রে কখনও শূন্যতা অনুভব করে অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট না হয়। এজন্য নারী যতটা সম্ভব গৃহে নিজেকে পরিপাটি ও সজ্জিত রাখবে এবং স্বামীর মানসিক প্রশান্তির ক্ষেত্র তৈরি করবে। নারীর জন্য পরিচ্ছন্ন ও আকর্ষণীয় পোশাক পরিধান, সাজগোজ করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা অত্যন্ত পছন্দনীয় কাজ। তাই এ বিষয়ে তাকে সম্পূর্ণরূপে স্বামীর সামনে অনুগত থাকতে ও গৃহে এ অনুভূতির উষ্ণতা জাগ্রত রাখতে হবে। এতে ঘাটতি হলে পরিবারে সমস্যার সৃষ্টি হবে। ইসলামে বৈধ পন্থায় যৌন চাহিদা পূরণ শুধু দৈহিক দৃষ্টিতেই কাম্য নয় বরং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যও তা অপরিহার্য বিবেচিত হয়েছে। কারণ, এটি মানসিক প্রশান্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি ব্যক্তিকে খোদামুখি করতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তিকে নিজেকে ভালবাসার গণ্ডি অতিক্রম করে সঠিকভাবে অন্যের জন্য ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে। বাস্তব অভিজ্ঞতা এর সাক্ষী যে, যারা আধ্যাত্মিকতার

১. সূরা বাকারাহ : ২২৮

দোহাই দিয়ে বিয়ে থেকে বিরত থাকে তাদের মধ্যে একরূপ অপূর্ণতা বিদ্যমান। তারা সামাজিক অনেক সম্পর্ক ও বাস্তবতাকে অনুধাবন করতে পারে না।

২. **পারিবারিক বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য করা :** স্ত্রীকে শরীয়তের সীমায় ও যৌক্তিক ক্ষেত্রে অবশ্যই স্বামীর আনুগত্য কররতে হবে। স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ও তার অসন্তুষ্টির কাজে অর্থ ব্যয় করা, তার অনুমতি ব্যতীত কোন মুস্তাহাব কর্ম সম্পাদন করা (যেক্ষেত্রে তার অধিকার ক্ষুণ্ন হয়) এবং তার প্রতি অসদাচরণ করা অন্যায়।

৩. **স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে বাইরে না যাওয়া :** স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুমতি ছাড়া গৃহ থেকে বের হওয়া গুনাহর কাজ। রাসূল (সা.) বলেছেন : 'কোন নারী স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাইরে গেলে সে ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবীর সকল ফেরেশতা তার ওপর অভিশম্পাত করে।'

স্ত্রীর ঘরের বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতির আবশ্যকতার বিষয়ে জ্ঞাতব্য বিষয় হল, যদিও স্বামীর এ অধিকার রয়েছে যে, তার স্ত্রীকে অন্য পুরুষদের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখার জন্য তাকে বাড়ির বাইরে অধিক ও অপ্রয়োজনীয় যাতায়াত থেকে বিরত রাখবে। কিন্তু তার এ অধিকার নেই যে, স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জ্ঞান এবং আবশ্যক ধর্মীয় রীতিনীতি ও বিধান শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করবে। কারণ, অনেক জ্ঞান রয়েছে যা শিক্ষা করা সব নারীর জন্য অথবা একদল নারীর জন্য ফরয যা থেকে বঞ্চিত করার অধিকার স্বামীর নেই। এজন্য স্বামীকে হয় তার ঘরেই এরূপ শিক্ষার ক্ষেত্র ও উপকরণ প্রস্তুত করতে হবে অথবা স্ত্রীকে উপযুক্ত শিক্ষাকেন্দ্রে যাওয়ার অনুমতি দিতে হবে। ইসলামি সমাজে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক শাখায় শিক্ষা নারীর জন্য আবশ্যক বলে গণ্য হয়। যেমন- প্রসূতিবিদ্যা, নারীরোগ, রোগনির্ণয়ের পরীক্ষাগার, সেবিকাসহ নারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে যদি নারীদের বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের জ্ঞান না থাকে তবে এক্ষেত্রে শরীয়তের অনেক বিধান (যেমন বেগানা পুরুষের সংশ্রবে যাওয়া ও শরণাপন্ন হওয়া, পর্দা ও শালীনতার বিধান) লঙ্ঘিত হবে। এছাড়াও এরূপ অনেক বিষয় আছে যা জানা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য অপরিহার্য। এসকল ক্ষেত্রে অবশ্যই নারীকে বাধ্য হয়ে ঘরের বাইরে যেতে হবে এবং পিতা, ভাই ও স্বামীর বাধা প্রদানের অধিকার নেই।

স্ত্রীর অধিকারসমূহ

এর বিপরীতে পুরুষকেও তার স্ত্রীর অধিকারগুলো দিতে হবে। ইসলামে স্ত্রীর অধিকার প্রদানের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেন, 'জীবররাঈল

(আ.) স্ত্রীর ব্যাপারে এত অধিক তাগিদ দিয়েছে যে, আমি ভাবলাম তাকে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার অপরাধ ব্যতিরেকে তালাক দেয়া বৈধ নয়।'[১]

স্ত্রীদের অধিকারের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উল্লেখ করা যেতে পারে।

১. স্ত্রীর অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা : স্ত্রীর পোশাক, খাদ্য, বাসস্থান ও সংসারের জন্য আবশ্যক আসবাবপত্রের চাহিদা পূরণের দায়িত্ব সকল অবস্থায় পুরুষের ওপর ন্যস্ত। এক্ষেত্রে পুরুষকে অবশ্যই তার স্ত্রীর পরিবারের সামাজিক মর্যাদাকে বিবেচনায় রাখতে হবে ও স্ত্রী নিজে বিত্তশালী হলেও তার খরচের ভার বহনের দায়িত্ব পুরুষের। অথচ পিতা-মাতার ক্ষেত্রে কেবল তারা দরিদ্র (জীবন ধারণের উপকরণ সংগ্রহে অপারগ) হলেই তাদের খরচ বহনের দায়িত্ব সন্তানের ওপর বর্তায় অর্থাৎ ওয়াজিব হয়। ফকীহরা স্ত্রীর পারিবারিক মর্যাদা সাপেক্ষে স্বামীর ওপর নিম্নোক্ত বস্তুগত প্রয়োজন পূরণ করা অপরিহার্য বলেছেন। যথা : খাদ্য, পোশাক, বিছানা, মাদুর বা কার্পেট, নিতান্ত প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপকরণ, থাকার স্থান ও গৃহপরিচারিকা। খাদ্যের ক্ষেত্রে অবশ্যই স্ত্রীর জন্য তা পর্যাপ্ত হওয়া আবশ্যক, তবে দামী হওয়া জরুরি নয়। (তবে এক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে পরিবেশন করতে বাধ্য নয়; বরং স্বামীর জন্য যা আবশ্যক তা হল তার স্ত্রীর পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদানুযায়ী ঐরূপ নারীর জন্য খাদ্য প্রস্তুতে যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তা তাকে দেবে।)

ভরণপোষণ দেয়ার ক্ষেত্রে কোন কোন ফকীহ পুরুষের সামর্থ্যকে মানদণ্ড বিবেচনা করেছেন। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআন বলছে : এক্ষেত্রে ধনশালী তার অবস্থা অনুযায়ী এবং স্বল্পজীবিকার অধিকারী আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন সে (অর্থাৎ তার সাধ্য) অনুযায়ী ভরণপোষণ দেবে। (কারণ,) আল্লাহ কেবল মানষের ওপর তাকে যা দিয়েছেন তদনুযায়ী দায়িত্ব আরোপ করেছেন। (সূরা তালাক : ৭) তাই সচ্ছল ব্যক্তির জন্য স্ত্রীর ওপর খরচের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা আরোপের সুযোগ নেই। তবে কখনই তা যেন অপচয়ের পর্যায়ে না পৌঁছায়। পোশাকের ক্ষেত্রেও স্ত্রীর সমমর্যাদার নারীর জন্য উপযোগী পোশাক দিতে হবে। আর সম্ভব না হলে শীত-গ্রীষ্ম ও মৌসুমের জন্য সাধারণের মধ্যে প্রচলিত মানের পোশাক দেয়া বাঞ্ছনীয়।

পুরুষের জন্য পরিবারের সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে অবহেলা ও কৃপণতা করা অপছন্দনীয় কাজ। পরিবারের সচ্ছলতার জন্য প্রচেষ্টাকারী পুরুষকে হাদিসে আল্লাহর পথে জিহাদ ও

---

১. বিহারুল আনওয়ার, ১০৩তম খণ্ড, পৃ. ২৫১

সংগ্রামকারী করে অভিহিত করা হয়েছে। তবে বিলাসিতার জন্য স্ত্রী যেন স্বামীর ওপর সাধ্যাতীত বোঝা না চাপায় এবং অনাবশ্যক অর্থ খরচে বাধ্য না করে। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'ঐ নারী সৌভাগ্যবান যে তার স্বামীকে সম্মান করে ও তার অনুগত থাকে। আর যে নারী তার স্বামীকে কষ্ট দেয় সে অভিশপ্ত।' এ কষ্টদানের ধরন বিভিন্ন হতে পারে। যেমন- স্বামীর সাধ্যের অতীত বস্তু তার নিকট চাওয়া, নিতান্ত প্রয়োজন নয়– এমন কিছু কিনতে কিংবা বিশেষ ধরনের গৃহ ও পোশাকের ব্যবস্থা করতে বাধ্য করা, নিজেকে বড়লোক জাহির ও অহঙ্কার করার উদ্দেশ্যে জিনিস ক্রয়ে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া, স্বামীর অনুমতি ছাড়া যখন তখন বাইরে যাওয়া ইত্যাদি।

২. **শারীরিক চাহিদা পূরণ :** স্ত্রীর দ্বিতীয় অধিকার হল স্বামী চার মাসের বেশি তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক পরিত্যাগ না করে। তবে যদি স্ত্রী এতে সম্মত থাকে অথবা স্বামী চাকুরিগত জরুরি কাজ বা হজের মত ফরজ কোন দায়িত্ব পালনে সফরে থাকে তবে ভিন্ন কথা। হাদিসে কোন যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়া স্ত্রীর সাথে চার মাসের অধিক শারীরিক সম্পর্ক ত্যাগ করা গুনাহ বলে পরিগণিত হয়েছে। কোন কোন হাদিসে প্রতি চারদিনে একবার স্ত্রীর সাথে এক বিছানায় শোয়া আবশ্যক বলা হয়েছে (যদিও শারীরিক সম্পর্ক স্থাপিত না হয়)।

৩. **উত্তরাধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত না করা :** স্ত্রী ও সন্তানদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা মহাপাপ। এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) যখন এক ব্যক্তির জানাযার নামায পড়ানোর পর জানতে পারেন সে তার স্ত্রী ও সন্তানদের বঞ্চিত করে তার সব সম্পদ ইসলামের পথে খরচের জন্য অসিয়ত করে গিয়েছে এবং এর ফলে তারা অসহায় হয়ে পড়েছে তখন তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'যদি আমি জানতাম সে এমন করেছে তবে তার জানাযার নামায পড়তাম না।'

৪. **স্ত্রীর সম্মান যথাযথভাবে বজায় রাখা :** স্ত্রীর সম্মান রক্ষা ও মানুষের সামনে তাকে ছোট না করা এবং তার প্রতি অসদাচরণ না করা স্ত্রীর অন্যতম অধিকার। কখনও কখনও দেখা যায়, পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপমানকর কথা বলে ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে– যা স্ত্রীর মনোবেদনার কারণ হয়। এতে সে স্বামীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে ও পারিবারিক সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে। রাসূল (সা.) বলেছেন : 'তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হল সে যার স্ত্রী তার অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে অন্যের আশ্রয় নেয়।'

পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর নৈতিক দায়িত্বসমূহ

কিন্তু এ দিকটি অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে যে, পরিবার প্রতিষ্ঠানটিকে এর সদস্যদের কার কতটুকু আইনগত অধিকার রয়েছে তার ভিত্তিতে পরিচালনা করা

সম্ভব নয়; বরং পরিবার নৈতিক দায়িত্বনির্ভর একটি প্রতিষ্ঠান যাতে স্বামী ও স্ত্রী প্রত্যেকে স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে উঠে গৃহ ও বাইরের কাজ তাদের নিজ নিজ যোগ্যতা ও সত্তাগত প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে ভাগ করে নেবে। তবেই একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিবার সৃষ্টি হবে। যেমন পুরুষরা কঠিন ও কষ্টসাধ্য কাজগুলো এবং নারীরা পরিবার দেখাশোনা ও সন্তান পরিচর্যার গুরুদায়িত্বটি পালন করবে।

মহানবী (সা.) এরূপ নির্দেশনাই তাঁর কন্যা হযরত ফাতিমা (আ.) ও জামাতা আলী (আ.)-এর ক্ষেত্রে দিয়েছেন। ইতিহাস ও হাদিস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা তাঁদের বিবাহিত জীবনের শুরুতেই আল্লাহর রাসূলের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের কাজের বিভাজনের বিষয়ে নির্দেশনা চাইলে তিনি হযরত ফাতিমার জন্য গৃহের অভ্যন্তরের কর্ম নির্ধারণ করেন এবং হযরত আলীর ওপর বাইরের কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এর ভিত্তিতে হযরত আলী জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ, পানি আনা ও বাইরের অন্যান্য কর্ম সম্পাদন করতেন এবং হযরত ফাতিমা যাঁতায় আটা পিষা, খামির তৈরি, রুটি বানানো ইত্যাদি কাজ করতেন।

সুতরাং মনে রাখা আবশ্যক যে, যদিও সন্তানদের দেখাশোনা করা, রান্না, কাপড় ধোয়া ও গৃহস্থালি অন্যান্য কাজ করা নারীর আবশ্যক কোন দায়িত্ব নয়, কিন্তু গৃহ ও বাইরের কাজের দায়িত্ব নারী ও পুরুষের মধ্যে পৃথক করা হলে পুরুষ তার ওপর আরোপিত দায়িত্বটি যথাযথ পালন করতে পারে এবং নারীও পরিবারে অধিক কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে এ কথার অর্থ এটা নয় যে, নারী কোন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে না।

মোটকথা হল নারীর জন্য পারিবারিক দায়িত্ব পালনের বিষয়টি কখনই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। ইসলামি বিপ্লবের মহান নেতা আলী খামেনেয়ী এ বিষয়ে বলেন: 'মাতৃত্ব, সন্তান পালন, পরিবারের তত্ত্বাবধান ও পরিচর্যার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোন নারী কোন বিষয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞও হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দেয় অথবা পরিবারে এ ভূমিকাগুলো পালন না করে, তবে নিঃসন্দেহে ঐ নারীর জন্য তা অপূর্ণতা বলে বিবেচিত। তবে মনে রাখতে হবে যে, নারীর গৃহকর্ম যেন তাকে এতটা বেশি ব্যস্ত না রাখে যা তার প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ, ধর্মীয় অধ্যয়ন, সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রের সার্বিক বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করে। অন্যদিকে নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও যেন তাকে এতটা ব্যস্ত না রাখে যা তার সন্তান পালন ও প্রশিক্ষণের মহান দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখে অথবা তা বাধাগ্রস্ত করে।'

তিনি অন্যত্র বলেন : 'আমার দৃষ্টিতে পরিবার ও পরিবার সংক্রান্ত সকল বিষয় মৌলিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। পরিবারে ও ঘরে নারীর নিরাপত্তা এবং যোগ্যতা ও প্রতিভার বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকতে হবে। নিঃসন্দেহে পরিবারে নারীর সুস্থতা ও

নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তার যথাযথ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল তার জন্য প্রশান্তি ও উপযুক্ত সন্তান প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা সম্ভব। আর পরিবারের প্রধান হিসেবে এ কাজটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পুরুষের।'

তিনি পরিবারে স্ত্রীর অতুলনীয় ভূমিকার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন : 'মহান ব্যক্তিদের জন্যও স্ত্রীর এমন ভূমিকা থাকে যা সন্তানদের ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকার সাথে তুলনীয়। নারীত্বের বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ নারীরা এক্ষেত্রে অতি সূক্ষ্মতা ও দক্ষতার অধিকারী। তারা জানে, পুরুষদের প্রকৃতি কোন কোন ক্ষেত্রে অপরিপক্ব ও ক্ষুদ্র আঘাতের সামনেও ভঙ্গুর, কেবল স্ত্রীর ভালবাসা ও সান্ত্বনাই তাকে পরিপুষ্ট ও প্রতিরোধক্ষম করতে পারে– অন্য কিছু নয়। এমনকি মাতাও এরূপ ভূমিকা রাখতে সক্ষম নয়।'

স্বামীর নৈতিক দায়িত্বসমূহ

১. সুন্দর ও বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক রক্ষা করা : স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকা খুবই আবশ্যক। তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উষ্ণতা ও ভালবাসা ছড়িয়ে দেয় যার ফলে তাদের মনে সজীবতা, প্রশান্তি, প্রফুল্লতা ও নিরাপত্তাবোধের সৃষ্টি হয়। এরূপ পরিবার মানসিক অশান্তি ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত থাকে। এ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই মৌলিক ভূমিকা রয়েছে। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে পুরুষদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে বলছেন : 'এবং তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদাচার কর। আর যদি তুমি কোন কারণে তাকে অপছন্দও কর, তবুও (দ্রুত বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর না। কারণ,) হয়ত কোন জিনিস তুমি অপছন্দ কর, অথচ আল্লাহ তোমার জন্য তাতে অত্যধিক কল্যাণ রেখেছেন।'[১] কোরআনে এমনকি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথেও সদ্ব্যবহারের তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, জোরপূর্বক তাদের থেকে দেনমোহর ফিরিয়ে নিতে এবং বিচ্ছেদের পরও তিনমাস তাকে স্বীয় গৃহ থেকে বহিষ্কার করতে নিষেধ করা হয়েছে।[২]

২. রাতে ঘরের বাইরে অবস্থান না করা : ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন, 'পুরুষের জন্য (স্বীয় শহরে অবস্থানকালে) নিজের গৃহের বাইরে রাত কাটানো ধ্বংসকর।'[৩]

৩. স্ত্রীকে গৃহকর্মে সাহায্য করা : এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) হযরত আলীকে বলেন : 'হে আলী! সত্যবাদী নবী, আল্লাহর পথে শহীদ ও যে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ চান সে ব্যতীত কোন পুরুষ পরিবারে স্ত্রীকে তার কাজে সাহায্য

১. সূরা নিসা : ১৯
২. সূরা বাকারাহ : ২২৮-২৩১ ও সূরা তালাক : ৬
৩. মান লা ইয়াহদ্বুরুহুল ফাকিহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৫

করে না। আর এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তার দেহের লোম ও মাথার চুলের সমসংখ্যক সওয়াব দেবেন, তার জন্য এক বছরের ইবাদতের সমান সওয়াব লেখা হবে এবং হযরত ইয়াকুব, হযরত ঈসা ও হযরত দাউদের দ্বীন প্রচারের ন্যায় পুরস্কার তাকে দেয়া হবে।'

৪. স্ত্রীর ওপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে না দেয়া : আলী (আ.) বলেছেন : 'স্ত্রীর ওপর তার সাধ্যের অতীত বোঝা চাপিয়ে দিও না। কারণ, নারী হল ফুল, সে পরাক্রমশালী (চাপ সহ্য করার উপযোগী) নয়।'

৫. স্ত্রীকে ভালবাসা : যদি স্ত্রী তার স্বামীর প্রেম ও ভালবাসায় সবসময় সিক্ত থাকে তবে সে তার সন্তানদেরকেও নিজের স্নেহ-মমতায় আপ্লুত করবে। এ বিষয়টিকে শহীদ অধ্যাপক মোর্তাজা মোতাহহারী এভাবে উপমা দিয়েছেন : 'পুরুষ হল বৃষ্টিধারী এক পর্বত যাতে নারী প্রস্রবণের মত আর সন্তানরা বৃক্ষলতা ও ফুলস্বরূপ। প্রস্রবণ কেবল তখনই পারে সবুজ গাছ-গাছালি ও সুন্দর ফুলের জন্ম দিতে যখন পর্বতের ভেতরে সঞ্চিত পরিশুদ্ধ পানি তার মধ্যে প্রবাহিত হয়। যে পর্বতে বৃষ্টি বর্ষিত হয় না বা তা আদৌ পানি ধারণ করে না তা থেকে প্রস্রবণ বের হয় না এবং তাতে বৃক্ষ ও ফুলের জন্ম হয় না। পর্বত ও তার পাদদেশের সবুজ-শ্যামলতা যেমন বৃষ্টি ও পর্বতের বৃষ্টিধারণের ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল, পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও তেমনি নারীর প্রতি পুরুষের ভালবাসা ও নির্মল আবেগ-অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল।' তাই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ব্যবসায়িক যৌথ বা অংশীদারী কারবারের মত নয় যে, পরস্পরের লাভক্ষতির হিসাব করে তা টিকিয়ে রাখবে বা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কখনও কখনও এমন হতে পারে যে, কোন নারীর সৌন্দর্য তার স্বামীকে আকৃষ্ট করে না, কিন্তু ঐ নারী ধর্মীয় ও নৈতিক গুণে সমৃদ্ধ এবং পারিবারিক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করে ও সন্তানদের মাতা হিসেবে উত্তম। এরূপ অবস্থায় পুরুষের উচিত স্ত্রীর এরূপ যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে তাকে পছন্দ করা ও মেনে নেয়া। এ দিকটির প্রতি ইশারা করে মহান আল্লাহ বলেছেন : 'আর যদি তোমরা কোন কারণে তাদের (স্ত্রীদের) অপছন্দও কর, (তদুপরি দ্রুত বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর না। কারণ,) হয়ত কোন জিনিস তুমি অপছন্দ কর, অথচ আল্লাহ তোমার জন্য তাতে অত্যধিক কল্যাণ রেখেছেন।'[১]

স্ত্রীর নৈতিক দায়িত্বসমূহ

১. সংসার দেখাশোনা ও স্বামীর সেবা-যত্ন করা : যদিও ইসলামে পুরুষ ও নারী কারো ওপরই গৃহের কর্মসম্পাদন আবশ্যক করা হয় নি অর্থাৎ স্ত্রী যেমন গৃহে

১. সূরা নিসা : ১৯

রান্নাবান্না করতে ও স্বামী-সন্তানের কাপড় ও পোশাক ধুতে বাধ্য নয়, তেমনি স্বামীও স্ত্রীর জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে পরিবেশন করতে বাধ্য নয়। কিন্তু নারীর জন্য গৃহকর্ম সম্পাদন ইসলামে মর্যাদার কর্ম বলে বিবেচিত হয়েছে। এ সম্পর্কে ইমাম বাকির (আ.) বলেন : 'নারীর জিহাদ হল উত্তমরূপে স্বামীর সংসার দেখা।' উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামাহ আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে নারীর জন্য স্বামীর সেবায় কী মর্যাদা রয়েছে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন : 'যখন কোন নারী তার স্বামীর গৃহকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা বা গোছানোর জন্য কোন বস্তু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরায়, আল্লাহ তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন। আর আল্লাহ যার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন তাকে কখনও শাস্তি দেন না।' তিনি এ সম্পর্কে আরো অধিক জানতে চাইলে তিনি বলেন : "হে উম্মে সালামাহ! যখন কোন নারী সন্তান ধারণ করে, তখন তার পুরস্কার মহামহিম ও পরাক্রমশালী আল্লাহর পথে জীবন ও সম্পদ দিয়ে যুদ্ধকারী ব্যক্তির সমান। আর যখন কোন নারী সন্তান জন্ম দান করে তখন তাকে (ঐশীভাবে সম্বোধন করে) বলা হয় : 'তোমার সকল গুনাহ ক্ষমা করা হয়েছে। সুতরাং নতুনভাবে জীবন শুরু কর।' আর যতবার সে তার সন্তানকে স্তন্যপান করায় ততবার তাকে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর সন্তানদের থেকে কোন ব্যক্তি দাস হলে তাকে মুক্ত করার সমান সওয়াব দেয়া হয়।"

নারীদের স্বভাবগত কোমলতা ও ধৈর্যশীল চরিত্রের কারণে পরিবারে সম্প্রীতিপুর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ ভূমিকা থাকা বাঞ্ছনীয়। তাই ইমাম আলী (আ.) উত্তম নারীদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেছেন যে, তাদের মধ্যে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা: উচ্চ দেনমোহর কামনা করে না, বিনয়ী, স্বামীর অনুগত, কোন কারণে স্বামী রাগান্বিত হলে তার রাগ প্রশমিত না করা পর্যন্ত ঘুমায় না এবং তার স্বামীর অনুপস্থিতেও তার সম্পদ ও সম্মান রক্ষায় ব্রতী থাকে। এমন নারী (পৃথিবীর ওপর) আল্লাহর নিয়োজিত দায়িত্বশীল এক কর্তা যার কর্মকে তিনি কখনও বিনষ্ট ও প্রতিদানহীন হতে দেবেন না।[১]

উপরিউক্ত নৈতিক দায়িত্বগুলো পালন ছাড়াও স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে ধৈর্য, ক্ষমা, সত্যবাদিতা, পরস্পরের প্রতি সুধারণা, অল্পে সন্তুষ্টি, পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা বাঞ্ছনীয়।

সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব

পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে বলা যায়, পরিবারের অভিভাবক হিসেবে পিতা-মাতা ও অন্য পৌঢ় সদস্যদের ওপর সন্তান ও অধীনস্থ ব্যক্তিদের আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলার গুরুদায়িত্ব আরোপিত হয়েছে। একারণেই মহানবী (সা.) বলেছেন : 'জেনে রাখ, তোমরা সকলেই পরিচালক এবং তোমাদের অধীনস্তদের

১. উসূলে কাফি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩২৫

ওপর দায়িত্বশীল হিসেবে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। শাসক জনসাধারণের ওপর দায়িত্বশীল হিসেবে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারের সদস্যদের পরিচালক হিসেবে তাদের ব্যাপারে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে, নারী তার স্বামীর সংসার ও সন্তানদের দায়িত্বশীল হিসেবে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমরা সকলেই তোমাদের অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।'[১] মহান আল্লাহ মুমিনদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন : হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের নিজেদের ও তোমাদের পরিবারকে সেই (জাহান্নামের) আগুন থেকে রক্ষা কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।[২] মানুষ আল্লাহর নির্দেশ পালন, তাঁর বিরোধিতা থেকে দূরে থাকা এবং প্রবৃত্তির মন্দ কামনা-বাসনা পরিহার করার মাধ্যমেই কেবল নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে। আর পরিবারের সদস্যদের আগুন থেকে মুক্ত রাখতে হলে তাদের সঠিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের জন্য সুস্থ ও উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির দ্বারা তাদের চিন্তা ও কর্মকে কলুষমুক্ত রাখার পদক্ষেপ নিতে হবে। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে পরিবার ও সন্তানদের কীভাবে আগুন থেকে রক্ষা করতে হবে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে বলেন : 'তাদেরকে যা কিছু আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করার আদেশ দাও ও যা কিছু থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তা করতে নিষেধ কর। যদি তারা না শোনে, তাহলে তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করেছ।'

যদি পিতা-মাতারা ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে সন্তানদের প্রশিক্ষিত করে ও আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে তাদেরকে সমাজে উপহার দেয় তা শুধু তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনেই প্রভাব রাখে না বরং তাদের পরলৌকিক জীবনের সৌভাগ্যকেও নিশ্চিত করে। শৈশবকালে শিশুরা সম্পুর্ণরূপে পিতা-মাতার ওপর আস্থাশীল থাকার কারণে তাদেরকেই সবকিছু জন্য আদর্শ মনে করে। তারা পিতা-মাতার প্রতিটি ও কথা ও আচরণকে সূক্ষ্মভাবে দেখে ও হুবহু তার অনুকরণ করে। যদি পিতা-মাতার মধ্যে সত্যবাদিতা, প্রতিশ্রুতি ও আমানত রক্ষা, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা,আদর-স্নেহ, অপরকে ভালবাসা, সকলের প্রতি সুধারণা ও সদ্ব্যবহার, শুভ ও মঙ্গল কামনা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে তাহলে সন্তানরা অবচেতনভাবে তাতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। যদি তারা দেখে পিতা-মাতা ধর্মীয় বিধিবিধান ও আচার মেনে চলে, সবসময় আল্লাহর স্মরণ, দোয়া ও মোনাজাতে রত থাকে, আধ্যাত্মিকতার চর্চা করে তবে শিশুরাও তা শিখে ও তাদের অনুরূপ হওয়ার চেষ্টা করে।

যেহেতু শিশুর সঙ্গে তার চারপাশের জগতের আত্মিক সম্পর্ক পরিবারের গণ্ডিতেই গড়ে ওঠে সেহেতু পরিবার হল শিশুর সামাজিক ব্যক্তিরূপে আবির্ভূত হওয়ার উপযুক্ত ক্ষেত্র। পরিবারে সে ধৈর্যধারণ, ব্যথা-বেদনা মোচন ও ব্যর্থতার ক্ষতিপূরণের

১. জামেয়ে আহাদিসে শিয়া, ২০তম খণ্ড, পৃ.২৫৫
২. সূরা তাহরীম : ৬

অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের পদ্ধতি শিক্ষাগ্রহণ করে। যদি এসকল বিষয়ে সে পরিবার থেকে সহযোগিতা পায় এবং পরিবারে তার চাওয়া-পাওয়া ও ভালবাসার চাহিদা পূরণ হয় তবে সে পরিবারের বাইরে প্রশান্তি খুঁজবে না। তখন আর বাইরের পরিবেশে তাকে প্রতারিত করার যে শত রকমের ফাঁদ পাতা রয়েছে তাতে পা দেবে না। কিন্তু যদি পরিবারে শিশু ও কিশোরকে অবহেলা করা হয় অথবা অযৌক্তিকভাবে তার সকল চাওয়া-পাওয়া পূরণ করা হয় অথবা তার প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ভাল কাজে উৎসাহিত করার পরোক্ষ কৌশল অবলম্বন না করে শুধু আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে তার ওপর জোরপূর্বক কোন কিছু চাপিয়ে দেয়া হয় তবে শিশু সঠিকভাবে বিকশিত হবে না। শিশু যদি পিতা-মাতার মধ্যে মিথ্যাবাদিতা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করা, রূঢ়, কঠোর ও অসৌজন্যমূলক আচরণ এবং অনৈতিক ও অশালীন বিষয় প্রত্যক্ষ করে, তবে তাকে উপদেশ দিয়ে উত্তম আচরণ শেখানো যাবে না। কারণ, তাদের কথা ও কর্মের মধ্যে অমিল তার কাছে ভালকর্মকে মূল্যহীন করে তুলবে। তাই শিশুকে উত্তম মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পিতা-মাতাকেই প্রথমে উত্তম স্বভাব ও আচরণের অধিকারী হতে হবে।

উপসংহার

পারিবারিক সৌভাগ্য স্বামী-স্ত্রীর নৈতিক চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল। যদি তারা পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো পালন করে এবং ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের ওপর অটল থাকে তবেই পরিবারে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এরূপ পরিবারের বৈশিষ্ট্য হল এর সদস্যরা ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ, তারা পরস্পরের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল, সকলে সকলের দৈহিক, আত্মিক ও মানসিক সুস্থতা ও প্রশান্তি নিশ্চিত করার প্রচেষ্টায় রত, পরস্পরের ইতিবাচক গুণগুলোর বিকাশ ঘটাতে সহায়তা দান করে, নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগে সাহায্য করে, তাদের মধ্যে ক্ষমা ও উদারতার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে।